ذالكم خير لكم
যা-লিকুম খাইরুল্ লাকুম
নামাজ
রোজা
হজ্ব
যাকাত
কলেমা
দাওয়াত
তালিম
তাযকিয়া
হুকূক
কেছাছ

# ذلكم خير لكم

## যা-লিকুম খাইরুল্ লাকুম

ইবনে মোস্তাক

# যা-লিকুম খাইরুল্ লাকুম
ইবনে মোস্তাক

প্রকাশকঃ ইবনে ইব্রাহীম।

প্রকাশনায়ঃ



প্রকাশকালঃ অক্টোবর ২০০২ ইং

মূল্যঃ ৫০/- (পঞ্চাশ টাকা মাত্র)

ZALIKUM KHAIRULLAKUM by- Evna Mostak.
Price: 50/- (Taka Fift / Only).

# অভিমত

বিস্‌মিল্লাহির রহমানির রহীম

পরম স্নেহভাজন বন্ধুবর, ইবনে মোস্তাক, আল্লাহর রাহে নিবেদিত প্রাণ, একজন সৎ চরিত্রবান ব্যক্তিত্ব এবং ইসলামী ইমারত কায়েমের নিষ্ঠাবান, তরুণ, মেধাবী, বীর সেনানী।

"যা-লিকুম খাইরুল্ লাকুম" বক্ষ্যমান পুস্তিকাটি তারই চিন্তা, শ্রমের ফসল। তিনি উক্ত পুস্তিকায় সশস্ত্র জিহাদ ও ক্বিতাল ফী-সাবিলিল্লাহর ফরযীয়্যত এবং আরো বিভিন্ন প্রাসঙ্গিক দিক সম্পর্কে কারও মনে উদয় হতে পারে এমন ৫০ টি প্রশ্নের উত্তর আল কোরআনের বিভিন্ন আয়াত থেকে অর্থ উদ্ধৃতি এবং খুবই যুক্তি সম্পন্ন দৃষ্টান্ত সহকারে, অতি সুন্দরভাবে সাবলীল ভাষায় উপস্থাপন করার চেষ্টা করেছেন।

বইখানী কলেবরে ক্ষুদ্র হলেও কিন্তু বিষয়বস্তুর প্রয়োজনীয়তার আলোকে অত্যন্ত জরুরী ও গুরুত্বপূর্ণ।

উক্ত পুস্তিকাটির পান্ডুলিপি আদ্যোপান্ত পাঠ করার সুযোগ এ অধমের হয়েছে। বিভিন্ন স্থানে সংশোধনপূর্বক প্রয়োজনীয় কিছু সু-পরামর্শও লিখককে দান করার চেষ্টা করেছি।

পুস্তিকাটির প্রতিটি বাক্যে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে বিষয়বস্তুর দিকে স্বচ্ছ ইংগিত, ব্যক্ত হয়েছে লিখকের জেহাদী জযবা, ঈমানী চেতনা। ইসলাম ধর্মের প্রচার-প্রসার ও দা'ওয়াতের মেহনত অত্যন্ত ফযীলতময় এবং অপরিসীম গুরুত্বপূর্ণ একটি উচ্চ ইবাদত ও উম্মতের মহান দায়িত্ব। যার বিশ্ব ব্যাপী অবদান অবশ্যই অনস্বীকার্য। এভাবে দেশের স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব অর্জন ও রক্ষার্থে এবং জাতীর বিভিন্ন দাবী পূরণ ও পার্থিব কিছু অধিকার আদায়ে আন্দোলনের গুরুত্ব এবং আন্দোলনকারীদের অবদান অনস্বীকার্য। কিন্তু এগুলো একটিও পারিভাষিক সশস্ত্র ফরয জেহাদ ও ক্বিতাল ফী-সাবীলিল্লাহ নয়। অধিকন্তু সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র ইত্যাদী নিঃসন্দেহে কুফরী মতবাদ। আর কোন কুফরী মতবাদ ইসলাম প্রতিষ্ঠার মাধ্যম হতে পারে না। কারণ প্রতিটি কুফরী মতবাদ ও ইসলামের মধ্যে রয়েছে আক্বীদা, আদর্শ, উদ্দেশ্য ও পদ্ধতিগতভাবে আসমান-যমীনসম পার্থক্য/ বিরোধ বিদ্যমান। তাই কোন কুফরী মতবাদকে ইসলামীকরণ করার কোন সুযোগ ইসলামে নেই। আর রয়েছে সশস্ত্র জিহাদ ও প্রচলিত ইসলামী রাজনীতির মধ্যে বিরাট ব্যবধান। তাই এসব মতবাদের প্রতিষ্ঠা ইসলাম প্রতিষ্ঠা নহে।

আল্লাহর যমীনে ইসলামকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য এবং বিশ্ব কুফরী ঐক্য শক্তি এবং তাগুত গুরু দাজ্জালকে খতম করার ব্যাপারে সশস্ত্র জিহাদের কথাই বলে গেছেন দয়ার নবী মুহাম্মদ(সঃ) আপন উম্মৎকে।

সশস্ত্র জিহাদ ইসলামের রক্ষা কবচ। যাহা ছেড়ে দিলে এই উম্মতের লাঞ্চনা, অনৈক্য, পরাধীনতা, নির্যাতন-নিপিড়ন, নির্বিচারে মুসলিম গণহত্যা এবং খোদাদ্রোহীদের প্রভূত্ব কায়েম সর্বত্র একচ্ছত্র আধিপত্য বিস্তার অনিবার্য। যার সত্যতার প্রমাণ স্বরূপ রয়েছে অসংখ্য আয়াত ও হাদীস এবং যুগে যুগে ঘটে যাওয়া উম্মতের করুণ ইতিহাস ও বর্তমান হতাশা পূর্ণ বিশ্বময় নাযুক পরিস্থিতি।

উক্ত পুস্তিকাটির মাধ্যমে আশা করি, যারা জেহাদ শব্দের অপব্যাখ্যা করে/জেহাদকে ফরয মনে করেনা এবং প্রকৃত জেহাদ ও ক্বিতালের মতো ঝুঁকিপূর্ণ গুরুদায়িত্বটির জন্য কোরআন-হাদীসে বর্ণিত বিশেষ ফযীলত সমূহ তাদের আন্দোলন/ধর্মপ্রচার ও দাওয়াতী কাজের জন্য নির্দ্ধিধায় ব্যবহার করে, তাদের ভুল ভাংবে। এভাবে মুসলিম বিশ্বে ইসলামী রাজনীতির জন্য পাগলপারা এবং জেহাদী জয্‌বার অধিকারী সরলমনা মুসলমানগণকে বিশেষতঃ তরুণ ছাত্র-শিক্ষক মাঠ কর্মীদেরকে যারা নিজেদের ইসলামী গণতন্ত্র/ ইসলামী সমাজতন্ত্র/ ইসলামী রাজতন্ত্র/ ইসলামী আন্দোলনকে অতি চতুরতার সহিত সরাসরী "ইসলামী জেহাদ" নাম দিয়ে কোরআন-হাদীসে বর্ণিত এবং রাসুলুল্লাহ(সাঃ) এর ১০ বৎসরের মাদানী জিন্দেগীতে দৃষ্টান্ত স্থাপন করে উম্মতের জন্য রেখে যাওয়া "সশস্ত্র জেহাদ" থেকে বিমূখ করে রেখেছে তাদের ভ্রান্তি/প্রতারণা থেকে জাতিকে সাবধান করার এবং ইসলামী রাজনীতি ও সশস্ত্র জেহাদের মধ্যে পার্থক্য বুঝার ব্যাপারে বইটি বড় পথ প্রদর্শকের ভুমিকা পালনে এবং আরো বিভিন্ন ভুল বুঝাবুঝি নিরসনে বড় সহায়ক হবে বলে মনে করি। ইনশাআল্লাহ্॥

আল্লাহ এই নবীন লিখকের উক্ত পুস্তিকাটিকে সর্বমহলে সমাদৃত এবং লেখকের মেহনতকে কবুল করুন এবং আরও বেশী করে দ্বীনের খেদমত করার তৌফিক নছীব করুন এবং আমাদের সকলকে সত্য উপলদ্ধি করে তাঁর রেযামন্দি হাছিল করার তৌফিক দান করুন। আমীন ॥

শুভেচ্ছান্তে
মোহতাজে দোআ
আবু উসামাহ

তারিখঃ
২৩-০৯-২০০২ ইং

# বাণী

বিস্‌মিল্লাহির্‌ রাহ্‌মানির রাহীম

আলহামদুলিল্লাহি ওয়াকাফা ওয়াছালামুন আলা ইবাদিহিল্লাজি নাস্তফা।

বর্তমান বিশ্বের অধিকাংশ মুসলমান আলেম হোক বা আওয়াম; মনে করছেন যে, এই আধুনিক যুগে নবী (দঃ) এর প্রদর্শিত জিহাদী পদ্ধতিতে ইসলামী ইমারত কায়েম করা আদৌ সম্ভব নয়- বিশেষ করে এই বাংলাদেশে। যদিও তারা আফগানিস্তানের ইসলামী ইমারত কায়েম হওয়ার প্রত্যক্ষ সাক্ষ্য প্রদান করেন; তারপরেও বলেন যে, এটা আফগানিস্তান নয়- এটা হচ্ছে বাংলাদেশ। যার তিন পার্শ্বে ভারত ও এক পার্শে বঙ্গোপসাগর। তাই এ দেশে এই মুহুর্তে এই পরিবেশে আফগানিস্তানের ন্যায় নবীর প্রদর্শিত জিহাদের মাধ্যমে ইসলামী ইমারত কায়েম করা সমাজ ও পরিবেশের পরিপন্থী। এ ধরণের কথার দ্বারা কি এ কথা বুঝানো হচ্ছে না যে, ১৪ শত বৎসর পূর্বে অবতীর্ণ কোরআন এই নিউ মডেল যুগের জন্য প্রযোজ্য নয়। আর যারা এই ধরণের কথা বলে বা এরকম ধারনা পোষণ করে তাদের কি ঈমান চলে যায় না? মক্কার অধিবাসীরা এই ধরণের কথা বলে তো কাফের হয়েছিল অথচ আমরা এই দিকে একটুও লক্ষ্য করিনা। এর দ্বারা যে আমরা নিজের অজান্তে ঈমান হারা হয়ে ঘুরপাক খাচ্ছি তা টেরও পাচ্ছি না। তাই ঈমানহারা না হয়ে নবীর প্রদর্শিত জিহাদের মাধ্যমে এই নিউ মডেল যুগেও ইসলামী ইমারত প্রতিষ্ঠা করা যে সম্ভব ও যুক্তি সঙ্গত এবং তার বাস্তব প্রমাণ আফগানিস্তানের ইসলামী ইমারতের উদ্ধৃতি দিয়ে ও কোরআনে কারিমের কাছে ৫০টিরও অধিক প্রশ্ন করে এবং তারই পক্ষ থেকে এর উত্তর দিয়ে ও গণতন্ত্রের গোমর ও ভ্রষ্টতা প্রমাণ করে সত্যিকার জিহাদ সন্ধানীদের সঠিক পথের নির্দেশ করে "যা-লিকুম খাইরুল লাকুম" নামে যে পুস্তিকাটি রচনা করেছেন ভাই ইবনে মোস্তাক, তা দেখে অত্যন্ত খুশি ও আনন্দিত হয়েছি এবং আশ্চার্যান্বিতও হয়েছি। এ জন্য যে, যে মুহুর্তে বিজ্ঞ উলামায়ে কেরামগণ পর্যন্ত হিমশিম খাচ্ছেন কোরআন ও হাদিসের আলোকে নবীর প্রদর্শিত জিহাদের মাধ্যমে ইসলামী ইমারত প্রতিষ্ঠার সম্ভাবনা প্রমাণ করতে। সেই মুহুর্তে একজন কলেজ পড়ুয়া ছাত্র

কোরআন ও ছহীহ্ হাদিসের আলোকে প্রমাণ করতে দেখলাম যে, নবীর প্রদর্শিত জিহাদের মাধ্যমে এই আধুনিক যুগে ও ইসলামী ইমারত প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব এবং তার কোন বিকল্পও নেই। এই ক্ষেত্রে আলেমরাও প্রশ্ন করেন যে এ যুগে কাফেরদের সাথে যুদ্ধ করা আমাদের জন্য আত্মহত্যার নামান্তর এবং যুক্তি হিসাবে পেশ করেন এখন নবী নেই, তাই আল্লাহর সাহায্যও আসবে না। এ ধরণের খোঁড়া যুক্তি নিয়ে যখন আমরা জিহাদের মাধ্যমে দ্বীন কায়েম না হওয়া প্রমাণ করছি, তখন "ওয়া আছতাব্দিল্ কাওমান গাইরাকুম" এর সত্যতা প্রমাণ করে আল্লাহ একজন কলেজ পড়ুয়া ছাত্রকে দাঁড় করিয়ে দিয়েছেন, তা প্রমাণ করতে, অথচ এটা তার কাজ ছিলনা। আর আমরা যে আলেম নামে জিহালতের স্বর্গে বাস করছি তার প্রমাণ স্বরূপ বলতে বাধ্য হচ্ছি যে, যখন উলামায়ে কেরামকে জিজ্ঞাসা করা হয় যে, আমরা ইসলামী রাষ্ট্রে বাস করি না অনৈসলামিক রাষ্ট্রে বাস করি? তখন কেউ হুতুমপেঁচার ন্যায় চুপ করে থাকি আর কেউ বলি ইসলামী রাষ্ট্রে বাস করি। এ হচ্ছে আমাদের দেশের উলামায়ে কেরামদের অবস্থা। পক্ষান্তরে স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদেরকে যদি জিজ্ঞাসা করা হয়, তখন তারা বলে আমরা অনৈসলামিক রাষ্ট্রে বাস করি। আমি এই প্রসঙ্গে বলব, আমরা উলামায়ে কেরামরা যখন বলছিনা অনৈসলামিক রাষ্ট্রে বাস করি এবং দলিল স্বরূপ যদিও বলছি যে অমুক ইসলামী গবেষণা বিভাগ থেকে প্রকাশিত "আল জাওয়াহিরুল আশরা" নামক কিতাবে বলা হয়েছে যে, বাংলাদেশ ইসলামী রাষ্ট্র। অথচ জাতিসংঘ নামক কুফরী সংস্থার পক্ষ থেকে প্রকাশ করা হয়েছে যে বাংলাদেশ অনৈসলামিক রাষ্ট্রের মডেল। তাই জাগতিক শিক্ষিতদের মুখ থেকে আল্লাহ পাক বাস্তব ও সত্যটা প্রকাশ করিয়ে আমাদেরকে উপদেশ গ্রহণের নির্দেশ দিচ্ছেন।

এ প্রসঙ্গে জিহাদ বিষয়ে অনেক কথাই রয়েছে, আল্লাহ তায়ালার কাছে এই পুস্তিকার মাধ্যমে জিহাদের ব্যাপারে আমাদের সংশয় নিরসন এবং আবশ্যকতা অনুধাবন করার তাওফিক্ব দান ও বইটির বহুল প্রচার কামনা করে এখানেই শেষ করছি।

ইতি

**ইবনে আলী**

# প্রসঙ্গ কথা

মুসলমান মাত্রই স্বীকার করে যে, মানবতার মুক্তি একমাত্র ইসলামের অনুসরণের মধ্যে নিহিত। ইসলাম ব্যতীত দুনিয়ার সকল পথ ও মতের চূড়ান্ত গন্তব্য জাহান্নাম।

উপরোক্ত কথাটি যেমন সত্য, তেমনি একথাটিও সত্য যে, মুসলমান হতে হলে ঈমানের দাবী সমুহের যথাযথ অনুশীলনও অপরিহার্য। এছাড়া মুসলমান হওয়ার দ্বিতীয় কোন পথ নেই। এছাড়া কারও মুমিন হওয়ার দাবির অসারতা কুরআন দ্বারা প্রমাণিত। কুরআনের শুরুতে আল্লাহ্ তা'আলা একথাটিই বলেছেন,

﴿ومن الناس من يقول آمنابالله وباليوم الآخر وماهم بمؤمنين﴾

"কিছু মানুষ বলে বেড়ায় য আমরা আল্লাহ্ ও পরকালের উপর ঈমান এনেছি। বস্তুতঃ তারা আদৌ মু'মিন নয়।" [সূরা-বাক্বারাহঃ ৮]

এ সূরার ১৩৭ নম্বর আয়াতে কারা মু'মিন তাও আল্লাহ্ তা'য়ালা বলে দিয়েছেন যে,

﴿فان آمنوا بمثل آمنتم به فقداهتدوا﴾

"যদি তারা তোমাদের ঈমানের মত ঈমান আনে, তাহলে তারা সৎ পথ প্রাপ্ত"।

এ আয়াতে 'তোমাদের' দ্বারা যে সাহাবায়ে কেরামদেরকেই উদ্দেশ্য করা হয়েছে, তাতে কারো দ্বিমত নেই। এখন আমাদের ভাবতে হবে, সাহাবায়ে কেরামের ঈমান সম্পর্কে। তাদের ঈমান কেমন ছিল, তা তাঁদের ইতিহাস পাঠক মাত্রই জানেন। সাথে সাথে কুরআন মজীদের বিভিন্ন আয়াতেও তাঁদের ঈমান নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। তন্মধ্যে সূরা ফাত্হের সর্বশেষ আয়াতে যা বলা হয়েছে, তা সকল মু'মিনের জানা থাকা আবশ্যক। ইশরাদ হচ্ছেঃ

﴿محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم فى وجوههم من أثر السجود﴾

"মুহাম্মদ আল্লাহ্র রাসূল। আর তার সাথে যারা রয়েছে, তারা কাফিরদের প্রতি কঠোর, নিজেদের মধ্যে পরস্পরে সহানুভূতিশীল। আপনি তাদেরকে আল্লাহর সন্তুষ্টি কামনায় রুকু ও সিজাদারত অবস্থায় দেখবেন। তাদের মুখমন্ডলে রয়েছে সিজদার চিহ্ন।"

এ আয়াতে সাহাবায়ে কেরামের তিনটি গুণের উল্লেখ করা হয়েছে। তম্মধ্যে প্রথমটি দ্বারা ঈমানদার আর কাফিরের সম্পর্ক কী ধরণের হবে তা বুঝা যায়। দ্বিতীয়টি দ্বারা মু'মিনের সাথে মু'মিনের সর্ম্পক কি রকম হবে তা বুঝা যায়। তৃতীয়টি দ্বারা মু'মিন কিভাবে আল্লাহর ইবাদত করে তা বুঝা যায়। আর একজন মানুষ সত্যিকারের মু'মিন হওয়ার জন্য যে এ তিনটি গুণ তার মধ্যে থাকা আবশ্যক, তা সূরা বাকারার ১৩৭ নম্বর আয়াত দ্বারা স্পষ্ট বুঝা যায়।

সুতরাং বুঝা যাচ্ছে, শুধু কাফেরদের বিরুদ্ধে প্রচন্ড লড়াকু হলে যেমন সত্যিকারের মু'মিন হওয়া সম্ভব নয়, তেমনি শুধু নিজেদের মধ্যে পরস্পর সহানুভূতিশীল হলেও সত্যিকারের মু'মিন হওয়া সম্ভব নয়।

অনুরূপ শুধু একজন নিষ্ঠাবান বড় ইবাদতগুযার হলেও সত্যিকারের মু'মিন হওয়া সম্ভব নয়। সত্যিকারের মু'মিন হওয়ার জন্য তিনটি গুণ এক সাথে পাওয়া যেতে হবে। ত্রিশ পারা

কুরআন ও হাদীসের বিশাল ভান্ডারে এ তিনটি গুণেরই উল্লেখ-আলোচনা, ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ এবং প্রতিদান-পরিণামের কথা বলা হয়েছে।

বর্তমান পৃথিবীতে এ তিনটি গুণ সম্পন্ন যে সকল মানুষ রয়েছে তারাই সত্যিকারের মু'মিন, নাজাত প্রাপ্ত দল ও আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআহ। তারা ব্যতীত পৃথিবীর সকল লোক পথভ্রষ্ট, আত্মপ্রবঞ্চক ও জাহান্নামের ইন্ধন।

যে সকল লোকের মধ্যে সাহাবায়ে কেরামের এই তিনটি গুণ স্থান পেয়েছে, তাদের সংখ্যা আমাদের দেশে এমনকি গোটা পৃথিবীতে কতজন রয়েছে, সে সম্পর্কে তারাই অনুমান করে কিছু বলতে পারে, যাদের মধ্যে এ তিনটি গুণ পূর্ণাঙ্গ রূপে বিদ্যমান।

মু'মিন হওয়ার জন্য পরিপূর্ণ কুরআন বুঝা ও মানা উভয়টা আবশ্যক। আমার মনে হয়, মুহাম্মদ(সাঃ) এর আগমনের পূর্বে ইহুদীরা তাওরাত যতটুকু বুঝত ও মানত, বর্তমানে আমাদের দেশের আলেম, ইসলামী চিন্তাবিদ ও রাজনীতিক নামধারী কুপমন্ডুকরা ততটুকুও বুঝেনা কিংবা মানেনা। সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বশেষ নবীর আগমন পৃথিবীতে না ঘটলে পৃথিবী এসব অসৎ কুপমন্ডুকদের বিচরণ থেকে অনেক আগেই নিস্কৃতি পেয়ে যেত। এদের প্রবল আধিক্য দেখে সত্যিকারের মু'মিনদের হৃদয় কেবল রাসূলুল্লাহ(সাঃ)'র সে হাদীস দৃষ্টে প্রশান্তি লাভ করতে পারে, যাতে তিনি বলেছেন-

بدألاسلام غريبا وسيعود كمابدأ فطوبى للغرباء

"ইসলাম (মক্কায়) যাত্রা শুরু করেছে গুরুত্বহীন অবস্থায়। আর শিঘ্রই তা যে অবস্থায় যাত্রা শুরু করেছিল, সে অবস্থায় ফিরে আসবে।" [মুসলিম]

ঈমান ও ইসলামের চরম দুর্ভিক্ষের এ যুগে যে সকল তরুণ যুবক জান্নাত প্রাপ্তি ও আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভে ঈমানের কন্টকাকীর্ণ পথে দৃঢ়পদ থাকতে বদ্ধপরিকর, আমার ধারণায় 'যালিকমু খাইরুল লাকুম' গ্রন্থের লেখক তাদেরই একজন। যে বয়সে সাধারণত যুবকগণ ক্রীড়া-কৌতুক ও দুনিয়ার সৌন্দর্যের পিছনে ধাবমান থাকে, সে বয়সে এ যুবকের আল্লাহ ও মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠার মৃত্যুঘেরা এক কন্টকাকীর্ণ পথের দিকে আহবান জানানো নিঃসন্দেহে তাঁর ঈমানের সত্যতার বহিঃপ্রকাশ।

কুরআন, সুন্নাহ, ইতিহাস ও বাস্তবতার আলোকে লেখক তাঁর বইতে মূলতঃ 'ইসলাম' প্রতিষ্ঠার সে স্বচ্ছ পথের দিকেই ইসলামের বিজয় কামনাকারীদের এগিয়ে আসার আহবান জানিয়েছেন, যে পথে ইসলামের বিজয়ের জন্য চেষ্টা করে গেছেন রাসুল(সাঃ) ও তাঁর সাহাবীগণ এবং যে পথ স্বাভাবিকত সুবিধাবাদ ও স্বার্থচর্চার নোংরা খেলা থেকে মুক্ত থাকে।

লেখকের লেখায় নবীনত্ব ও অপরিপক্কতার ছাপ সুস্পষ্ট। কিন্তু সত্যের পথের সচেতন সন্ধানীদের চোখ ঐ দিকে না গিয়ে বইয়ের বিষয়বস্তুর দিকেই নিবদ্ধ হবে- এটাই স্বাভাবিক।

আল্লাহ তা'য়ালা লেখকের জ্ঞানকে আরো দৃঢ় ও তার পরিধিকে আরও প্রশস্ত এবং তার বাস্তবায়নে তাকে আরো সাহসী ও চক্ষুষ্মান করুক।

*আবুল হুসাইন*

০৬.১০.২০০২ ইং

E-mail: al-nafeer@yahoo.com

# হৃদয়ের আহবান

সকল প্রশংসা সেই মহান রব্বে-ক্বায়েনাতের প্রতি, যিনি আমাদের উপর সশস্ত্র জিহাদকে ফরজ করেছেন। অজস্র-ধারার প্রাণঢালা দরুদ শরীফ সেই মহান নবী কমান্ডার সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর প্রতি, যিনি সশস্ত্র জিহাদের মাধ্যমে ইসলামী ইমারত ক্বায়েম করে- ইসলামী খেলাফত প্রতিষ্ঠার বাস্তব কর্মসূচী প্রদান করেছেন, আপন উম্মতকে।

ঐ সশস্ত্র জিহাদ সম্পর্কে কোরআনকে পঞ্চাশটি প্রশ্ন করে যখন সরাসরি উত্তর পেয়ে গেলাম, তা'ই লিপিবদ্ধ করে মাদ্রসা-স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের সমীপে পুস্তকাকারে দাওয়াত হিসেবে পেশ করলাম।

কোরআনকে প্রশ্ন করে জবাব নিয়ে বইটির নাম "কোরানের জবাব" দেওয়াটাই সহজে বুঝে আসে। কিন্তু পেশাদার লেখক না হওয়ায় রীতিমত এক বিরাট ভাবনায় পড়ে গেলাম। এই ভাবনা নিয়ে ঘুমিয়ে পড়লাম পরে কে যেন এসে বলল, লিখ!

ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ

"এটি তোমাদের জন্য অতি উত্তম যদি তোমরা বুঝতে পার।"
ঘুম হতে জাগার পর ভুলে গেলাম সে আয়াতটি। তাই কোরআন খুলে খুঁজতে লাগলাম। অমনিতেই এই আয়াতটি আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করল- সাথে মন বলল এই সেই আয়াত যা আমাকে স্বপ্নে বলা হল, জানি না কে সে জন! বইয়ের প্রতিটি পাতা জুড়ে আছে আয়াতের প্রতিচ্ছবি। প্রচ্ছদচিত্রে আছে বইয়ের প্রতিচ্ছবি। সচেতন পাঠকবৃন্দ বলুনতো, প্রচ্ছদ চিত্রটি কি বলে?

পুস্তিকার সর্বশেষ অধ্যায়ে সংযুক্ত করলাম- তথাকথিত গণতন্ত্রের উম্মুচিত মুখোশ, যার ঘুম পাড়ানো তাবিজে ইসলামী আন্দোলনের বহু নেতা -কর্মীও নিশাগ্রস্ত হয়ে সরল রাস্তা ছেড়ে যেন বিলপাতাড়ি দৌঁড়তেছেন ইসলামের রাজপ্রতিষ্ঠায়। আদৌ কি সম্ভব!!! ছহি বুঝ নিয়ে এখলাসের সহিত বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম' র বাস্তব কর্মসূচি যারাই অনুসরণ করবে বিজয় তাদেরই জন্য অপেক্ষমান।

পাঠকবৃন্দের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলছি- ভুলবেন না যে, এই লেখাটি ছিল আফগানিস্তানে তালেবান শাসনামলে আর বাংলাদেশে আওয়ামী শাসনামলে।

# অবতরনিকা

১। জিহাদের হুকুম কি? ২। সবার উপর কি একই হুকুম? ৩। জিহাদ ফরজ করাতে আল্লাহর উদ্দেশ্য কি? ৪। কেন আমরা জিহাদ করব? ৫। কাদের জন্য জিহাদ করব?। ৬। প্রস্তুতির প্রয়োজন আছে কি? ৭। কার সঙ্গে জিহাদ করব? ৮। কিভাবে জিহাদ করব? ৯। সঙ্গে কেউ না আসলে আমি একা কি করব? ১০। উৎসাহিত করার পরও যদি না আসে তখন কি জিহাদ থেকে বিরত থাকব? ১১। সংখ্যায় কম হলে বিরত থাকব না কি দৃঢ়পদ থাকব? ১২। কিভাবে দঢ়পদ থাকব? ১৩। যুদ্ধাস্ত্র কম থাকলেও কি জিহাদ করব? ১৪। আল্লাহ্ তা'আলা কি সাহায্য করবেন? ১৫। ফেরেস্তারাও কি আমাদের সহযোদ্ধা হবে? ১৬। পেয়ে যাওয়া ধন-সম্পদ কিভাবে ব্যবহার করব? ১৭। সমস্ত গনীমত কি শুধু কমান্ডার সাহেব নিয়ে নেবেন? ১৮। বন্ধিদেরকে কি করব? ১৯। কাফেররা কি আসলেই সংঘবদ্ধ শক্তি? ২০। কেউ যদি ভয়ে ময়দানে জিহাদ থেকে পালিয়ে যায়? ২১। অল্প সংখ্যক মুজাহিদ অধিক সংখ্যক কাফেরের উপর ঝাপিয়ে পড়ে কোন্ সাহসে? ২২। মহানবী (সঃ) ও কি স্বয়ং জিহাদ করেছেন? ২৩। পূর্ববর্তী নবীগণও কি জিহাদ করেছেন? ২৪। সাহাবায়েকেরামের প্রতি আল্লাহর সন্তুষ্টি -কখন-কোথায় ঘোষণা করা হয়? ২৫। আমার শাহাদাতের পর পূর্ববর্তী গুনাহ সমূহ কি ক্ষমা করা হবে? ২৬। আমি শহীদ হলে বেহেস্তে যাওয়ার নিশ্চয়তা কি? ২৭। এমন কোন ব্যবসা আছে কি যা জাহান্নামের কঠিন শাস্তি হতে মুক্তি দেয়? ২৮। এই মুক্তির নিশ্চয়তা কতটুকু? ২৯। আমরা নিহত হলে কি মৃত বলবে কেউ? ৩০। আমরা জিহাদ না করলে কি জিহাদ বন্ধ হয়ে যাবে? ৩১। কোন্ বৈশিষ্টের সে জাতি? ৩২। দেশ ফতেহ্ করার পর মুজাহিদরা কি করবে? ৩৩। কি দিয়ে ইন্সাফ প্রতিষ্ঠা করব? ৩৪। ময়দানে জিহাদে কিভাবে নামাজ পড়ব? ৩৫। কেন আমরা শ্রেষ্ঠ উম্মত? ৩৬। জিহাদ না করলে কি আল্লাহ শাস্তি দেবেন? ৩৭। অবনতির মূল কারণ কি? ৩৮। পরিবার পরিজনের দোহায় দিয়ে বাহানা কি গ্রহণ যোগ্য? ৩৯। আখেরাতের পথের পথিকের কর্তব্য কি? ৪০। কারা মুনাফিক? ৪১। কতদিন জিহাদ করতে হবে? ৪২। মুজাহিদগণ প্রচলিত গণতন্ত্রের বিশ্বাসী নয় কেন? ৪৩। মুজাহিদগণ যাকাত গ্রহণ করতে পারবে কি? ৪৪। রাজপথে শোরগোল করা কি জিহাদ? ৪৫। কেমন সেই জিহাদের বায়আত? ৪৬। জিহাদ করে লাভ কি? ৪৭। আল্লাহর কাছে কার মর্যাদা কত? ৪৮। হাশরের ময়দানে জিহাদ সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হব কি? ৪৯। গেরীলা যুদ্ধ করা কি জায়েয? ৫০। কোন্ সেই মহাব্বত? ৫১। আল্লাহর রাহে নিবেদিত প্রাণ এক যুবক।

# যা-লিকুম খাইরুল্ লাকুম

بسم الله الرحمٰن الرحيم

মানুষ "জামেউল খালায়েক" অর্থাৎ পৃথিবীর সমুদয় সৃষ্টির নমুনার সমন্বয়কারী আর সৃষ্টির কর্তব্য হচ্ছে স্রষ্টার এবাদত করা। তাই মানুষের কর্তব্য হচ্ছে আল্লাহর এবাদত করা।

আবার মানুষের মধ্যে আল্লাহর কামালাতের নমুনাও আছে, একত্ববাদের নমুনা আছে, নিরাকারত্বের নমুনা আছে, স্বর্বত্র বিরাজমানত্বের নমুনাও আছে। আল্লাহ জ্ঞানী মানুষকেও জ্ঞান দান করেছেন, তিনি হাকীম মানুষকেও হেকমত বিজ্ঞান দান করেছেন। তিনি আবিস্কারক মানুষকেও আবিস্কারের ক্ষমতা দিয়েছেন। আল্লাহর কারিগরীর যত নমুনা আছে সব মানুষের মধ্যে বিদ্যামান। কিন্তু আল্লাহর কাজ এটা নয় যে, তিনি এবাদত করবেন বা কারো কাছে নতশির হবেন, বরং তাঁর নামই হচ্ছে সর্বশ্রেষ্ট, তিনি সবার উর্ধ্বে, তাঁর উর্ধ্বে আর কেউ নেই। মানুষের মধ্যে আল্লাহর কামালাতের যত নমুনা আছে, ওসবের সারমর্ম হচ্ছে এই যে, মানুষ যেহেতু সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ, তাই সে তার শ্রেষ্ঠত্ব তুলে ধরবে, আল্লাহর প্রতিনিধি হবে আর সৃষ্টির উপরে আল্লাহর আইন প্রতিষ্ঠিত করবে। সঙ্গে সঙ্গেই সৃষ্টির ফরয হবে মানুষকে মেনে চলা, মানুষের অধীনে থেকে নিজেকে ধন্য করা।

সুতরাং সৃষ্টির সমন্বয়কারী হিসেবে মানুষের কর্তব্য হচ্ছে নিজের সৃষ্টিকর্তার কাছে নতশির হওয়া। আর স্রষ্টার কামালাতের নমুনার সমন্বকারী হিসেবে তার দায়িত্ব হল সমুদয় সৃষ্টিকে তার কাছে নতশির করে দেওয়া। মানে, সে ঘোষণা করবে-হে সৃষ্টি আমি তোমাদের উপর রাজত্ব করব, তোমরা আমার সামনে নতশির হও। এমনি করে মানুষের দু'টি দায়িত্ব প্রমাণিত হয়। একটি সৃষ্টির নমুনার সমন্বয়কারী হিসেবে "এবাদত" আর একটি স্রষ্টার কামালাতের নমুনার সমন্বয়কারী হিসেবে "খেলাফত"।

এককথায় মানব সৃষ্টির দু'টি উদ্দেশ্য আছে, একটি "এবাদত" অপরটি "খেলাফত"। এবাদতের বেলায় নিজেকে স্রষ্টার কাছে নতশির হতে হয় আর খেলাফতের বেলায় সৃষ্টির শৃংখলা, শান্তি, নিয়মানুবর্তিতা প্রতিষ্ঠার জন্য আল্লাহর আইন-কানুন প্রয়োগ করতে হয়। সংসার ত্যাগী হয়ে নির্জনে কেবল এবাদত করলে চলবে না, বরং তাকে সৃষ্টি জগতের উপর ন্যায় বিচার এবং শৃংখলা প্রতিষ্ঠিত করতে হবে, এটা তারই দায়িত্ব। একদিকে যেমন বলা হয়েছে।

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْس اِلَّالِيَعْبُدُوْن (আয্‌যারিয়াত - ৫৬

আমি জ্বিন ও মানবকে কেবল এজন্যই সৃষ্টি করেছি যে, তারা আমার এবাদত করবে। অপরদিকে হযরত আদম (আঃ) সম্পর্কে বলেছেন,

إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً (বাক্বারা-৩০)

হে আদম! দুনিয়াতে আমি তোমাকে আমার প্রতিনিধি করে পাঠাচ্ছি। তুমি সেখানে গিয়ে আমার হুকুম মত কাজ কর। ক্ষেতে খামারে উৎপাদন কর, বাগান কর, নহর খনন করে সেচ ব্যবস্থা কর, নগর বন্দর আবাদ কর, ন্যায় বিচার সুপ্রতিষ্ঠিত কর, সৃষ্টিকে শৃংখলাবদ্ধ কর ইত্যাদি। রাসুলুল্লাহ (সাঃ) এর শান এই ছিল-

كَانَ يَذْكُرُ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ اَحْيَانٍ

তিনি সর্বক্ষণ আল্লাহর যিকিরে মশগুল থাকতেন, কোন একটি মুহূর্ত ও তাঁর আল্লাহর যিকির ছাড়া খালি ছিলনা। সর্বদা নামায, রুকু সেজদা, তাসবীহ-তাহলীল এবং অপরাপর যিকিরে মশুগুল থাকতেন। যেখানে তিনি সর্বক্ষণ আল্লাহর যিকির করতেন, সেখানে এটাও ছিল যে, তিনি মসজিদে নববীতে বসেই বিভিন্ন মোকাদ্দমার বিচার করেছেন, বিভিন্ন জিহাদে সৈন্য প্রেরণ করেছেন, জেহাদ হচ্ছে, দেশ জয় হচ্ছে এবং আরও কত কিছু হচ্ছে। একদিকে আল্লাহর প্রতিনিধি হয়ে সৃষ্টির শৃংখলা স্থাপন করেছেন, অন্যদিকে আবেদ হয়ে এবাদতের শৃংখলা প্রতিষ্ঠা করেছেন। মুখ্য উদ্দেশ্য হচ্ছে এবাদত। কিন্তু এবাদতের সাথে হুকুমতের প্রয়োজন এজন্য যে সেই শৃংখলা আর নিয়মানুবর্তীতা প্রতিষ্ঠিত না হলে এবাদতের কারখানা বন্ধ হয়ে যাবে। কেউ নামায পড়বে আর কেউ পড়বে না, কেউ এখন পড়বে কেউ তখন পড়বে, কেউ রোযা রাখবে আর কেউ রাখবেনা, পানাহার করবে। এভাবে একটা বিশৃংখলা দেখা দেবে। তাই আল্লাহপাক খেলাফত দান করেছেন, যাতে করে সমস্ত মানুষকে একই নিয়মে পরিচালনা করা হয়।

দুর্ভাগ্য সেই খেলাফত আজকে ছিনিয়ে নিয়েছে মুসলমানদের হাত থেকে বিজাতীরা। হযরত ওমর (রাঃ)-এর শাসনকালে পৃথিবীর ২, ২১, ৫১, ০৩০ বর্গ কিলো মিঃ এলাকায় আল্লাহর আইন চালু ছিল। বিশ্বময় শান্তির হিমেল হাওয়া বই ছিল। সকল জাতি নিরাপদ জীবন যাপন করেছিল।

তাইতো মহানবী হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা (সাঃ) (তাঁর প্রতি আমার মাতা-পিতা কুরবান হোক) সম্পর্কে হিন্দুদের বিশিষ্ট ধর্মগ্রন্থ “ভবিষ্যৎ পুরাণ”-এ বলা হয়েছে- “নমস্তে গিরিজানাথ মরু স্থল নিবাসিনে ত্রিপুরা সুর নাশায় বহু মারা প্রবর্তিনে”।

অর্থাৎ ঃ ‘হে আরবের প্রভু, জে জগদগুরু, তোমার প্রতি আমার স্তুতিবাদ। তুমি জগতের সমুদয় কলুষ নাশ করিবার বহু উপায় জান, তোমাকে নমস্কার।

হে পবিত্র পুরুষ আমি তোমার দাস। আমাকে তোমার চরণতলে স্থান দাও।'

হায়! কোথায় সেই ইসলামী জগত। খোদ রাসুলুল্লাহর পাক ভূমি থেকে কোরানের বিধান বিদায় হয়ে গেছে। আজ সেখানে এমেরিকার এজেন্টরাই হুকুমত পরিচালনা করছে, পবিত্র ভূমিকে অপবিত্র করে দিচ্ছে। এর জন্য আমরাই অপরাধী। কেননা, ইসলাম বিরোধী শক্তির নেতৃত্ব ও আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হলে সেখানে পাপ কর্ম বৃদ্ধি পাবে স্বাভাবিকভাবেই, আর ইসলামের নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হলেই সৎকর্ম বৃদ্ধি পাবে অবশ্যই।

ঐ খেলাফত পূণঃ প্রতিষ্ঠিত করার জন্য কি কর্মসূচী নিতে হবে তা নিয়ে আলোচনা করা যাক ঃ

আল্লাহর খলিফার খেলাফত স্থায়ীভাবে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পূর্বে থেকেই অনেক প্রকার শাসন চলে আসছে। কিন্তু আজ পর্যন্ত কেউ সকল সমস্যার সমাধান দিতে সক্ষম হয়নি। একমাত্র নবীউস্‌সাইফ (সাঃ) ই ঐশী আইনের মাধ্যমে সকল সমস্যার সমাধান দিয়েছিলেন।

পৃথিবীতে সর্বপ্রথম মনগড়া মতবাদের উপর শাসনকার্য পরিচালনা করে ইবলিস। তার পরিচালিত শাসনের মূলনীতি ছিল নয়টি, তা হলো ঃ (১) আল্লাহর আইনের মোকাবিলায় নিজের আইন প্রতিষ্ঠা করা।

(২। নিজকে আইনের উৎস হিসেবে ঘোষণা করা।

(৩) নিজকে সবার চেয়ে বড় মনে করা।

(৪) মুসলমানদের বিরোধিতায় কাফেরদের সহায়তা করা।

(৫) শরীয়তের মোকাবিলায় নিজের বুদ্ধির প্রাধান্য দিয়ে জাতীয়তা, বংশ ও বর্ণ পূজার আহবান করা।

(৬) ধোঁকা দেয়া, নেতৃত্বের লিপ্সা জাগ্রত করা এবং মিথ্যাকে সত্যের আবরণে উপস্থাপিত করা।

(৭) মানবতাকে ধ্বংস করে দেয়া।

(৮) সিরাতে মুস্তাকীম হতে জনগণকে ফিরিয়ে আনা এবং দ্বীনের ধ্বংস সাধন করা।

(৯) পর্দাহীনতা ও নগ্নতার প্রচার করা। এই একই সূত্র ধরে নিম্নলিখিত অপরাপর শাসন সমূহ চলে আসছিল এবং তার কিছু কিছু এখনো বর্তমান।

**<u>রাজা-বাদশাহর শাসন ঃ</u>** এর মূলনীতি হচ্ছে ঃ (১) নিজকে সার্বভৌমত্বের মালিক ও আইনের উৎস মনে করা।

(২) জনগণকে গোলাম মনে করা।

(৩) পুঁজি ও সম্পদকে আভিজাত্যের মাপকাঠি মনে করা।

(৪) রাজনৈতিক হত্যা সংঘটিত করা এবং জোরপূর্বক শ্রম আদায় করা।

(৫) বিশেষ বিশেষ ব্যক্তিকে রাজনৈতিক ঘুষ দিয়ে বিবেক ক্রয় করা।

(৬) যুক্তির জবাব কঠোরতা দিয়ে দেয়া।

(৭) নিজের সন্তানকে ক্ষমতার উত্তরাধিকারী করা।

(৮) নিজের ইচ্ছা পূরনের জন্য জনগনকে বাধ্য করা।

(৯) ক্ষমতার মসনদকে টিকিয়ে রাখার জন্য ধর্মীয় শক্তির সহায়তা নেয়া।

**জনগণের শাসন ঃ** এর মূলনীতি হল ৬টি, যেমন ঃ (১) জনগণের সার্বভৌমত্ব (২) পুঁজিবাদ (৩) ধর্ম নিরপেক্ষতাবাদ (৪) জাতীয়তাবাদ (৫) উদারবাদ (৬) বহু দলীয় পদ্ধতি।

**বঞ্চিতদের শাসন ঃ** এর মূলনীতি আটটি, তা হল ঃ

(১) বস্তুবাদী দর্শন।

(২) আল্লাহর অস্থিত্বের বিরোধীতা।

(৩) ধর্ম ও দ্বীনের অস্বীকৃতি।

(৪) পারিবারিক জীবনের পরিসমাপ্তি।

(৫) ব্যক্তি মালিকানার পূর্ণ অস্বীকৃতি।

(৬) শ্রেণী সংগ্রাম।

(৭) দলীয় একনায়কত্ব।

(৮) নেতৃবৃন্দের একনায়কত্ব।

**পোপের শাসন ঃ** ইহা রাজতন্ত্র ও স্বৈরতন্ত্রের আরেক রূপ। (আল্লাহর আইনের শাসন ১০-১৬ পৃষ্ঠা)

ঐশী আইনের শাসনই হচ্ছে মানুষের বানানো উপরোক্ত সকল শাসনের উর্ধ্বে।

**ঐশী আইনের শাসন ঃ** এর মূলনীতি হল চারটি যেমন, (১) হাকিমিয়াত (২) খেলাফত (৩) ইমামত (৪) ইন্সানিয়াত। (বিশ্ব নবী (সাঃ) এর কর্মসূচী)

এই ঐশী আইনের শাসন প্রতিষ্ঠার একমাত্র পন্থা হল "কিতাল ফি সাবীলিল্লাহ।"

বর্তমান বিশ্বে গণতন্ত্রেরই ঢংকা বাজছে সর্বত্রই। তাই আমি এর মোকাবিলায় কিতালকে প্রধান্য দিয়েছি ও গণতন্ত্রকে খেলাফত প্রতিষ্ঠার নিষ্ফল পন্থা হিসেবে এবং কুফরী মতবাদ হিসেবে চিহ্নিত করেছি ও তার বাস্তব প্রমাণ পেশ করেছি।

গণতান্ত্রিক নিয়মে অনুষ্ঠিত নির্বাচনে একজন ভোটদাতা কারোর পক্ষে যখন

ভোট প্রয়োগ করে, তখন তার এই ভোট দানের মাধ্যমে স্বতঃস্ফূর্তভাবে এবং নিঃশব্দে এই প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয় যে, "আমি তোমাকে তোমার ইচ্ছামত যে কোন আইন পাশ করার ক্ষমতা দিচ্ছি এবং ওয়াদা করছি যে, তুমি অন্যদের সাথে মিলিত হয়ে যে আইনই পাশ করবে, তা আমি নির্দ্বিধায় মেনে নেব"

কুরআনের দৃষ্টিতে আইন রচনার এইরূপ নিরংকুশ ক্ষমতা আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে দেওয়া সুস্পষ্ট শিরক। কারন, اِنِ الْحُكْمُ اِلَّا لِلّٰهِ

অর্থাৎ ঃ আল্লাহ ছাড়া কারও বিধান দেওয়ার ক্ষমতা নেই। কেননা, এর ফলে মানুষ মানুষেরই গোলাম হয়ে যায়। আল্লাহর বান্দাহ হওয়া তার পক্ষে কোন ক্রমেই সম্ভব হয় না। এভাবে যারাই মানুষকে নিজেদের গোলাম বানাতে চায়, কোরানের দৃষ্টিতে তারা মানুষের রব হতে চায়, যেমন করে নমরুদ-ফিরাউন মানুষের রব হতে চেয়েছিল। কিন্তু হযরত ইব্রাহীম (আঃ) নমরুদের রব হওয়ার এবং হযরত মূসা (আঃ) ফিরাউনের রব হওয়ার দাবী অস্বীকার ও অগ্রাহ্য করে একমাত্র আল্লাহকে রব রূপে মেনে নেওয়ার আহবান জানিয়েছিলেন। সর্বশেষ নবী ও রাসূল হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর আহবান ও ছিল সর্বতোভাবে তাই। পরিণামে নমরুদ ও ফিরাউন পর্যুদস্ত হয়েই প্রমাণ করে গেছে যে, তারা কেউই প্রকৃত সার্বভৌম নয়।

অতএব আজকের মানুষের সামনে এই প্রশ্ন সুতীক্ষ্ম হয়ে দেখা দিয়েছে ঃ তারা কি নিজেরা ভোট দিয়ে নিজেদের মত মনুষকেই রব বানাতে এবং তাদের দাসানুদাস হয়ে জীবন-যাপন করতে প্রস্তুত? না মানুষের দাসত্ব শৃংখলে বন্দী হওয়ার গণতন্ত্রকে অগ্রাহ্য করে মানুষের রব হওয়ার পথ সম্পূর্ণ বন্ধ করে, এক আল্লাহর বান্দাহ হয়ে জীবন-যাপন করতে চায়? যদি তারা বাস্তবিকই 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহর প্রতি ঈমানদার হয়ে থাকে, তাহলে প্রথমোক্ত পথ তাদের নয়। একটিই উম্মুক্ত পথ রয়েছে তা হচ্ছে শেষোক্ত পথ। বস্তুত মানুষ কখনো মানুষের গোলাম হতে পারেনা; কোন মানুষ পারেনা মানুষের রব হতে। মানুষ কেবল মাত্র আল্লাহরই বান্দাহ হতে পারে। তাই মানুষকে রব বানানোর তথাকথিত গণতন্ত্র কখনই গ্রহণযোগ্য নয়, তা সর্বতোভাবে পরিহার্য।

অতএব যারা মনে করে, "গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হলেই ইসলাম কায়েম হয়ে যাবে" কিংবা যারা "প্রথমে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত করে পরে ইসলামী হুকুমত কায়েম করার" কথা বলে, তারা যেমন গণতন্ত্র চেনেনা তেমনি জানেনা ইসলামের তওহীদী আক্বীদার তাৎপর্য, তারা ভিভ্রান্ত। এখানে এসে আমি পাঠক-পাঠিকার উদ্দেশ্যে গণতন্ত্রের"

স্বরূপ উপস্থাপন করছি-

গণতন্ত্র নামক বস্তুটির নাম বা আলোচনা শুনতে সীমাহীন অভ্যস্ত হয়ে উঠেছেন বর্তমান জন সাধারণ। আশংকাজনক বেশী পরিমাণে তথাকথিত রাজনীতিকরা এ পবিত্র (?) নামটির উচ্চারণ করে থাকেন। পৃথিবীর একপ্রান্ত থেকে আরেক প্রান্ত পর্যন্ত এখন পরম অরাধ্য বস্তুটির মহা জয় জয়কার সেই "গণতন্ত্র" জিনিসটা আসলে কি? এই "গণতন্ত্রের" জন্যে কি জীবন-যৌবন, শক্তি, প্রতিভা ও সম্পদ ব্যয় করা যায়? গণতান্ত্রিক মনোভাব নিয়ে বিশ্বের সকল মানুষ যদি সত্যিই গণতন্ত্রের পূর্ণ অনুসারী হয়ে বিশ্বময় গণতন্ত্র ক্বায়েম করেও বসে তবেই কি মানুষের স্বপ্নে দেখা সুখের পায়রা তাদের কাছে ধরা দেবে? বিশ্ববাসী কি নাগাল পাবে তাদের বহুকাংখিত শান্তি নামক সোনার হরিণের?

এ প্রশ্নের সহজ ও চূড়ান্ত ইত্তর হচ্ছে "না, পাবেনা"। কারণ-উত্তপ্ত মরু প্রান্তরে দূরে তাকালে দেখা যায় সমুদ্রের উত্তাল তরঙ্গ, মূলত ঃ সেখানে কোন পানিই নেই। উপরন্তু "গণতন্ত্র" নামক বস্তুটি কোন বিজ্ঞচিত বা সুষ্ঠু পদ্ধতি নয়। উহা একটি মুখরোচক শ্লোগান।

"গণতন্ত্র" পশ্চিমা সাম্রাজ্যবাদী শক্তির তৈরী একটি প্রতারণাপূর্ণ পরিভাষা। ইহা শয়তানের পক্ষ হতে মিষ্টার আব্রাহাম লিংকনের প্রতি ওহী (!) বা এলহাম। বাস্তবতা বিবর্জিত একটি ঘুম পাড়ানো তাবিজ। সারা বিশ্বময় কুফরী প্রতিষ্টা ও মানবতা ধ্বংসের শয়তানী তন্ত্র।

এরই মাধ্যমে খেলাফত প্রতিষ্ঠিত করার চিন্তা করা মানে- অধিকাংশ মানুষে চাইলেই নামায ক্বায়েম করা হবে, যাকাত আদায় করা হবে, শরয়ী বিচার ব্যবস্থা কায়েম করা হবে। মূলতঃ তাই যদি হয়ে থাকে তবে আল্লাহর পক্ষ থেকে হুজর পাক (সাঃ)-এর প্রতি এরূপ বার্তা কেন পৌছানো হল-"হে রাসূল, আপনি যদি পৃথিবীর অধিকাংশ লোকের কথা মনে নেন, তবে তারা আপনাকে আল্লাহর পথ থেকে বিপথগামী করে দেবে।" (সূরা আনআম-১১৬ নং আয়াত)

আমার এসব কথা হয়ত, খুব নতুন মনে হচ্ছে। অথচ ১৪ শত বছর পূর্বেই আল্লাহ তা'আলা তাঁর হাবীবকে বলে দিয়েছিলেন। আমি আমার বিশ্বাস ও ধারণাই এখানে তুলে ধরছি, একটু ভাঙ্গিয়ে বললে ব্যাপারটা আরো পরিস্কার হয়ে যাবে যে, "গণতন্ত্র" একটি শুভংকরের ফাঁকি। শোষণ নিপীড়নের একটি সুন্দর ও মনোরম অস্ত্র। হ্যাঁ 'গণতন্ত্র' এক আজব চীজই বটে। কেননা তা সরাসরি এসেছে ইংল্যান্ড থেকে। নিশ্চয়ই এটি আমদানী করা এক পরম লোভনীয় বস্তু। ইউরোপেই এই

বস্তুর আবিস্কার সেখানেই সর্ব প্রথম এর উৎপাদন। তা'ও সশ্রস্ত্র বিপ্লবের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত হয়। অতঃপর দুনিয়ার অন্যান্য দেশে এই বস্তুর রপ্তানী কার্য সম্পাদিত হয়েছে। আমাদের এই দেশে এ বস্তু রপ্তানী করা হয়েছিল ১৯৩৫ সনের ভারত শাসন আইনের মোড়কে ভরে।

"গণতন্ত্রের" পয়লা সবক-"জনগণই সকল ক্ষমতার উৎস। এ কথাটি সম্পূর্ণরুপে ইসলামী চিন্তা চেতনার পরিপন্থী। ইসলামে ক্ষমতার উৎস হচ্ছে তাকওয়া, ন্যায়নীতি ও শরিয়ত সম্মত বিধি-বিধানের অনুসরণ। এগুলোর প্রেক্ষিতেই নিশ্চিত হয় ক্ষমতাসীনের শক্তি ও যোগ্যতা। দেশের সকল জনগণ যদি একটি অন্যায় বা ব ভুল সিদ্ধান্তে একমত হয়ে যায়, তবে গণতন্ত্রের দৃষ্টিকোণ থেকে এটাই হবে ন্যায় ও সঠিক। কিন্তু ইসলাম এ জাতীয় ঐক্যমত্যে প্রতিষ্ঠিত ভুল ও অন্যায় সিদ্ধান্তটিকে কোন দিনই মেনে নেবেনা বরং শরীয়তের বিধানই হবে এক্ষেত্রে চূড়ান্ত ও অলংঘনীয়। এক কথায় অবৈধ যৌনাচার, মাদকদ্রব্য সেবন, জুয়া, সুদ, ঘুষ, হাউজী, প্রতারনা, খুন, গুম তথা এপর্যায়ের প্রতিটি অসামাজিক ও অমানবিক কাজের সপক্ষে যদি "গণতন্ত্র", "সংখ্যাগরিষ্ঠতা", সকল ক্ষমতার উৎস (?) জনগণ", এসব অস্ত্র ব্যবহার করে আইন পাশ করিয়ে নেওয়া হয়, তুবও এসব ব্যাপার বৈধ হয়ে যায় না, যেতে পারেনা। বৈধ অবৈধের প্রশ্নে শরীয়তের আইনই চূড়ান্ত। যা কোন মানুষের দ্বারা তৈরী নয়। "গণতন্ত্র" কোন ন্যায়নীতি, আদর্শ পন্থা বা সত্য ও সুন্দরের মাপকাঠি নয়, হতে পারেনা। কারণ, শতকরা ৮৫ জন চোরে ভোটে যদি একজন চোর নির্বাচিত হয়ে যায় আর বাকী ১৫ জনের ভোট পেয়ে একজন সৎ ও যোগ্য ব্যক্তি হেরে যায়, তবে এখানে গণতন্ত্রেরই বিজয় হয়েছে বলে আমরা ধরে নেব সত্যের নয়, ন্যায়নীতি বা ইনসাফের বিজয় নয়।

"গণতন্ত্রে" আরেকটি বিরাট ফাঁক রয়েছে যা সাধারণত: আমরা ধরতে পারিনা। সংখ্যাগরিষ্ঠের শাসন বলে গণতন্ত্র পরিচিত হলেও মূলত অধিকাংশ ক্ষেত্রেই গণতন্ত্রের নামে অল্প সংখ্যক লোক অধিকাংশ লোকের উপর শাসন চালায় যেমন- ১০০ জন ভোটার, প্রার্থী ৮ জন। একজন প্রার্থী কমিউনিষ্ট, তার কর্মী ও ভোটের সংখ্যা ৩০। গণতান্ত্রিক, ধর্মনিরপেক্ষ, জাতীয়তাবাদী, ইসলামী ও স্বতন্ত্র মিলে বাকি ৭ জন প্রার্থী। তারা প্রত্যেকেই কম বেশী ভোট পেয়ে ফেল করলেন। পাশ করলেন কমিউনিষ্ট পার্টির প্রার্থীটি। এক্ষেত্রে তিনি বেশী ভোট পেয়ে পাশ করলেও মূলত : তিনি সংখ্যালঘুদের প্রতিনিধি। আর বিভিন্ন দলে বিভক্ত ৭০ জন লোকের

মতামত এখানে সংখ্যাগরিষ্ট জনমত হয়েও পরাজিত। এ সরকারের সহজ হিসাব হবে ৭০ জনের উপর ৩০ জনের মতামত চাপিয়ে দেওয়া। সংখ্যাগরিষ্টের উপর সংখ্যালঘুর শাসন। সারা বিশ্বে গণতন্ত্রের নামে এ অন্যায় কান্ডটি খুব ডাকঢোল পিটিয়ে চলছে।

আমার আরও একটি কথা-আন্তর্জাতিকভাবে যদি ঘোষণা দেওয়া হয় যে, ভোটের মাধ্যমে নির্বাচিত করা হবে কোন্‌টি সত্য ধর্ম। যেটি নির্বাচিত হবে সেটিই সবাইকে গ্রহণ করতে হবে। এবার দেখুন পৃথিবীর মানুষের সংখ্যা প্রায় ৬ শত কোটি, এর মধ্যে ১৪০ কোটি মুসলিম বাকী সব বিজাতি। এখানে বিজাতির একটি ধর্ম সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করল। এবার আপনি বলুন-আমি ইসলাম ধর্ম ত্যাগ করে ঐ সত্য (?) ধর্মই গ্রহণ করব। নাঊজুবিল্লাহ।

এবার আসা যাক ভোট ও ভোটার প্রসেঙ্গ "গণতন্ত্রের" সমালোচনা করে প্রাচ্যের কবি আল্লামা মোহাম্মদ ইকবাল বলেছেন: "গণতন্ত্র এমন একটি ব্যবস্থা যেখানে মানুষের মাথা গোনা হয়, কিন্তু ওজন করা হয় না।" যেমন-ধরুন কোন দেশে প্রশাসনিক নির্বাচন করা হচ্ছে বা জাতীয় নীতি-নির্ধারনী মতামত গ্রহণ করা হচ্ছে। সেখানে প্রত্যেক নাগরিকের ১টি করে ভোট। একজন লম্পট, খুনী, জুয়াড়ী, মদ্যপ যেমন এক ভোটের মালিক, তেমিন একজন সৎ, নিষ্ঠাবান, যোগ্য, খোদাভীরু ব্যক্তির ও একটিই ভোট। সর্বোচ্চ ডিগ্রীধারী শিক্ষিত, বুদ্ধিজীবি-প্রতিভাবান, জ্ঞানী-বিজ্ঞানী নাগরিকদের ভোট ও মুর্খের ভোটের ক্ষেত্রে কোনরূপ পার্থক্য গণতন্ত্রে নেই। একটি বিড়ি ও এক খিলি পান খেয়ে ভোট দিতে রাজি হয়ে যাওয়া ভোটার ও বিশ্ব বিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলার, দার্শনিক-চিন্তাবিদ, বিচারপতি সবার ভোটই গণনায় সমান। এপর্যায়ে গণতন্ত্রকে ঐ দেশের সাথেই তুনা করা যায় যেখানে ঘি ও পানির একই মূল্য থাকায় এক ব্যক্তি সেখান থেকে পালিয়ে গিয়ে ছিল। বলেছিল-এদেশে ন্যায়-অন্যায়ের পার্থক্য নেই, এদেশে যোগ্যতার মর্যাদা নেই, উত্তম-অধমের বাচ-বিচার নেই, এখানে বাস করা উচিত নয়। অথচ এ ব্যক্তিটির আরেক বন্ধু সে-দেশে থেকে গিয়েছিল। এক সময় রাজার অন্যায় নির্দেশে ঐ বন্ধুটির ফাঁসি হয়ে যায়। এ ঘটনা অনেকেই জানেন। এখানে সেটি মূল উদ্দেশ্য নয়। তবে যে কথাটি আমি এখানে তুলে ধরতে চাইছি, সেটি হল : যোগ্য, সৎ, শিক্ষিত ও নীতিবান ১০০ লোকের সুচিন্তিত সঠিক রায় আর ১০ হাজার অবোধ, সিগেরেট ও পানের বিনিময়ে ভোট প্রদানকারীর ভোটের মধ্যে কোন গুলো শক্তিশালী? এ বিষয়টি গণতন্ত্রীদের ভেবে দেখতে হবে।

"গণতন্ত্র" নামক পবিত্র (?) বস্তুটি কায়েমের জন্য যারা প্রাণ দিতে পর্যন্ত কুণ্ঠিত হন না, তারা আবার যদি "গণতন্ত্র" নামক ব্যবস্থাটি নিয়ে নতুন করে গভীরভাবে চিন্তা-ভাবনা করেন, তবে তাদের ধারণায় নিঃসন্দেহে কিছু পরিবর্তন আসবে। কেননা ইসলাম কোন দিনই উল্লেখিত গণতন্ত্রকে সমর্থন করে না। ইসলামের সাথে পাশ্চাত্য গণতন্ত্রের খুব দূরবর্তী কোন সম্পর্কও নেই। গণতন্ত্র নামক অধুনা প্রচলিত ও পরম কাংখিত পদ্ধতিটি ও ইসলামী চিন্তা চেতনার চরম বিরোধী একটি মনগড়া ধারণা, অন্যান্য তাগুতী মতবাদের মত গণতন্ত্রের খপ্পর থেকেও বিশ্বের মুসলমানদের সচেতনভাবে বেঁচে থাকতে হবে। জোরগলায় বলতে হবে, "গণতন্ত্রে" নয় জিহাদের মাধ্যমেই" মানবতার মুক্তি ও সাফল্য আনয়ন সম্ভব।
তাইতো আল্লাহ পাক বলেন- সূরা হজ্জের ৩৯ নং আয়াত।

এবার আসুন তাওহীদি আকীদার তাৎপর্যের দিকে, রাসূলে করীম (সাঃ) কুরাইশ সরদারদের নেতৃত্ব সাময়িকভাবে মেনে নিলে "জিহাদ ফি সাবীলিল্লাহর" সব দুঃখ কষ্ট-নির্যাতন-হিজরত থেকে সহজেই নিস্কৃতি পেতে পারতেন। সে পথ গ্রহণের কত প্রস্তাব-কত প্রলোভনই না তাঁর সমীপে পেশ করা হয়েছিল। কিন্তু তিনি তাওহীদী আক্বিদায় বলীয়ান হয়ে এবং ও পথে ইসলাম ক্বায়েম হতে পারেনা, এটা নিঃসন্দেহে বুঝতে পেরে সে সব প্রস্তাব-প্রলোভনকে ঘৃণা ভরে দু'পায়ে দলে গেছেন। প্রতিমুহূর্তে প্রতিদিনের নির্যাতন নিস্পেষণের পথে পা বাড়িয়েছেন, কিন্তু শিরক ও কুফরের এক কুসুমাস্তীর্ণ পথে পা বাড়াননি। তিনি ভুলেও কখনও এই মত গ্রহণ করেন নি যে, "ইসলাম মানুষের মন জয় করা ছাড়া কিছুতেই চালু করা সম্ভব নয়" বা "মানুষের মন জয় করেই ইসলাম কায়েম করতে হয়।" কুরাইশ সরদারের দাবী ও প্রস্তাব মেনে নিলেই নবী করীম (সাঃ) তাদের মনজয় করতে পারতেন, কিন্তু তিনি তা প্রত্যাখান করে তাদের মন জয় না করেই সোজাসুজি ও সরাসরি জনগণের সামনে ইসলামের বিপ্লবী দাওয়াত পেশ করতে থাকলেন। অতএব, "আগে গণতন্ত্র তার পরে ইসলাম" কথাটি নবী করীম (সাঃ)-এর সুন্নাত ও কর্মসূচীর সম্পূর্ণ পরিপন্থী।

সুতরাং "জিহাদ ফি সাবীলিল্লাহ"-তথা "কিতাল"-ই খেলাফত প্রতিষ্ঠার একমাত্র মাধ্যম আর এর প্রকৃষ্ট প্রমাণ হল বর্তমান আফগানিস্তান। তা যদি আপনার বিশ্বাস না হয় এবং বুঝে না আসে, তাহলে প্রমাণ স্বরূপ আপনি এমন একটি রাষ্ট্র দেখান, যেখানে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে খেলাফত প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং এখনো পরিচালিত হচ্ছে। আপনি আপনার ধারণায় বলতে পারেন-ইরানে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে ইসলামী রাষ্ট্র পরিচালিত হচ্ছে। আমি বলব ইরানে যে ভ্রান্ত শিয়া মতবাদ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তাও তথাকথিত শিয়া বিপ্লবের দ্বারা। তাছাড়া ইরানে যে পদ্ধিতিতে রাষ্ট্র পরিচালিত

হচ্ছে তাকে উদাহরণ হিসেবে টানা এজন্যেই ভুল হবে যে, এটা পুরোপুরি গণতান্ত্রিক নয়। এখানে প্রথমে ১টি সফল বিপ্লব সংঘটিত হয়। অতঃপর এমন কিছু নিয়ম-নীতি ও আইন গৃহীত হয়, যার ভিত্তিতে দেশটি পরিচালিত হচ্ছে। নির্বাচন সেখানে মূখ্য ব্যাপার নয়। ইরানে নির্বাচিত প্রেসিডেন্ট পুতুল সমতুল্য, ধর্মীয় নেতাই হলেন সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী। আর তাদের ঐ সরকার যদি ইসলামী হয়ে থাকে তাহলে কেন তারা তালেবানদের প্রতিষ্ঠিত খেলাফতের বিরুদ্ধাচরণ করছে? শিয়া কাফের হওয়াতে কারো দ্বিমত নেই। এদিকে তালেবানদের প্রতিষ্ঠিত খেলাফতইতো খোলাফায়ে রাশেদ্বিনের নজির বহন করছে। আর ইহাই "আহলে সুন্নাহ ওয়াল জামাতের" সমস্ত ওলামায়ে কেরামের অভিমত।

একথা আমাদের ভালভাবে জেনে নেওয়া উচিত যে, "জিহাদ" তথাকথিত কোন রাজনৈতিক কর্মকান্ড নয়, আল্লাহর এক অলংঘনীয় বিধান, একটি গুরুত্বপূর্ণ ও শ্রেষ্ট এবাদত; যে বিধান ও এবাদতের কথা পবিত্র কোরআনের এক ষষ্ঠমাংশ জুড়ে ব্যাপকভাবে আলোচিত হয়েছে।

এখানে আমি হুজুর (সাঃ) সহ তাঁর সাহাবীগণের রাজনীতি ও বর্তমান রাজনীতির কিঞ্চিত খতিয়ান পেশ করব। দুইয়ের মাঝে যেটা আদর্শ রাজনীতি প্রমাণিত হবে সেটাই গ্রহণ করব।

<u>**আদর্শ রাজনীতি ঃ**</u> বিশ্বনবী (সাঃ) অতীব দানশীল ছিলেন, ব্যক্তিগত ও রাষ্ট্রীয় তহ্‌বিলে কোন ধনই তিনি জমিয়ে রাখতেন না; বরং সবই অভাবগ্রস্তদের মধ্যে বিতরণ করে দিতেন। এমনকি হাতে কিছু না থাকলে কর্জ করেও অভাব গ্রস্ত দেরকে দান করতেন। (শামায়েলে তিরমিযী)

একদা এক বদ্ধু আগমন করতঃ রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর পরিহিত চাঁদর সজোরে টেনে বলল: "হে মুহাম্মদ (সাঃ) এ ধন আল্লাহর। তোমার নিজস্ব বা তোমার পিতার ধন থেকে দিতে হবে না। এক উট বোঝাই করে আমাকে দান কর।" এ অভদ্রোচিত ব্যবহারেও করুণার মূর্ত প্রতীক রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বিরক্ত হলেন না; বরং প্রশান্ত মনে উত্তর দিলেন ঃ "বাস্তবিকই এ ধন আল্লাহ তা'আলার এবং আমি এর হেফাজতকারী মাত্র।" তৎপর তিনি আদেশ দিলেন-"এক উট বোঝাই যব ও এক উট বোঝাই খেজুর এ বদ্ধুকে দিয়ে দাও"

বলুন, আমাদের দেশের কোন সরকার এরূপ দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে পারছে? বরং তারা কোন প্রকারেই সরকার গঠন করতে পারলে হয়-পারে না যে, জনগণের সব সম্পত্তি লুফে নিতে। এর শত শত প্রমাণ রয়েছে। বিভিন্ন সরকার বিভিন্ন উপাধি পেয়ে রাষ্ট্র-পরিচালনা করে চলে গেছেন। কিন্তু কোন সরকারের "দানশীল"

হওয়া উপাধিটা মানুষ শুনলনা। এ কি রকম রাজনীতি যেখানে বদান্যতা নেই। আমার নবীর বদান্যতা দেখুন, এক ব্যক্তি তার দূরাবস্থা বর্ণনা করে রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর নিকট কিছু প্রার্থনা করল। তিনি তাকে বকরীর একটি পাল দান করলেন। এ ব্যক্তি স্বীয় সম্প্রদায়ের নিকট প্রত্যাবর্তন করে, বলে বেড়াতে লাগল, "হে লোক সকল, তোমরা ইসলাম গ্রহণ কর। মুহাম্মদ (সাঃ) এরূপ দান করেন যে, অস্বচ্ছলতার কোন আশংকাই থাকেনা।"

একবার ফিদাক হতে ৪টি উট বোঝাই শস্য আসল। কিছু ঋণ ছিল, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) তা পরিশোধ করলেন; আর কিছু বিতরণ করে দিলেন। তৎপর তিনি হযরত বিলাল (রাঃ)-কে জিজ্ঞেস করেন: "আর কিছু অবশিষ্ট নেইতো?" হযরত বিলাল (রাঃ) উত্তরে বলেন ঃ "আর কোন প্রার্থী নেই; কাজেই কিছুটা রয়েছে" রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন-"পার্থিব এ সম্পদ অবশিষ্ট থাকা পর্যন্ত আমি গৃহে প্রবেশ করতে পারিনা।" সুতরাং রাত্রিটি তিনি মসজিদেই কাটালেন। সকালে বিলাল (রাঃ)-এসে সুসংবাদ প্রদান করলেন ঃ "হে আল্লাহর রাসূল (সাঃ) আল্লাহ আপনাকে দায়িত্ব মুক্ত করেছেন অর্থাৎ যা কিছু অবশিষ্ট ছিল সব বিতরণ করা হয়েছে।" এতে তিনি আল্লাহ তা'আলার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করলেন।

এরকম বৈশিষ্ট্যের কিঞ্চিত বৈশিষ্টপূর্ণ কোন রাজনৈতিক নেতা কি আপনি পেয়েছেন? নিশ্চয় না, তাহলে কোন্ রাজনৈতিক নেতাকে আপনি অসুরণ করছেন এবং কোন্ ধরনের রাজনীতি আপনি করছেন? যেখানে মানুষের অভাব-অনটনের প্রতি ভ্রুক্ষেপ করা হয় না, তা কিভাবে আদর্শ রাজনীতি হতে পারে?

অধিকাংশ সময় ক্ষুধার কারণে রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর স্বর ক্ষীণ হয়ে পড়ত। ক্ষুধার্ত অবস্থায় তিনি একদিন হযরত আবু আইয়ুব আনসারী (রাঃ)-এর গৃহে গমন করলে তিনি আহারের বন্দোবস্ত করলেন। তখন রাসুলুল্লাহ (সাঃ) রুটির উপর সামান্য গোশত রেখে বলেন ঃ "এটা ফাতেমার নিকট পাঠিয়ে দাও। কয়েকদিন যাবৎ তার ভাগ্যে খাবার জোটেনি।"

এখানে আমাদের জন্য শিক্ষা হল-রাষ্ট্রপতি রাষ্ট্রীয় সম্পদকে নিজস্ব সম্পদ হিসেবে ব্যবহার করতে পারবে না। প্রয়োজনে ক্ষুধার্ত দিনাতিপাত করতে হবে। অথচ আমরা বর্তমান রাষ্ট্রপতিগণকে রাষ্ট্রীয় সম্পদ নিয়ে বিলাসিতায় ডুবে থাকতে দেখেছি, বিদেশে স্বর্ণের পাহাড় গড়তে দেখেছি, প্রতি সপ্তাহান্তে, স্বপরিবারে বিদেশ ভ্রমণে দেখেছি। এ কিরুপ আদর্শ রাজনৈতিক দলের আদর্শ নেতা?

একবার রাসূলুল্লাহ (সাঃ) হযরত আলী (রাঃ) প্রদত্ত একটি স্বর্ণের হার হযরত

ফাতেমা (রাঃ)'র গলায় দেখতে পেয়ে বলেনঃ "হে ফাতেমা তুমি কি লোক মুখে একথা শুনাতে চাও যে, মুহাম্মদ (সাঃ)'র কন্যা আগুনের শিকল পরিধান করে রয়েছে? হযরত ফতেমা (রাঃ) তৎক্ষণাত হারটি গলা হতে খুলে বিক্রয় করলেন এবং এর মূল্য দিয়ে একটি গোলাম খরিদ করতঃ তাকে আযাদ করে দিলেন। একবার হযরত আয়শা (রাঃ) সোনার কাঙ্গন পরিধান করলেন রাসুলুল্লাহ (সাঃ) তা ফেলেদেন এবং বলেন-এটি মুহাম্মদের স্ত্রীর উপযোগী নয়। তিনি বলতেনঃ "একজন মুসাফিরের জন্য যে পরিমান পাথেয় প্রয়োজন, মানুষের জন্য দুনিয়াতে ঠিক ততটুকুই যথেষ্ঠ।" (বিশ্বনবী (সাঃ)'র কর্মসূচী)

এবার আমার নবীর সাহাবাগণের রাজনীতি দেখুন। হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রাঃ) এর হাতে যখন খেলাফতের দায়িত্ব অর্পিত হয়, তখনকার সময়ের কথাঃ একদা তাঁর স্ত্রী তাঁকে লক্ষ্য করে বলেন: "ছেলে-মেয়েরা মিষ্টি দ্রব্য খেতে চাচ্ছে"। তিনি উত্তরে বলেন- সরকারী তহবীল হতে তা দেয়া যাবেনা। তবে আমাদের দৈনন্দিন খরচ হতে কিছু কিছু বাঁচিয়ে পারলে সংগ্রহ করতে পার। কিছু দিন পর তাঁর স্ত্রী সামান্য অর্থ তাঁর সম্মুখে হাযির করে মিষ্টি তৈরী করার উদ্দেশ্যে কিছু জিনিস এনে দেয়ার জন্য তাঁকে অনুরোধ করলেন। তিনি এ অর্থ সরকারী তহবিলে ফেরত দিয়ে কোষাধ্যক্ষকে বলেন: সরকারী তহবিল হতে আমাকে যা দেয়া হয় ইহা তারই এতদিনের উদ্বৃত্ব। বুঝা গেল যে, এর চেয়ে কমেও আমার চলে। সুতরাং আমার বেতন হতে এ পরিমাণ কম করে দিও। এরূপ দৃষ্টান্ত দুনিয়ার কোথাও পাওয়া যাবে কি? তদুপরি আশ্চর্যের বিষয় এই যে, তার ওফাতের সময় ঘনিয়ে আসলে তিনি গৃহ বাসিকে বলেন: আমার অমুক অমুক বন্ধু জবরদস্তি করে আমাকে বাইতুল মাল হতে বেতন নিতে বাধ্য করেছিলেন এত দিনে প্রায় ৬ হাজার দিরহাম বায়তুল মাল হতে আমার জন্য খরচ হয়েছে। আমার ইন্তেকালের পর আমার জমি বিক্রয় করে এ অর্থ বায়তুলমালে ফেরত দিবে"। তিনি আরও বলেন ঃ "বায়তুলমাল হতে আমাকে একটি উটনি একটি বাসন একটি চাঁদর এবং ক'জন চাকরানীও দেওয়া হয়েছিল। এসবই বায়তুলমালে ফেরৎ দিবে।" তাঁর ইন্তেকালের পর হযরত আয়শা (রাঃ) এসমস্তই পরবর্তী খলিফা হযরত ওমর (রাঃ) এর নিকট পাঠিয়ে দিলেন। হযরত ওমর (রাঃ) বলেন: আবু বকর (রাঃ)'র উপর আল্লাহর অপার রহমত তিনি স্বীয় স্থলাভিসিক্তগণের জন্য অতি কঠিন নমুনা রেখে গেলেন।

অন্তিমকালে হযরত আবু বকর (রাঃ) আরও বলেন: যে বস্ত্র আমার পরিধানে আছে উহাই ধৌত করে আমার কাফন দেবে। হযরত আয়শা সিদ্দিকা (রাঃ) বলেনঃ আব্বাজান ইহাতো পুরাতন। তিনি বলেন: আমার জন্য এই পুরাতন ছিন্নবস্ত্রই যথেষ্ট।

হযরত আবু বকর (রাঃ) অন্তিমকালে পরবর্তী খলিফার জন্য হযরত উমর (রাঃ)-এর নাম শীর্ষস্থানীয় সাহাবাগণের নিকট প্রস্তাব করেন। এ প্রস্তাব তাঁরা অত্যন্ত পছন্দ করেন। কিন্তু কেউ কেউ বলেনঃ "এ তো সত্য যে উমর সর্বোত্তম ব্যক্তি, কিন্তু তাঁর স্বভাবে কিছুটা কঠোরতা আছে"। আবুবকর (রা) উত্তরে বলেনঃ তাঁর উপর খেলাফতের ভার অর্পিত হলে এ কঠোরতা আপনা আপনিই বিদূরীত হয়ে পড়বে। অতঃপর তাঁরা সকলেই এ সিদ্ধান্তে একমত হলেন। এদিকে উমর (রাঃ) বলেনঃ "সেই ব্যক্তিই আমার নিকট অধিক প্রিয় যে আমার দোষত্রুটি আমাকে জ্ঞাত করায়"। এবার দেখুন ওমর (রাঃ) এর রাজনীতি ঃ

একদা রাত্রে হযরত উমর (রাঃ) বেরিয়ে ছিলেন এবং পর্যবেক্ষণ করছিলেন যে, কে কোন অবস্থায় আছে? হঠাৎ এক ঘর থেকে গানের আওয়াজ শুনতে পেয়ে হযরত উমর (রাঃ) থমকে দাঁড়ালেন। আওয়ায জনৈকা যুবতীর ছিল আর সুললিত কণ্ঠে বিচ্ছেদের গান গেয়ে যাচ্ছিল। হযরত উমর (রাঃ) বিস্মিত মনে গান শুনতে ছিলেন এবং সন্দেহ করছিলেন যে, এত গভীর রাত্রে কোন যুবতী এভাবে প্রেমের গান গাইবে কেন? কোন অবৈধ কাজতো হচ্ছে না এ ঘরে? এসন্দেহ করেই তিনি দরজায় গিয়ে হাঁক মারলেন-এ ঘরে কে আছে? দরজা খোল। আমিরুল মু'মিনের আওয়াজ চিনতে পেয়ে গায়িকা যুবতী ভয়ে স্তব্ধ হয়ে গেল। কিছু বলতে পারছেনা বা উঠে দরজাও খুলতে পারছেনা। ফলে উমর (রাঃ)'র মনে সন্দেহ আরও ঘনী ভূত হল, নিশ্চয়ই এখানে অবৈধ একটা কিছু হচ্ছে, অন্যথায় প্রেমের গান তাও সুমধুর স্বরে আবার গভীর রাত্রে রুদ্ধ দ্বারে দরজাও খুলছেনা কেন, আমার আওয়াজ শুনে নিরবও হয়ে গেল কেন? দরজা কেউ খুলছেনা দেখে আমিরুল মু'মিনি আর কাল বিলম্ব করতে পারলেন না দেয়াল ডিঙ্গিয়ে ভিতরে ঢুকে পড়লেন এবং জিজ্ঞেস করলেন বল, এত রাতে এই প্রেমের গান কোন যুবতী গেয়েছিলে। যুবতী সে ঘরে মাত্র একজনই ছিল। তাই উমর (রাঃ) বুঝতে পারলেন যে, এ যুবতীই গান গেয়েছিল। তাই তাকে বজ্র কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলেন তুমি কি জাননা যে, মুসলিম মহিলার আওয়াজ ও আউরাত (পর্দা)? কেন অপরিচিত বেগানা পুরুষদেরকে তোমার আওয়াজ শুনালে? তাও গানের আকারে, তুমি অপরাধ করেছ। এবার যুবতী সাহস করে কথা বলছে, আমীরুল মু'মিনীন! আপনি আমাকে অপরাধ করেছি বলে আখ্যায়িত করেছেন, কিন্তু আপনি একত্রে তিনটি অপরাধ করেছেন। কোরআনের এবং হাদীসের বিরুদ্ধাচরণ করেছেন। কোরআনের বিরুদ্ধে দু'টি আর হাদিসের বিরুদ্ধে একটি মোট তিনটি অপরাধ করেছেন। আপরাধের নাম শুনে হযরত ওমর (রাঃ) ঠান্ডা হয়ে গেলেন। তিনি তাঁর শানে একজন সাধারণ মহিলা বে-আদবী করেছে বলে

তাকে শাস্তি দিলেন না বরং গরম মেযাজ শিথিল হয়ে পড়ল। তিনি মনে মনে লজ্জিত হলেন, সম্ভবত কোন অপরাধ হয়ে গেছে। তাই তিনি নম্রসুরে জিজ্ঞেস করলেন আমি কি অপরাধ করেছি বোন? বলতো দেখি! যুবতী বলল হুজুর, একটি নয় তিনটি অপরাধ করেছেন আপনি। পবিত্র কোরআনে সুস্পষ্ট নির্দেশ রয়েছে আল্লাহর: "তোমরা অপরের ঘরে উচ্চ স্বরে সালাম এবং অনুমতি ছাড়া প্রবেশ করোনা" আপনি আমার অনুমতি ব্যতিরেখে এবং সালাম না দিয়ে আমার ঘরে প্রবেশ করেছেন। এভাবে আপনি কোরআনের বিরুদ্ধাচরণ করেছেন। এটা আপনার প্রথম অপরাধ। কোরআনে এটাও স্পষ্ট উল্লেখ রয়েছে: "ঘরের দরজা দিয়েই ঘরে ঢুকবে।" আপনি দেয়াল ডিঙ্গিয়ে ঘরে প্রবেশ করেছেন কোন অধিকার বলে? এটা আপনার দ্বিতীয় অপরাধ। তৃতীয় অপরাধ হচ্ছে এই, "হাদীস শরীফে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন যে, অপরিচিতা বেগানা মহিলার নির্জনতায় বা একাকিত্বে ভিন্ন পুরুষের প্রবেশ করা জায়েয নেই। সুতরাং আমি নির্জনে আছি, আমার নির্জনতায় প্রবেশ করার অধিকার আপনি কোথায় পেলেন? এবার হযরত উমর (রাঃ) একেবারে শিথিল হয়ে গেলেন এবং লজ্জিতও হলেন মনে মনে। অতি নম্রস্বরে বললেন : বোন আমি অপরাধ করেছি তুমি আমাকে মাফ করে দাও। (আল্লাহু আকবর) কোথায় তিনি ব্রজকণ্ঠে যুবতীকে অর্ডার দিচ্ছিলেন এবং কোথায় তিনি সেই যুবতীর কাছে ক্ষমা চাচ্ছেন যে তুমি আমাকে মাফ করে দাও। এতদুত্তরে যুবতী বলল, আপনি আমার অপরাধ কখন করলেন যে, আমি মাফ করব? যার অপরাধ করেছেন তার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করুন। কোরআন ও হাদীসের বিরুদ্ধাচরণ করেছেন সুতরাং আল্লাহ ও রাসূল (সাঃ)'র কাছে মাফ চান। আমি কি ক্ষমা করতে পারি? এখন হযরত ওমর (রাঃ) আরও লজ্জিত হলেন এবং আর বিরক্তি না করে নিরবে প্রস্থান করলেন সেখান থেকে। নিজ ঘরে প্রত্যাবর্তন করে সারারাত ধরে আল্লাহর কাছে কান্না কাটি করেন। শেষ রাতে আল্লাহর পক্ষ থেকে তিনি বুঝতে পারলেন যে, আল্লাহ পাক তাঁকে মাফ করে দিয়েছেন। পরের দিন দরবারে নোটিশের মাধ্যমে যুবতীটিকে হাযির করলেন এবং বললেন; আমি আমিরুল মু'মিনীন হিসেবে তোমার কাছে জিজ্ঞাসা করার পূর্ণ অধিকার রয়েছে যে, কেন তুমি এত গভীর রাত্রে তোমার কণ্ঠ পরপুরুষকে শুনতে দিলে? তাও সুললিতকণ্ঠে গানের মাধ্যমে? এর কারণ কি? খুলে বল। তার স্বীকারোক্তির পর প্রমাণ হল যুবতী নির্দোষ এবং তাকে সসম্মানে বিদায় দেওয়া হল।

ওমর (রাঃ)'র শাসন আমলে মদীনা মুনাওয়ারায় ইসলামী খেলাফতের বিভিন্ন এলাকার প্রাদেশিক শাসন কর্তাদের এক মহা সম্মেলন আহবান করেছিলেন। সে

মহা সম্মেলনে তিনি ভাষণ দিতে গিয়ে একটি গুরুত্বপূর্ণ কথা বলেছিলেন। তিনি বলে ছিলেন ঃ

"ফোরাতের তীরে যদি একটি কুকুরও না খেয়ে মরে,
আমি ওমরকে জবাব দিতে হবে আল্লাহ্‌র দরবারে॥"

বলুন তো বর্তমানে এমন কোন রাষ্ট্রপতি আছে যে দেশের জনগণের পূর্ণ অধিকার আদায়ের এরূপ প্রতিশ্রুতি দিতে পারে? তাইতো স্যার এ্যাডমন্ডবার্ট নামক জনৈক বিখ্যাত পার্লামেন্টারিয়ান তাঁর এক গুরুত্বপূর্ণ ভাষণে বলেছিলেন যে, "মুহাম্মদ (সাঃ) এর অনুসারীরা যে শাসন ব্যবস্থার সূচনা করেছিলেন অন্ততঃ পরবর্তী এক হাজার বছরের মধ্যে এমন কোন দুর্ঘটনার সন্ধান আমরা পাইনি যে, তাদের দ্বারা শাসিত এলাকার মানুষ দূর্ভিক্ষের শিকার হয়েছে বা মানুষ না খেয়ে মরেছে"।

**ভ্রষ্ট রাজনীতি ঃ** এবার দেখুন আমাদের দেশে তথাকথিত গণতান্ত্রিক নিয়মে প্রচলিত রাজনীতির কিঞ্চিত খতিয়ান: ১৯৯০ সালের শেষের দিন গুলি বাংলাদেশের রাজনৈতিক অঙ্গনে ভয়ঙ্করভাবে উত্তপ্ত ছিল। লাগাতার হরতাল, জ্বালাও পোড়াও, ভাংচুর টিয়ার গ্যাস, পুলিশি তৎপরতায় দেশবাসী আতঙ্ক আর অজানা আশংকায় সেই দিনগুলি অতিবাহিত করেছেন। এসব কর্মের সাথে প্রকাশ্য রাজপথে "দিগম্বর" ঘটনাও ঘটেছিল মহা সমারোহে। অবশেষে মুক্তি পেয়েছে বহুল প্রত্যাশিত ধন "গণতন্ত্র"। এর পর যারা গণতান্ত্রিক অধিকার হিসেবে হরতাল, জ্বালাও পোড়াও, দিগম্বরের মত ঘটনার মাধ্যমে ক্ষমতায় গেলেন, তারাই এখন এসবের বিরুদ্ধে ফতোয়া দিচ্ছেন, ঘৃণা প্রকাশ করছেন। অথচ, সেদিন দিগম্বর বা হরতাল করা অবৈধ ছিলনা এবং তারা এর বিরুদ্ধে কোন কথাও বলেননি। ক্ষমতায় গেলে এভাবেই বুঝি রাজীনতির ভাষা পাল্টে যায়। বৈধ অবৈধের রং পাল্টায়। এভাবে আজকের অবৈধ ঘুষ, দুর্নীতি, ব্যভিচার আগামী দিন ক্ষমতায় গিয়ে কোন সরকার বৈধ ঘোষণা করবেন না, তার কোন গ্যারান্টি আছে?

এদেশের ধর্ম নিরপেক্ষতার ধ্বজাধানী রাজনীতিকরা রাজনীতির সাথে ধর্মকে যুক্ত করা সাংঘাতিক ঘৃণ্য কর্মকান্ড বলে মনে করেন। কারণ ধর্ম ভিত্তিক রাজনীতিকরা নাকি ধর্মের নামে রাজনীতির ব্যবসা করেন, তারা সম্প্রদায়িকতা নামের ঘৃণ্য মনোবৃত্তিকে উস্কে দেন। এছাড়া তারা নাকি মৌলবাদ, ধর্মান্ধতা, প্রতিক্রিয়শীলতা, প্রগতিবিরুদ্ধকর্মকান্ডের পৃষ্ঠপোষকতা করে দেশকে ধ্বংসের দিকে ঠেলে দেন। প্রিয় পাঠকবৃন্দ! আপনারা নিশ্চয় ভুলে যাননি ঘাদানী কমিটির ধর্মীয় রাজনীতি নিষিদ্ধের দাবী, প্রভৃতি ধর্মীয় রাজনীতি বিরুদ্ধ কর্মকান্ডের কথা। এদের হোতাদের

পরিচয় ও আপনারা নিশ্চয় ভুলে জাননি। ধর্মীয় রাজনীতির লাইনে অগ্রসর এক দলকে এরা প্রতি পদে পদে লাঞ্ছিত করেছে। তাদের নামের পূর্বে বাংলা অবিধানের সকল ঘৃণ্য বিশেষণ যুক্ত করে দেশব্যাপী তাদেরকে কুখ্যাত হিসেবে পরিচিত করার জন্য তারা কি না করেছে। ১৯৮৬ তে এদলটি গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য সংসদ থেকে পদত্যাগ করলে সংসদ ভেঙ্গে যাওয়ার সূচনা হয়। তাদের পথ ধরে আওয়ামী লীগ ও অন্যান্যরাও পদত্যাগ করলে সংসদ ভেঙ্গে যায়, এরশাদ বিরোধী আন্দোলন তুঙ্গে উঠতে থাকে। ১৯৮৬-এর ন্যায় ১৯৯৩ তেও এদেশের বিরোধী রাজনীতিকরা তাদের হুবহু অসুরণ করতে থাকে। বর্তমানে জামাতে ইসলামীর সাথে তাদের মাখামাখি জনমনে বেশ কৌতুকের জন্মদিয়েছে, ধর্মাশ্রয়ী জামাতে ইসলামির রাজনীতি নাকি তাদের মতে ধর্ম ব্যবসা ছাড়া আর কিছু নয়। কিন্তু যারা তাদের সাথে মিতালী করে তাদের কর্মসূচিকে লুফে নিয়ে বা সমর্থন করে রাজনীতি করেন, তাদের রাজনীতি কোন্ ব্যবসা? জামাতের ন্যায় মৌলবাদী প্রতিক্রিয়াশীল "রাজাকার" একটি দলের সাথে আন্দোলন করে যারা আগামী নির্বাচনে ক্ষমতায় যাওয়ার স্বপ্ন দেখছে, তারা কোন্ কাননের ফুল? নাকি তারা ভাবছেন যে, চুরি যে করে আর যে চুরি বিদ্যাকে সমর্থন করে এদের মধ্যে পার্থক্য আছে?

বাংলাদেশ জামাতে ইসলামীর মেনুফেষ্ট অনুযায়ী ইসলামী আন্দোলন এবং ইসলামী সরকার প্রতিষ্ঠা তাদের কার্যক্রমের মূল কথা। একে কেন্দ্র করে তাদের সকল কর্মকান্ড পরিচালিত হয়। এরশাদ বিরোধী আন্দোলনের সূচনা লগ্নে দলের ভার প্রাপ্ত আমির আব্বাস আলী খাঁন বলেছিলেন "ইসলামী আন্দোলন আপাতত স্থগিত রেখে হলেও গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার আন্দোলন বেগবান করতে তারা বদ্ধ পরিকর"। প্রচলিত গণতান্ত্রিক আন্দোলন কতটুকু ইসলাম সম্মত এ প্রশ্ন করা হলে তারা স্বীকার করেন এ গণতন্ত্র কুফুরী মতবাদ। এর স্বীকৃতি তাদের বিভিন্ন বই পত্রেও রয়েছে তবে তারা ইসলাম প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে গণতন্ত্রকে ব্যবহার করা জায়েজ বলে মনে করেন। একথা তাদের যে কোন কর্মীও স্বীকার করেন। ১৯৮৬ সালের সংসদে তাদের সদস্য ছিল ১০ জন। ১৯৯১ সালের সংসদে তাদের সদস্য ছিল ১৮ জন। বর্তমানে রয়েছে রয়েছে ৩ জন। এ হলো গণতন্ত্র আশ্রিত তাদের ইসলামী আন্দোলনের পনের বছরের ফসল। এর মধ্যে ইসলাম কতখানি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে? দেশে ঘুষ, দুর্নীতি, ব্যভিচার, অশ্লীলতা ও অন্যান্য সামাজিক অপরাধ কতখানি হ্রাস পেয়েছে গত ১৫ বছরে? বরং ১৯৯১ সালে তাদের সংসদের আসন বৃদ্ধি পাওয়ার পর কি এদেশে ইসলামদ্রোহী তৎপরতার সয়লাব বয়ে যায়নি? তারা গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য সংসদ থেকে পদত্যাগ করেছেন, তত্ত্বধায়ক সরকারের দাবিতেও পদত্যাগ

করেছেন, কিন্তু ইসলাম দ্রোহী এসব তৎপরতা রোধে সরকারের ব্যর্থতার কারণে কতবার পদত্যাগ করেছেন? সংসদে বিল আনার সুযোগ পেয়েও ইসলাম প্রতিষ্ঠার সহায়ক কতটি বিল তারা সংসদে উপস্থাপন করেছেন অথবা এসব বিল পাশের জন্য কতবার তারা সংসদ থেকে ওয়াক আউট করেছেন? আমরা জানি, ১৯৮৬ সালে এরশাদ সরকার এদেশে ইসলামের জন্য ক্ষতিকর বলে তারা বিভিন্ন সময় বক্তৃতা বিবৃতিতে বলেছেন। তাই ইসলামের স্বার্থে এবং ইসলাম প্রতিষ্ঠার প্রথম সোপান গণতন্ত্রকে কবুল করে নিয়ে আন্দোলন গড়ে তোলেন। কিন্তু সে ধিকৃত স্বৈরাচারী ও ইসলামের জন্য ক্ষতিকর এরশাদের জাতীয় পার্টির সাথে মিলে জামাতে ইসলামী তখন কোন্ ইসলাম প্রতিষ্ঠায় নেমেছিল? তাছাড়া ইসলামী আদর্শের ঘোর শত্রু ধর্ম নিরপেক্ষতাবাদী রাজনীতিকদের সাথে বন্ধুত্ব করে আন্দোলন করা কোন্ মাপকাঠিতে বিচার করা হবে"? ধরা যাক চলমান আন্দোলনের ফলে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধিনে দেশে নির্বাচন হল। তখন বর্তমান তিন দলের "আঁতাত অনুযায়ী সরকার গঠিত হলে ধর্ম নিরপেক্ষ আওয়ামী লীগ হবে সরকারের প্রধান অংশীদার। অর্থাৎ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আন্দোলন থেকে বেশী লাভবান হবে ধর্ম নিরপেক্ষতাবাদে বিশ্বাসী আওয়ামী লীগ এতে দেশে ইসলাম প্রতিষ্ঠায় কতখানি অগ্রগতি সাধিত হবে? আমরা জানি, ইসলামী আন্দোলনকারীরা আদর্শের জন্য প্রয়োজনে প্রাণ বিসর্জন দেন, আপোষ করেন না। ইসলাম প্রতিষ্ঠার জন্য ইসলামের শত্রুদের সাথে আপোষ করে জাতির সামনে কোন আদর্শ চর্চার উদাহরণ সৃষ্টি করেছেন তারা?

বাংলাদেশের রাজনৈতিক অঙ্গনে বিরল প্রজাতি হলো বামপন্থী মহল। একসময় তারা সমাজতন্ত্র কায়েমের পথে এদেশে ইসলাম এবং ইসলামপন্থী রাজনীতিকদের প্রধান প্রতিবন্ধক ভাবতেন। তাই কথায় কথায় তাদের চৌদ্দগোষ্ঠী উদ্ধার করা বামপন্থীদের একটা রুটিন স্বভাবে পরিণত হয়ে গিয়েছিল, এখনও করেন, তবে তেমন জোড় পান না। একেতো বিশ্বের সমাজতন্ত্রীরা এখন বিরল প্রজাতিতে পরিণত হয়েছে। তার উপর দেশে তাদের মাতায় যারা ছাতা ধরতেন তারাও নেই। যা হোক ১৯৯১ সালের নির্বাচনের পর বি, এন, পি, জামাতে ইসলামীর সমর্থন নিয়ে সরকার গঠন করলে এরা ভয়ানক ভাবে হৈ-চৈ আর ছিঃ ছিঃ করছিলেন। জামাতের সমর্থন নেয়ার কারণে বি, এন, পি, তাদের ভাষায় মহা পাপ করেছিলেন। তাদের নেতা এমনকি প্রতিষ্ঠাতা পর্যন্ত "রাজাকার" উপাধি পেয়েছিল এ মহল থেকে। তাঁর মুক্তিযোদ্ধাত্ব নিয়ে হরেক প্রশ্নের সৃষ্টি হয়েছিল। কিন্তু মুক্তিযুদ্ধের প্রধান পৃষ্ঠপোষক ও স্বাধীনতার প্রধান স্বপক্ষ শক্তির দাবিদার আওয়ামী লীগ যখন ততোধিক ভাব

জমিয়ে জামাতে ইসলামীকে নিয়ে আন্দোলন করেন, তখন বামপন্থী মহল যেন জেগে ঘুমোচ্ছিলেন। অথচ, তাদের আগের চেয়ে বেশী সোচ্চার হওয়ার কথা। কোন্ সে যাদুমন্ত্র যার প্রভাবে বামপন্থীদের মুখে এমন কুলুপ এঁটে গেল? আল্লাহর উপর অবিচল আস্থা ও ধর্মীয় বিশ্বাসের প্রতি সরাসরি আঘাতকারী কাদিয়ানী এনজিও গোষ্ঠী, নাস্তিক ও মুরতাদদের এরাই প্রধান পৃষ্ঠপোষকতা করেছে। আহমদ শরীফ, তাসলিমা নাসরিন উপখ্যানের এরাই জন্ম দিয়েছে। এ সরকারের সময়ই ইসলামী সংস্কৃতি বিধ্বংসী মডেলিং সুন্দরী প্রতিযোগিতাসহ সকল প্রকার অপসংস্কৃতির দ্বার আবারিত করে দেওয়া হয়েছে। ধর্ম ব্যবসার উদাহরণ কেউ যদি খুঁজতে চান তবে ঐ বি এন পি সরকারের ইতিহাসের প্রতি একুট ইঙ্গিত করলেই বোধহয় যথেষ্ট হবে। বাংলাদেশে আইন করে সংবিধান সংশোধনের মাধ্যমে ইসলামকে রাষ্ট্রধর্ম করার কৃতিত্ব দেখিয়ে ছিলো জাতীয় পার্টি। তখন অবশ্য কেউ এ নিয়ে টিটকারী মেরেছে কেউ মুখটিপে হেসেছে, আর একদল করেছে কলমবাজী ও চাপাবাজী। যাহোক, জাতীয় পার্টি এতে ইসলাম প্রতিষ্ঠার মহান দায়িত্ব পালন করেছে বলে তখনকার মতো এখনো গর্বে গদগদ ভাব দেখায়। কিন্তু দেশে ইসলামদ্রোহী তৎপরতার সয়লাব হয়ে গেলেও তারা নির্বাক। আদৌ যদি ইসলামকে রাষ্ট্রধর্মে পরিণত করে তারা, তবে এর মর্যাদা রক্ষার ক্ষেত্রেও তারাই অগ্রগামী হবে এটাই স্বাভাবিক। কিন্ত তারা আজ তা হতে বিরত কেন? কিসে তাদেরকে ইসলাম প্রতিষ্ঠার আন্দোলন করতে বাঁধা দেয়?

সবশেষে ছোট্ট একটি ঘঠনা উপস্থাপন করছি। ছোট্ট হলেও এঘটনার মাধ্যমে রাজনীতিকদের চরিত্র বুঝা যায়। ২৮শে সেপ্টেম্বর ৯৫ ইংরেজী বিরোধী দলের মহা-সমাবেশ উপলক্ষে ট্রাক ভর্তি আওয়ামী লীগ কর্মীরা আসছিল উত্তরা থেকে। ২৯শে সেপ্টেম্বর জনকণ্ঠ সহ অন্যান্য দৈনিকের রিপোর্ট অনুয়ায়ী জানা যায় যে, একটি বালু ভর্তি ট্রাক তখন সাতরাস্তার মোড়ে সাইড নিচ্ছিল। একটু দেরী হলে অপেক্ষমান কর্মীরা ড্রাইবার ও হেলপারকে গালি দেয়। এতে ট্রাক শ্রমিকরা উত্তেজিত হয়ে তর্কাতর্কি শুরু করলে ট্রাক থেকে কর্মীরা নেমে বালু ভর্তি ট্রাকটি ভাংচুর করে ও শ্রমিকদের মার-ধোর করে। মুহুর্তের মধ্যে এ খবর নিকটস্থ ট্রাকষ্ট্যান্ডে পৌঁছলে ট্রাক শ্রমিকরা সমাবেশে আগত কর্মীদের ধাওয়া করে। শুরু হয়ে যায় উভয় পক্ষের ধাওয়া পাল্টা ধাওয়া। ষ্ট্যান্ডের ট্রাকগুলো উশৃঙ্খল রাজনৈতিক কর্মীরা ব্যাপক ভাংচুর করে। ফলে ট্রাক শ্রমিকরাও আরো উত্তেজিত হয় এবং সে এলাকা রণক্ষেত্রে পরিণত হয়। এ সময় আওয়ামী লীগের একজন কর্মী আহমদ আলী নিহত হয়। ৩০শে সেপ্টেম্বর পত্রিকার পাতায় দেখা যায়, নিহত আহমদ আলীর দলীয় নেত্রী তার

কফিনে শ্রদ্ধা নিবেদনের জন্য পুস্পস্তবক অর্পন করছেন। তিনি আহমদ আলীর কোন্ কৃতিত্বের জন্য এ শ্রদ্ধা জানালেন? আহমদ আলীর কর্ম কান্ড কি উশৃঙ্খলতা ও সন্ত্রাসী কর্মকান্ড বা এর অংশ হিসেবে পরিগণিত নয়? নাকি দলীয় কর্মী বলে তার অপরাধ মুছে গেল, প্রাণ দিয়েছিল বলে পুস্পস্তবকের শ্রদ্ধা পেল?

এখন আমাদের সামনে স্পষ্ট হয়েগেল যে, গণতান্ত্রিক নিয়মে প্রচলিত তথাকথিত রাজনীতি নয়, হুজর পাক (সাঃ) ও তাঁর সাহাবাগণের রাজনীতিই আদর্শ রাজনীতি এবং আমরা উহাই অনুসরণ করব। আগে বুঝুন রাজনীতি শব্দের অর্থ কি এবং রাজনীতি কাকে বলে? রাজনীতি শব্দের অর্থ হলঃ রাজার নীতি অর্থাৎ রাষ্ট্র পরিচালনার রীতিনীতিকেই বলে রাজনীতি। অতএব পুরো বিষয়টি এমনঃ আল্লাহর দেওয়া বিধান সুপ্রতিষ্ঠিত করে ঐ নির্দিষ্ট ভুখন্ডকে কোরআন-সুন্নাহর মানদন্ডে পরিচালনা বা নিয়ন্ত্রণ করাই হল সঠিক ইসলামী রাজনীতি।

হয়তো বা আপনি বলতে পারেন, সাহাবায়ে কেরামের মতো রাষ্ট্র পরিচালনা করতে হলেতো হুকুমত হাতে আসতে হবে, আমরাতো এখনও হুকুমত পাইনি?

সুপ্রিয় পাঠক, একথাই আমি আপনার মুখদিয়ে বের হওয়ার অপেক্ষায় ছিলাম। ঠিকই বলেছেন আমাদেরকে প্রথমে হুকুমত হাতে নিতে হবে, তবেই আমরা সাহাবায়েকেরামের অনুরুপ না হলেও অন্তত উহার জররা পরিমান হুকুমত কায়েম করতে পারতাম। যেমন বর্তমান আফগানিস্তানে তালেবানরা কিতাল ফী সাবীলিল্লাহর মাধ্যমে কোরআনের বিধান প্রতিষ্ঠা করেছেন, যাঁদের ভয়ে আজ সমগ্র বিশ্বের সকল তাগুতী শক্তি ভীত সন্ত্রস্ত। এর দ্বারা প্রমাণ হল কিয়ামতের পূর্বমূহুর্তেও যদি কেউ (অর্থাৎ ইসা [আঃ] ও মেহেদী [আঃ] দাজ্জালের সাথে জিহাদ করেইতো ইসলামী হকুমত প্রতিষ্ঠা করবেন) ইসলামী হুকুমত প্রতিষ্ঠা করতে চায় তবে জিহাদ ব্যতীত এর বিকল্প কোন রাস্তা নেই। তা'নাহলে বলুন তো হযরত ওমর (রাঃ) ২,২১,৫১,০৩০ বর্গ কিলোমিটার ভূখন্ডে যে খেলাফত প্রতিষ্ঠা করেছিলেন তা'কি নির্বাচনের মাধ্যমে? নাকি কিতালের মাধ্যমে? **অবশ্যই কিতালের মাধ্যমে**। রাসূলুল্লাহর ২৩ বছরের নবুয়্যতী জিন্দেগীর সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনা হল এইঃ "১৩ বছর তা'লিম ও দা'ওয়াতের মধ্যদিয়ে কাটে মক্কায়, পদে পদে নির্যাতনের শিকার হয়েছেন, শেষ পর্যন্ত মদীনায় হিজরতের হুকুম হল হিজরত করলেন। দ্বিতীয় হিজরিতে জিহাদের (হজ্জ ৩৯নং) হুকুম নাজিল হল, জিহাদ সংঘটিত হল শেষ পর্যন্ত ৮ম হিজরিতে মক্কা তথা মাতৃভূমি বিজয় হল। তাহলে দেখা যায় মক্কা-মদীনায় ইসলামী হুকুমত নবুয়্যতের ২১ বছরের ফলা ফল। অবশিষ্ট ২ বছর কেয়ামত পর্যন্ত আনে ওয়ালা উম্মতদেরকে এই শিক্ষা

দিলেন যে, কিভাবে একটি রাষ্ট্র পরিচালনা করতে হয়, এরই নাম রাজনীতি"। পাঠক বন্ধু আপনি এবার নিজে চিন্তা করুন আপনি কোন্ রাজনীতির ব্যাপারে লাফালাফি করছেন?

সুতরাং খেলাফত প্রতিষ্ঠার সুন্নত তরিকা হল একমাত্র কিতাল ফী সাবীল্লিাহ অর্থাৎ "জিহাদ লি-এলায়ে কালিমাতিদ্ দ্বীন"।

আপনি যদি জিহাদ সম্পর্কে পবিত্র কোরআনকে প্রশ্ন করেন তো দেখবেন খন্ডিত, সমগ্র, ছোট-বড় যে কোন জবাব আপনি পাচ্ছেন।

**কোরআনের জবাব ঃ (১) কোরআন মজীদকে প্রশ্ন করুনঃ বল-জিহাদের হুকুম কি?** এর জবাবে কোরআন স্পষ্ট বলবে "তোমাদের উপর কিতালকে ফরয করা হয়েছে"। (বাকারা-২১৬)

এখন দেখা যাক একি ফরজে আইন, না ফরজে কিফায়া। **হানাফী মাযহাবের সিদ্ধান্তঃ** জিহাদ ফরজে কিফায়া না ফরজে আইন এ আলোচনা করতে গিয়ে হানাফী মাযহাবের বিখ্যাত আলিম ও ভাষ্যকার আল্লামা ইবনে আবেদীন লিখেনঃ "কোন ইসলামী সীমান্তে যদি কুফুরী শক্তি আক্রমণ করে তবে আক্রান্ত ভূমির নিকটবর্তী মুসলমানদের উপর জিহাদে ঝাঁপিয়ে পড়া ফরজে আইন। আর যারা দূরে অবস্থান করছেন এবং তাদের সাহায্য ব্যতীতই দুশমনের প্রতিরোধ সম্ভব, তবে তাদের জন্য এ জিহাদে অংশ গ্রহণ ফরজে কিফায়া। কিন্তু যদি তাদের প্রয়োজন অনুভূত হয়, অর্থাৎ নিকটবর্তী মুসলামানদের পক্ষে একাকী দুশমনের মোকাবিলা করা অসম্ভব হয় কিংবা সম্ভব হলেও তারা অবহেলা করে জিহাদে অংশগ্রহণ না করে, তখন তুলনামূলক দূরে অবস্থানকারী মুসলমানদের উপরও পর্যায়ক্রমে এ জিহাদ ফরজে আইন হয়ে দাঁড়ায়। যেমনিভাবে নামায ও রোজা ফরজ, মনে রাখতে হবে এ ফরজ পালনে পর্যায়ক্রমে পৃথিবীর যেখানেই মুসলমান বাস করছে তাদের এগিয়ে আসতে হবে। মোটকথা কুফুরী শক্তির আক্রমণ প্রতিহত করা ফরজে আইন, এগুরু দায়িত্ব থেকে কেউ মুক্ত নন"।

আল্লামা ইবনে আবেদীনের এ বক্তব্যের অনুরূপ ফতোয়া প্রদান করেছেন হানাফী মাযহাবের অন্যান্য মনিষীবৃন্দ। এর জন্য দেখুন আল্লামা কাসানীর সাড়া জাগানো "বাদায়েসানায়ে" এবং ইবনু নুজাইমের "বাহরুর রায়েক" আর আল্লামা ইবনুল হুমামের "ফাতহুল কাদীর"।

**মালেকী মাযহাবের বক্তব্য ঃ** দুশমনের আগমেনর সাথে সাথেই সর্বস্তরের মুসলমানের উপর জিহাদ ফরজে আইন। এমনকি দাস-দাসী অপ্রাপ্ত বয়স্ক বালক ও মহিলাদেরকেও এ জিহাদে অংশগ্রহণ করতে হবে। এ জন্যে প্রয়োজনে অভিভাবক

স্বামী ও কর্জদাতার নিষেধ ও উপেক্ষা করতে হবে। আল্লামা দাসুকী তার টিকায় এ মতামত ব্যক্ত করেছেন।

**শাফেয়ী মাযহাবের মতামত ঃ** এ ব্যাপারে শাফেয়ী মাযহাবের অবস্থান উল্লেখ করে আল্লামা রামলী "নিহায়তুল মুহতাজে" বলেন শত্রু আক্রান্ত ভূমি হতে যারা এত দূরত্বে থাকবে যতটুকু দূরত্বের কারণে কসর নামাজ যায়েজ তাদের উপর প্রতিরোধ অভিযানে বেরিয়ে পড়া কর্তব্য। প্রয়োজনে যারা জিহাদের ফরজের অন্ত র্ভূক্ত নন যথা মহিলা, দরিদ্র, বালক, দাসও ঋণগ্রস্থ ব্যক্তিবর্গকেও জিহাদে অংশ গ্রহণ করতে হবে।

**হাম্বলী মাযহাবের বক্তব্য ঃ** আল্লামা ইবনুল কাদামা তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ "মুগনী"তে লিখেন-"তিন সময়ে জিহাদ আবশ্যিক হয়ে দাঁড়ায়ঃ (১) ইসলামী সৈন্যদল ও অমুসলিম বাহিনী পরস্পর মুখোমুখী হয়ে যুদ্ধের জন্য অবস্থান নিলে সকলের জন্য জিহাদ ফরজ। (২) কোন নগরীতে কাফের বাহিনীর আগমনে তথাকার অধিবাসীদের উপর প্রতিরোধ সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়া অবশ্য কর্তব্য (৩) মুসলমানদের ধর্মীয় নেতা বা ইমামের যুদ্ধে যাওয়ার আহবানে সাড়া দিয়ে বেরিয়ে পড়া ফরজ। প্রয়োজনে ইমাম সমগ্র জাতিকেও আহবান করতে পারেন (মুগনী)।

এখন একথা দিবালোকের ন্যায় সুস্পষ্ট হয়ে উঠলো যে, বর্তমান মুহুর্তে জিহাদ ফরজে কিফায়া নয় বরং ফরজে আইন। হে পাঠক বন্ধু আমার, এখনো যদি আপনার বুঝে না আসে তাহলে একজন বিজ্ঞ আলিমের নিকট এর প্রমাণ নিন। তাইতো আল্লাহ বলেন ঃ "অতএব, জ্ঞানীদেরকে জিজ্ঞাসা কর যদি তোমাদের জানা না থাকে" (সুরা নাহল-৪৩ নং আয়াত)

**(২) বল-সবার উপর কি একই হুকুম?**

"দুর্বল, রুগ্ন, ব্যয়ভার বহনে অসমর্থ লোকদের জন্য কোন অপরাধ নেই, যখন তারা মনের দিক থেকে পবিত্র হবে আল্লাহ ও রাসূলের সাথে" (সারা-তাওবাহ-৯১ নং আয়াত)

"অন্ধের জন্য, খঞ্জের জন্য, ও রুগ্নের জন্য, কোন অপরাধ নেই এবং যে কেউ আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করবে তাকে তিনি জান্নাতে দাখিল করাবেন" (ফাত্হ-১৭ নং আয়াত)

সালাত, যাকাত, সিয়ামের মত কিতাল ও একটি ফরজ এবাদত যা পরিত্যগকারী চরম শাস্তির যোগ্য। আমার বিশ্বাস, আল্লাহর কাছে জিহাদ হতে অব্যাহতি পাবে শুধু চার প্রকারে মানুষ (১) অন্ধ (২) বিকলাঙ্গ (৩) অসুস্থ এবং (৪) যারা ব্যয়ভার বহনে অসমর্থ। এরা ছাড়া বাকী সকল মুসলমানকে জিহাদ ত্যাগের কারণে আল্লাহর

নিকট জবাবদিহির সম্মুখীন হতে হবে। চাই এ জিহাদ আফগানিস্তানে, ফিলিস্তিনে, আরকানে, কাশ্মিরে, কসোভোতে অথবা পৃথিবীর অন্য কোন ভূমিতে হোক যা কাফের দ্বারা আক্রান্ত ও অপবিত্র হচ্ছে।

**(৩) বল-জিহাদ ফরজ করাতে আল্লাহর উদ্দেশ্য কি?**

"আল্লাহ যদি একজনকে অপর জনের দ্বারা প্রতিহত না করতেন, তাহলে গোটা দুনিয়া বিধ্বস্ত হয়ে যেত। কিন্তু বিশ্ববাসীর প্রতি আল্লাহ একান্তই দয়ালু ও করুণাময়"। (বাকারা-২৫১)

"আল্লাহ যদি মানব জাতির এক দলকে অপর দল দ্বারা প্রতিহত না করতেন, তবে (খ্রীষ্টানদের) নির্জন গির্জা, এবাদতখানা, (ইহুদীদের) উপাসনালয় এবং মসজিদ সমূহ বিধ্বস্ত হয়ে যেত, যেগুলোতে আল্লাহর নাম অধিক স্বরণ করা হয়।" (হজ্জ-৪০) "আল্লাহ ইচ্ছে করলে তাদের কাছ থেকে প্রতিশোধ নিতে পারতেন। কিন্তু তিনি তোমাদের কতককে কতকের দ্বারা পরীক্ষা করতে চান"। (মুহাম্মদ-৪ আয়াতাংশ)

কোরআন দ্বারা স্পষ্টাক্ষরে প্রমাণিত রয়েছে যে, দুনিয়ার স্থায়ীত্বের শেষ সীমা মহা প্রলয় তথা কেয়ামত পর্যন্ত বিশ্ব মানবের জন্য আল্লাহ তা'আলা কর্তৃক নির্ধারিত ও স্থিরী কৃতরুপে মনোনীত দ্বীন একমাত্র ইসলাম। তাই ভূপৃষ্ঠের অন্যান্য ধর্মের অন্তরায় মুক্তরুপে সম্ভাব্য সকল প্রকার আপদ-বিপদ, বাঁধা বিঘ্নের উর্ধ্বে থেকে বিশ্বের প্রতি কোণে কোণে দ্বীন ইসলাম প্রবল দ্বীনরুপে বিরাজমান থাকবে, সারা বিশ্বে ইসলামের প্রাধান্য স্থাপিত হবে, ইহাই দ্বীন ইসলাম; সৃষ্টিকর্তা কর্তৃক মনোনীত দ্বীন হওয়ার বাস্তব প্রতিক্রিয়া ও মুল তাৎপর্য।

অতঃপর লক্ষনীয় বিষয় এই যে, দ্বীন ইসলাম শুধুমাত্র গুটি কয়েক এবাদত-বন্দেগী, উপাসনা-প্রার্থনা, তপ-জপ জাতীয় কার্য ও অনুষ্ঠানাদির সমষ্টির নাম নয়, তথা সন্ন্যাস-বৈরাগ্যের ধর্ম দ্বীন ইসলাম নয়, বরং ব্যক্তিগত, সমাজগত, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ইত্যাদি মানব জীবনের প্রতিটি স্তর ও পদক্ষেপকেই দ্বীন ইসলাম নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। দ্বীন ইসলামের মধ্যে এবাদত বন্দেগীর সঙ্গে সঙ্গে স্বতন্ত্র সমাজ ব্যবস্থা, অর্থ ব্যবস্থা, পারিবারিক ব্যবস্থা, শাসন ব্যবস্থা এবং আল্লাহ তা'আলা কর্তৃক প্রদত্ত উহার বিশেষ শাসনতন্ত্র রয়েছে যাকে আল্লাহ তা'আলার সৃষ্ট বিশ্বে চালু করতে হবে।

অতএব দ্বীন-ইসলামের বাস্তব-প্রাবল্য ও প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা এবং অন্তরায় মুক্ত রূপে তা কার্যকরী হওয়ার জন্য দারুল ইসলাম-ইসলামী রাষ্ট্র তথা ইসলামের সমুদয় অনুশাসন প্রবর্তিত হওয়ার অন্তঃ ায়হীন ক্ষেত্র প্রতিষ্ঠা করতে হবে। আল্লাহর দ্বীন

যেরূপ বিশ্বের কোণে কোণে প্রবল দ্বীন রূপে বিরাজমান থাকা আবশ্যক, তদ্রুপ বিশ্বের কোণে কোণে দারুল ইসলাম প্রতিষ্ঠিত হওয়া ও আবশ্যক এবং কাফের-হরবী তথা ইসলামের আধিপত্যের বিদ্রোহী শত্রুকে শায়েস্তা করা ও আবশ্যক, যাতে আল্লাহর সৃষ্ট মানবের কোন ব্যক্তি বা দল ইসলামের ছায়া তলে আসতে এবং ইসলাম তথা আল্লাহ্ কর্তৃক মনোনীত জীবন ব্যবস্থা অবলম্বন করতে বাঁধা প্রাপ্ত না হয়। এ জন্যেই আল্লাহ তা'আলা জিহাদ ফরজ করেছেন।

আর একটি কথা ভাল করে বুঝবার চেষ্টা করুন, যখন দুনিয়ার দেহে (পৃথিবীর বুকে) শিরকের বিষাক্ত জীবানুর সৃষ্টি হয় এবং এটা একটা রুগ্ন দেহের মত হয়ে পড়ে তখন আল্লাহ্ তা'আলার রহমত হিসেবে তাদের জন্য স্নেহপরায়ন চিকিৎসক [হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-কে] পাঠালেন, যিনি একাধারে ২৩ বছর পর্যন্ত তাদের দেহের প্রত্যেকটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ও শিরা-উপশিরায় সংশোধনের চেষ্টা করেন; যার ফলে সংশোধনযোগ্য অঙ্গ সমূহ আরোগ্য লাভ করে, কিন্তু যেসব অঙ্গ সম্পূর্ণ জখম হয়েছে, সেগুলোর সংশোধন বা আরোগ্যের কোন উপায় নেই বরং বিপজ্জনক হয়েছে যে, এগুলোর জীবাণু বা পঁচন সমস্ত দেহেই ছড়িয়ে পড়ে। তাই হেকিমদের নীতি অনুযায়ী রহমত ও হিকমতের উপযুক্ত চাহিদাও এটাই ছিল যে, অপারেশন করে ঐ দেহটাকে বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া। এটাই হল আল্লাহর পক্ষ হতে জিহাদ ফরজ করার হাকীকত ও তাৎপর্য এবং এটাই ইসলামের আত্ম রক্ষামূলক ও আক্রমণাত্মক শান্ত অভিযানের মূল উদ্দেশ্য।

দ্বিতীয়ত ঃ ইহজগত যেহেতু পরীক্ষার স্থল, সেহেতু জিহাদের দ্বারা আল্লাহ তা'আলা বুঝে নিচ্ছেন কে পরিপূর্ণ ঈমানদার আর কে অপূর্ণাঙ্গ ঈমানদার এবং কে মুনাফিক।

**(৪) বল-কেন আমরা জিহাদ করব?**

"আল্লাহ তাদেরকে ভালবাসেন, যারা তাঁর পথে সারিবদ্ধভাবে লড়াই করে, যেন তারা সীসা লাগানো প্রাচীর।" (আ-ছাফ্-৪)

আমরা জিহাদ করব আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য ঐভাবে যেভাবে তিনি পাক কালামে ঘোষণা দিয়েছেন যুদ্ধের সেই কাতার আল্লাহর কাছে প্রিয়, যা আল্লাহর শত্রুদের মোকাবিলায় তাঁর বাণী সমুন্নত করার জন্যে কায়েম করা হয় এবং মুজাহিদদের অসাধারণ দৃঢ়তা ও সাহসিকতার কারণে তা একটি সীসা লাগানো প্রাচীরের রূপ পরিগ্রহ করে।

হযরত আবু উমামা (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত, নবী করীম (সাঃ) বলেছেন ঃ "যে মুসলামান তার জীবনে না কখনো আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করছে না কোন মুজাহিদদের

জন্য জিহাদের সামান তৈরী করেছে আর না কোন মুজাহিদ পরিবারের হিতৈষণার জন্য বাড়ীতে অবস্থান করেছে, আল্লাহ তা'আলা কিয়ামত আসার আগে তাকে এক ভীষণ আজাবে পতিত করবেন।" আলোচ্য হাদীসটি থেকে বুঝা গেল, যে কোন মুসলমানের জন্য ইহলৌকিক আজাব-গজব থেকে বাঁচার পথ তিনটি। (১) নিজে মুজাহিদ হওয়া, (২) মুজাহিদের রণসরঞ্জাম ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় সামগ্রীর ব্যবস্থা করা। (৩) মুজাহিদ পরিবারের হিতৈষনা ও দেখা-শোনার উদ্দেশ্যে স্বদেশে অবস্থান করা। (৪) এছাড়াও আমরা জিহাদ করব আল্লাহ প্রদত্ত বিধান ফরজ আদায় করার জন্য। হুজুর (সাঃ) বলেছেন-আল্লাহর নৈকট্য লাভের জন্য সর্বাপেক্ষা অধিক নিকটবর্তী আমল হচ্ছে জিহাদ। অন্যকোন আমলই জিহাদের নিকটবর্তী হতে পারেনা।

**(৫) বল-কাদের জন্য আমরা জিহাদ করব?**

"আর তোমাদের কি হল যে, তোমরা আল্লাহর রাহে লড়াই করছনা, দূর্বল সেই পুরুষ, নারী ও শিশুদের পক্ষে যারা বলে, হে আমাদের পালানকর্তা! আমাদেরকে এই জনপদ থেকে নিস্কৃতি দান কর; এখানকার অধিবাসীরা যে অত্যচারী! আর তোমার পক্ষ থেকে আমাদের জন্য পক্ষাবলম্বনকারী নির্ধারন করে দাও এবং তোমার পক্ষ থেকে আমাদের জন্য সাহায্যকারী নির্ধারণ করে দাও।" (নিসা-৭৫)

মক্কায় মুসলমানদের উপর কাফেরদের নির্যাতন চরম সীমায় পৌঁছে গিয়েছিল। এমন কোন দিন যেত না যে, কোন না কোন মুসলমান তাদের নিষ্ঠুর হাতে আহত ও প্রহৃত হয়ে না আসত। এমনই মুহুর্তে আল্লাহ তা'আলার নির্দেশ আসল মদিনা হিজরত করার জন্য। হিজরতের পর এমন কিছু দুর্বল মুসলমান রয়ে গিয়েছিলেন, যারা দৈহিক দূর্বলতা এবং আর্থিক দৈন্যের কারণে হিজরত করতে পারছিলেন না। পরে কাফেররাও তাদেরকে হিজরত করতে বাধা দান করছিল, যাতে তারা ইসলাম ত্যাগ করতে বাধ্য হয়। এদের কারো কারো নামও তফসীর গ্রন্থে উল্লেখ করা হয়েছে। যেমন, হযরত ইবনে আব্বাস ও তাঁর মাতা, সালামা ইবনে হেশাম ওলীদ ইবনে ওলীদ, আবু জান্দাল ইবনে সাহল প্রমুখ। এসব সাহাবী নিজেদের ঈমানী বলিষ্টতার দরুণ কাফেরদের অসহনীয় উৎপীড়ন সহ্য করে ও ঈমানের উপর স্থির থাকেন। অবশ্য তাঁরা এসব অত্যাচার-উৎপীড়ন থেকে অব্যাহতি লাভের জন্য বরাবরই আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের দরবারে মুনাজাত করতে থাকেন। শেষ পর্যন্ত আল্লাহ তা'আলা তাঁদের এ প্রার্থনা মঞ্জুর করে নেন এবং মুসলমানদেরকে নির্দেশ দেন, যাতে তাঁরা জিহাদের মাধ্যমে নিপীড়িতদেরকে কাফেরদের অত্যাচার থেকে মুক্ত করেন। অবশ্য এই কারণে সর্ব প্রথম যে আয়াত অবতীর্ণ হয় তা এই-"যুদ্ধের

অনুমতি দেওয়া হল তাদেরকে যাদের সাথে কাফেররা যুদ্ধ করে; কারণ তাদের প্রতি অত্যাচার করা হয়েছে। আল্লাহ তাদেরকে সাহায্য করতে অবশ্যই সক্ষম।" (হজ্জ-৩৯)

বন্ধু আমার, এবার চিন্তা করুন একই অবস্থা কি আজ আরাকান, কাশ্মির, কসোভো ও ফিলিস্তিনের মুসলমানদের উপর চলছেনা? ঈমান দূর্বল হওয়ার কারণে তারা কি আরও তাড়া-তাড়ি ঈমান হারা হয়ে পড়েছেনা? তাহলে আমাদের উপর কেন জিহাদ ফরজ হবেনা? বরং আমি বলব দু'শ বছর আগে আমাদের উপর জিহাদ ফরজ হয়ে আছে। ফিকার কিতাব খুলে দেখুন উপরোক্ত আয়াত দু'টি দ্বারা জিহাদ ফরজ হয়েছে কিনা? কেননা উৎপীড়িতের সাহায্য করা ইসলামের একটি গুরুত্বপূর্ণ ফরয। নির্যাতিত সকল রাষ্ট্রের মুসলমানরা ঐ একই ফরিয়াদ জানাচ্ছে আল্লাহর দরবারে। তাদের ডাকে সাড়া না দেওয়াতো আমাদের ঈমানহীনতার পরিচয় বহন করে। হে ঈমানদার যুবক ভাইরা আমার-ঐ মজলুমানের মুক্তির জন্যে এখনই ক্লাসিনকোভ হাতে নিয়ে বের হয়ে আসুন, এটা আল্লাহরই নির্দেশ-"হে ঈমানদারগণ! নিজেদের অস্ত্র তুল নাও এবং পৃথক পৃথক সৈন্য দলে বেরিয়ে পড় কিংবা সমবেতভাবে।" (নিসা-৭১)

**<u>(৬) বল- তার আগে আমাদের শক্তির তথা প্রস্তুতি গ্রহণ করার প্রয়োজন আছে কিনা?</u>**

"আর প্রস্তুত কর তাদের সাথে যুদ্ধের জন্য যাই কিছু সংগ্রহ করতে পার নিজের শক্তি সামর্থ্যের মধ্য থেকে এবং পালিত ঘোড়া থেকে, যেন প্রভাব পড়ে আল্লাহর শত্রুদের উপর এবং তোমাদের শত্রুদের উপর আর তাদেরকে ছাড়া অন্যান্যদের উপরও যাদেরকে তোমরা জাননা; আল্লাহ তাদেরকে চেনেন।" (আনফাল-৬০)

নবীর (সাঃ) দাওয়াতের প্রথম পর্যায়ে ছিল প্রত্যেক মুসলমানকে জিহাদ অর্থাৎ জান-মালের ত্যাগ স্বীকারের জন্য প্রস্তুত করা। যখন এ জনশক্তি পরিপূর্ণভাবে প্রস্তুত হল তখন দ্বিতীয় পর্যায়ে ছিল এ জনশক্তির সামরিক প্রশিক্ষণ। যার উপর আল কোরআনের যথেষ্ট গুরুত্বারোপ করা হয়েছে এবং মুসলমানদের পূর্ণ শক্তি অর্জনের জন্য উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে। এ কারণেই মুসলমানগণ গোটা দুনিয়ার পিঠে ইসলামের শান-শওকতের ঝান্ডা উড়িয়ে ছিলেন। স্বয়ং হুজুর (সাঃ) সাহাবাগণকে ঘোড়-দৌড়, সাতার কাটা, তীর নিক্ষেপ ইত্যাদির জন্য ব্যাপক উৎসাহ প্রদান করতেন।

হযরত উক্‌বা বিন আমের (রাঃ) বলন যে, আমি রাসূল (সাঃ)-কে মিম্বরের

উপর কোরআন মজীদের এ আয়াত তিলাওয়াত করতে শুনেছি; "আর প্রস্তুত কর তাদের সাথে যুদ্ধের জন্য যা কিছু সংগ্রহ করতে পার নিজের শক্তির সামর্থ্যের মধ্য থেকে।" অতঃপর তিনি বলেন-সাবধান! শক্তি নিক্ষেপনের মধ্যে। সাবধান! শক্তি নিক্ষেপনের মধ্যে। হাদীসে বর্ণিত "রমি" শব্দের অর্থ নিক্ষেপ করা যা তীরন্দাজির বেলায়ও ব্যবহার হয়। হুজুর (সাঃ) এর এ ব্যাপক অর্থবোধক শব্দে এই ইংগিত পাওয়া যায় যে, প্রকৃত শক্তি নিক্ষেপনের মধ্যে। যদি বর্তমান যুগের প্রেক্ষাপটে চিন্তা করা হয়। তবে দেখা যায় যে, আসল শক্তি হল নিক্ষেপনের মধ্যেই।

হযরত উক্‌বা বিন আমের (রাঃ) আরো বলেছেন যে, আমি রাসূল (সাঃ) কে এও বলেতে শুনেছি যে, "যে ব্যক্তি তীরন্দাজী শিখার পর তা ছেড়ে দিয়েছে সে আমাদের মধ্য থেকে নয়" (মুসলিম)। লক্ষ্য করুন অস্ত্রের জ্ঞান অর্জন করে তা বর্জন করার উপর কত ভীষণ হুমকি প্রদর্শন করা হয়েছে। এ থেকে এটা স্পষ্ট যে অস্ত্র চালনা শিক্ষা এবং তার অনুশীলন অব্যাহত রাখা ইসলামের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিধান। অতএব ঐ সকল মুসলমানগণ নিজের জীবনের উপর একটু চিন্তা করে দেখুন যারা কখনো ইসলামের এ বিধানের প্রতি ভ্রুক্ষেপ করেন নাই এবং এর শিক্ষাকে দ্বীনের অঙ্গ বলেও মনে করেননা। অচথ সালমা বিন আক্‌ওয়া (রাঃ) বর্ণনা করেন যে, হুজুর (সাঃ) একদা আসলাম গোত্রের কিছু লোকের পার্শ্ব দিয়ে পথ অতিক্রম করলেন যারা তখন তীরন্দাজী করছিল। তখন হুজুর (সাঃ) এরশাদ করেলেন নিক্ষেপ কর, নিশ্চয় তোমাদের পিতা হযরত ইসমাঈল (আঃ) তীর নিক্ষেপকারী ছিলেন। তীর নিক্ষেপ কর, আর আমি অমুক গোত্রের পক্ষাবলম্বনকারী। হযরত সালমা (রাঃ) বলেন একথা শুনে অপর পক্ষ হাত গুটিয়ে নিলেন। তখন হুজুর (সাঃ) বলেন-তোমাদের কি হল, তীর নিক্ষেপ করছনা? তখন তাঁরা উত্তর দিলেন যে, আমরা কিভাবে নিক্ষেপ করি? যেহেতু আপনি দ্বিতীয় পক্ষে রয়েছেন। তখন হুজুর (সাঃ) বললেন-আমি তোমাদের সকলের সঙ্গে আছি।

ওহুদ যুদ্ধের সময় হুজুর (সাঃ) হযরত সা'দ বিন ওয়াককাসকে (রাঃ) লক্ষ্য করে বলেছেনঃ হে সা'দ! তীর নিক্ষেপ কর, আমার মাতা-পিতা তোমার উপর কোরবান হোক। হুজুর (সাঃ) হযরত আবু তালহার (রাঃ) সাথে একই ঢালের মধ্যে আত্মরক্ষা করছিলেন। আবু তালহা (রাঃ) যিনি দক্ষ তীরন্দাজ ছিলেন, তিনি যখন তীর নিক্ষেপ করতেন তখন হুজুর (সাঃ) মাথা বের করে তাঁর তীরের লক্ষ্য স্থল দেখে নিতেন। (বাখোরী)

হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, নবী করীম (সাঃ) ইরশাদ করেছেন, "যে ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলার উপর পরিপক্ক ঈমান রাখে এবং তাঁর ওয়াদাকে সত্য

জ্ঞান করে জিহাদের উদ্দেশ্যে ঘোড়া প্রতিপালন করে, কিয়ামতের দিন ঘোড়ার আহার্য, পানি, মল ও মুত্র সে ব্যক্তির আমলের পাল্লায় রাখা হবে।" (বোখারী) হাদীসটি থেকে বুঝা গেল, জিহাদের উদ্দেশ্যে যত কিছুই তৈরী করা হবে তার প্রতিদান ও সম্মানী পাওয়া যাবে। এমনি ভাবে জিহাদে অগ্রণী ভূমিকা পালন করার নিয়তে দৈহিক শক্তি সঞ্চয়ের জন্য যে মুজাহিদ নিজের জন্য টাকা পয়সা খরচ করবে,উহার প্রতিদান ও সম্মানী তার আমলনামাতে সংযোজিত হবে।

হুজুর (সাঃ)-এর অন্যতম পবিত্র শিক্ষা হল মসজিদের যথাযত সম্মান রক্ষা ও মসজিদকে খেলাধুলা থেকে পবিত্র রাখা এবং মসজিদে আমোদ-প্রমোদকে তিনি কিয়ামতের আলামত বলে অভিহিত করেছেন। কিন্তু মসজিদে অস্ত্র প্রশিক্ষণ সম্পর্কে নিষেধ করেন নি। বরং হাবসার একটি দল যখন মসজিদে তীরন্দাজীর প্রদর্শনী করছিল, তখন হুজুর (সাঃ) স্বয়ং তা প্রত্যক্ষ করেছেন। আর যখন হযরত উমর (রাঃ) প্রস্তরহাতে নিয়ে তাদেরকে তাড়িয়ে দেওয়ার ইচ্ছে করলেন, তখন হুজুর (সাঃ) বললেন, "উমর, তাদেরকে নিজের অবস্থার উপর ছেড়ে দাও।" (বোখারী) মসজিদে নববীতে অস্ত্রের প্রদর্শনী একথারই সুস্পষ্ট প্রমাণ বহন করে যে, জিহাদের প্রশিক্ষণ সে সমস্ত এবাদতের অন্তর্ভূক্ত যার মাধ্যমে মুসলমানগণ আল্লাহর নৈকট্য অর্জন করে। তাইতো মসজিদে পর্যন্ত তার অনুমতি প্রদান করা হয়েছে। আলোচ্য আয়াতের প্রেক্ষিতে বিশিষ্ট ইসলামী আইন বিশেষজ্ঞ মুফতিয়ে আজম (পাকিস্তান) মোহাম্মদ শফী (রহঃ)-মাসআল বলেন ঃ

"জিহাদের জন্য অস্ত্র ও যুদ্ধ সামগ্রীর প্রস্তুতি নেওয়া ফরয।" (মাসায়েলে মারিফুল কোরআন ১৫৮ পৃষ্ঠা)

**<u>(৭) বল, কার সঙ্গে জিহাদ করব ?</u>**

"আর যদি তারা ভঙ্গ করে তাদের শপথ প্রতিশ্রুতির পর এবং বিদ্রুপ করে তোমাদের দ্বীন সম্পর্কে, তবে কুফর প্রধানদের সাথে যুদ্ধ কর। কারণ এদের কোন শপথ নেই যাতে তারা ফিরে আসে।" (তাওবাহ-১২)

আলোচ্য আয়াতে বলা হচ্ছে যে, সন্ধি চুক্তি যারা ভঙ্গ করবে এদের সাথে মুসলমানদের কি ব্যবহার করা উচিত, এরশাদ হচ্ছে-"এরা যদি চুক্তি সম্পাদনের পর শপথ ও প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করে এবং ইসলামও গ্রহণ না করে, অধিকন্তু ইসলামকে নিয়ে বিদ্রূপ করে, তবে সেই কুফর প্রদানদের সাথে যুদ্ধ কর।" এখানে আপাত দৃষ্টিতে বলা সঙ্গত ছিল, "সেই কাফেরদের সাথে যুদ্ধ কর।" কিন্তু তা না বলে বলা হয়-"সেই কুফর প্রদানদের সাথে যুদ্ধ কর।" তার কারণ এরা চুক্তি ভঙ্গের দ্বারা কুফরের ইমাম বা প্রদানের পরিণত হয়ে যুদ্ধের উপযুক্ত হয়। এ বাক্যরীতিতে

যুদ্ধাদেশের কারণের প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে।

"তোমরা যুদ্ধ কর আহলে-কিতাবের ঐ লোকের সাথে, যারা আল্লাহ ও পরকালে ঈমান রাখেনা, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল যা হারাম করে দিয়েছেন তা হারাম করেনা এবং গ্রহণ করেনা সত্য ধর্ম, যতক্ষণ না করজোড়ে তারা জিযিয়া প্রদান করে।" (তাওবাহ-২৯)

আহ্‌লে-কিতাবের উল্লেখ করে অত্র আয়াতে তাদের সাথে যুদ্ধ করার যে নির্দেশ রয়েছে, তা শুধু আহলে-কিতাবের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। বরং এ আদেশ রয়েছে সকল কাফের সম্প্রদায়ের জন্যেই। কারণ যুদ্ধ করার যে সকল হেতু সামনে বর্ণিত হচ্ছে, তা সকল কাফেরদের মধ্যে সমভাবে বিদ্যমান। সুতরাং এ আদেশ সকলের জন্যই প্রযোজ্য। তবে বিশেষ ভাবে আহলে কিতাবের উল্লেখ করা হয় মুসলমানদের এ দ্বিধা নিবারণ উদ্দেশ্যে যে, ইহুদী-খ্রিষ্টানেরা অন্ততঃ তাওরাত-ইঞ্জিল এবং হযরত মুসা ও ঈসা (আঃ)-এর প্রতি তো ঈমান রাখে অতএব, পূর্বের আম্বিয়া (আঃ) ও কিতাবের সাথে তাদের সম্পর্ক থেকে মুসলমানের জিহাদী মনোভাবের জন্য বাধা হওয়ার সম্ভাবনা ছিল, তাই বিশেষভাবে তাদের উল্লেখ করা হয়। আবার এ ইঙ্গিতও রয়েছে যে, তারা এই দৃষ্টিকোণে অধিক শাস্তির যোগ্য। কারণ, এরা অপেক্ষাকৃত জ্ঞানী, এদের কাছে তওরাত-ইঞ্জিলের জ্ঞান রয়েছে, যে তওরাত-ইঞ্জিলে রয়েছে রাসূলে করীম (সাঃ) সম্পর্কিত ভবিষ্যদ্বাণী, এমনকি তাঁর (সাঃ) দৈহিক আকৃতির বর্ণনা। এ সত্ত্বেও তাদের সাথে যুদ্ধের আদেশ দেওয়া হয়। এ আয়াতে যুদ্ধের চারটি হেতুর বর্ণনা রয়েছে-প্রথমতঃ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ

তারা আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস রাখে না। ২য়তঃ وَلَا بِالْيَوْمِ الْاٰخِرِ

পরকালের প্রতি ও তাদের বিশ্বাস নেই। ৩য়তঃ

وَلَا يُحَرِّمُوْنَ مَا حَرَّمَ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ

আল্লাহর হারাম কৃত বস্তুকে তারা হারাম মনে করে না।

চতুর্থত ঃ وَلَا يَدِيْنُوْنَ دِيْنَ الْحَقِّ সত্য ধর্ম গ্রহনে তারা অনিচ্ছুক।

আবার, حَتّٰى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍوَّهُمْ صَاغِرُوْنَ

"যতক্ষণনা তারা করজোড়ে জিযিয়া প্রদান করে" বাক্য দ্বারা যুদ্ধ বিগ্রহের একটি সীমা ঠিক করে দেওয়া হয়। অর্থাৎ, তাবেদার প্রজারূপে জিযিয়া প্রদান না করা পর্যন্ত তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালিয়ে যাবে।

"হে ঈমানদারগণ, তোমাদের নিকটবর্তী কাফেরদের সাথে যুদ্ধ চালিয়ে যাও এবং তারা তোমাদের মধ্যে কঠোরতা অনুভব করুক। আর জেনে রাখ,আল্লাহ মুত্তাকিদের সাথে রয়েছেন।" (তওবাহ-১২৩)

কাফেররাতো দুনিয়ার সর্বত্রই রয়েছে। তবে কোন্ নিয়মে তাদের সাথে জিহাদ করা হবে? এ আয়াতে বলা হচ্ছে যে, কাফেরদের মধ্যে যারা তোমাদের নিকটবর্তী প্রথমে তাদের সাথে জিহাদ করবে। অতএব, মুজাহিদ্বীনদের বলছি আমাদেরকে প্রথমে নিকটবর্তী কাফের আরাকানের নাচাক্কা বাহিনীর সাথে জিহাদ করতে হবে। সুতরাং যারা "আগে নিজের দেশে জিহাদ করে পরে অন্যদেশে জিহাদ করব" বলে দাবী করে, তাদের এই দাবী নিশ্চয় জাতীয়তাবাদের দাবী- যা, ইসলাম অনুমোদিত নয়। এই নকিটবর্তী আবার দুই প্রকার হতে পারে, (১) অবস্থানের দিক দিয়ে অর্থাৎ-যারা তোমাদের নিকটে অবস্থানকারী, প্রথমে তাদের সাথে জিহাদ কর। (২) গোত্র, আত্মীয়তা ও সম্পর্কের দিক দিয়ে যারা নিকটবর্তী, অন্যান্যদের আগে তাদের সাথে জিহাদ চালিয়ে যাও। কারণ ওঁদের কল্যাণ সাধনই জিহাদের উদ্দেশ্য। وَلْيَجِدُوْافِيْكُمْ غِلْظَةً غِلْظَةً অর্থ কঠোরতা, শক্তিমত্তা। বাক্যের মর্ম হল, কাফেরদের সাথে এমন ব্যবহার কর, যাতে তোমাদের কোন দূর্বলতা তাদের চোখে ধরা না পড়ে, এই কঠোরতা আর শক্তি মত্তার জন্য আমাদেরকে অবশ্যই জিহাদের ট্রেনিং গ্রহণ করতে হবে।

**(৮) বল-কিভাবে তাদের সাথে জিহাদ করব?**

"কাজেই গর্দানের উপর আঘাত হান এবং তাদেরকে কাট জোড়ায় জোড়ায়।" (আনফাল-১২)

আল্লাহ তা'আলা বলেন আমি এখনই কাফেরদের মনে ভীতি সঞ্চার করে দিচ্ছি। অতএব তোমরা ভীত না হয়ে পূর্ণ সাহসিকতার সহিত যুদ্ধে অগ্রসর হও এবং কাফেরদের গর্দানের উপর অস্ত্রের আঘাত হান আর তাদেরকে হত্যাকর দলে দলে।

আল্লাহ তাবারাক ওয়াতাআলা কিতাল ফরয করে চুপ থাকেননি, বরং কিভাবে করবে তাও শিখিয়ে দিয়েছেন। 'অতপর যখন তোমরা কাফেরদের সাথে যুদ্ধে অবতীর্ণ হও, তখন তাদের গর্দান মার, অবেশেষে যখন তাদেরকে পূণরূপে পরাভুত করবে তখন তাদেরকে শক্ত করে বেঁধে ফেল।" (মুহাম্মদ-৪) এবার আমরা শিক্ষা নিব হুজুর পাক (সাঃ) এর নিকট ঃ

হযরত আবু উসাইদ (রাঃ) বলেন, নবী করীম (সাঃ) বদর যুদ্ধের দিন ইরশাদ করেছেন, "শত্রু তোমাদের নিকটে চলে আসলে তীর নিক্ষেপ করবে আর অতি নিকটে অর্থাৎ তরবারীর নাগালের ভিতর আসার পূর্ব পর্যন্ত তরবারী কোষ মুক্ত করবে না।" (আবু দাউদ)

এ হাদীস দ্বারা দু'টি শিক্ষা পাওয়া যায় ঃ (১) শত্রু নিকটে অর্থাৎ ফায়ারের নাগালে আসার আগ পর্যন্ত ফায়ার করবেনা বরং নিরবে আত্মরক্ষা ব্যুহতে শত্রু নাগলে আসার অপেক্ষা করবে। যদি এরূপ করা না হয় বরং দূর থেকেই ফায়ার করা হয়, তাহলে প্রথমতঃ বারুদ নষ্ট হবে, দ্বিতীয়ত ঃ শত্রু মারা যাওয়ার স্থলে হুশিয়ার হয়ে যাবে। (২) ক্লাসিনকোভ ইত্যাদি আগে থেকে লোড করে এবং গুলী চেম্বারে ঢুকিয়ে রাখবেনা। যতক্ষণ পর্যন্ত দুশমনের সাথে মোকাবেলার সময় না হবে অথবা আশংকাজনক অবস্থা না হবে ততক্ষণ পর্যন্ত অস্ত্র লোড করবেনা। যেমনি ভাবে তলোয়ার আগ থেকে কোষ মুক্ত করে রাখলে আপন সাথীর শরীরে লেগে যাওয়ার ভয় থাকে, তেমনি গুলি চেম্বারে ঢুকিয়ে রাখলে তা হঠাৎ ছুটে গিয়ে কোন মুজাহিদের দেহে লেগে যাওয়ার ভয় আছে।

**(৯) বল-কেউ যদি আমার সঙ্গে জিহাদে না আসে তখন আমি একা কি করব?**

"হে নবী! মোমেনগনকে জিহাদের প্রতি উৎসাহিত করুন।" (আনফাল-৬৫) হযরত আনাছ (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, (ইতিহাস প্রসিদ্ধ খন্দকের জিহাদে শত্রুর আক্রমণ পথে পরিখা খনন কার্য্য চলতেছিল) রাসূলুল্লাহ (সাঃ) পরিখা খনন কার্য্য স্থলে উপস্থিত হয়ে দেখতে পেলেন, মোহাজের ও আনছারগণ ভীষণ হিম-শীতল প্রভাতে অনাহারী অবস্থায় খনন কার্য করতেছেন। তাঁদের কোন চাকর-নকর এমন ছিল না যারা সেই কার্য সমাধা করতে পারে। সাহাবীগণের কষ্ট ক্লেশ ও ক্ষুধার যাতনা দেখতে পেয়ে হযরত (সাঃ) তাঁদের উৎসাহ বর্ধনে একটি ছন্দ পাঠ করলেন। "হে আল্লাহ! আখেরাতের সুখ-শান্তিই বাস্তব সুখ-শান্তি, আনসার ও মোহাজেরগণের সমস্ত গোনাহ-খাতা ক্ষমা করতঃ তাদের আখেরাতের জীবনকে সাফল্যমন্ডিত করে দাও।" সাহাবীগণ স্বতঃস্ফুর্ত স্বরে অপর একটি ছন্দের দ্বারা প্রতি উত্তর দান করলেন- "আমরা সেই বীর যারা মুহাম্মদ (সাঃ)-এর হাতে হাত দিয়ে অঙ্গিকারবদ্ধ হয়েছি জীবনের সর্বশেষ মুহুর্ত পর্যন্ত দ্বীনের জন্য আপ্রাণ যুদ্ধ চালিয়ে যেতে।

আবু কাতাদা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, আমরা রাসূল (সাঃ)-এর সঙ্গে হুনাইনের জিহাদে যাত্রা করলাম। যখন উভয় পক্ষে যুদ্ধ আরম্ভ হল তখন প্রথমদিকে মুসলমান দলের পক্ষে পশ্চাদপসারণের ন্যায় দৃশ্য দেখা গেল। ঐ সময় আমি দেখতে পেলাম, একজন মুসলমান ব্যক্তিকে একজন মুশরেক কাবু করে ফেলছে। আমি তৎক্ষণাত ঐ মুশরেকের পিছন দিকে এসে তার কাঁদের উপর তরবারীর আঘাত করলাম। তখন সে ঐ মুসলমান ব্যক্তিকে ছেড়ে দিয়ে আমাকে জড়িয়ে ধরল এবং এমন ভীষণভাবে চাপ দিল যে, মৃত্যুভাব অনুভব করলাম, কিন্তু তার শেষ নিঃশ্বাস বের হয়ে পড়ল এবং সে আমাকে ছেড়ে দিল। সে জিহাদে প্রথম অবস্থায় মুসলমান

পক্ষে যে পরাজয়ের দৃশ্য দেখা গেল সে সম্পর্কে আমি ওমর (রাঃ)-কে জিজ্ঞেস করলাম, লোক সকল এরূপ করল কেন? তিনি বললেন, আল্লাহর তরফ হতে অদৃষ্টে ইহাই ছিল। অতপর পশ্চাদপসারণকারী মুসলমানগণই সম্মুখে অগ্রসর হয়ে প্রবলবেগে আক্রমণ চালাল এবং মুসলমানদের জয় হল। জিহাদ সমাপ্তে রাসূল (সাঃ) এক স্থানে এসে ঘোষণা করলেন, যে ব্যক্তি কোন কাফেরকে হত্যা করেছে এবং সে সম্পর্কে প্রমাণদিতে সক্ষম হবে; তাকে সে কাফের ব্যক্তির ব্যবহার্য উপস্থিত সমুদয় সম্পদ দান করা হবে। তখন আমি যে ঐ কাফিরকে হত্যা করেছিলাম সে সম্পর্কে দাঁড়িয়ে বললাম, আমার কার্যের উপর কেউ সাক্ষী আছেন কি? এই বলে আমি বসে পড়লাম এবং এরূপে আমি তিনবার দাঁড়ালাম। তৃতীয় বার নবী (সাঃ) আমাকে বিষয়টি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন, আমি পূর্ণ ঘটনা ব্যক্ত করলাম। তখন এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে বলল, তাঁর দাবী সত্য, ঐ কাফেরকে তিনি হত্যা করেছেন এবং নিহত কাফেরের সম্পদ সমূহ আমার নিকট আছে, সে নবী (সাঃ)-কে অনুরুধ জ্ঞাপন পূর্বক বলল, আপনি তাঁকে সম্মত করিয়ে দিন তা যেন আমারই থাকে। আবু বকর (রাঃ) বিরোধিতা করে বললেন, হত্যাকারীকে প্রদান করাই কর্তব্য, নতুবা বীর পুরুষগণের উৎসাহ বর্ধন উদ্দেশ্য ব্যাহত হবে। রাসুল (সাঃ) আবু বকরের উক্তি সমর্থন করে ঐ সম্পদ আমাকেই প্রদান করলেন। তা এত মূল্যবান ছিল যে, একমাত্র লৌহ বর্মটি বিক্রি করে আমি একটি বাগান ক্রয় করেছি এবং মুসলমান হওয়ার পরে তাই আমার সর্বপ্রথম সম্পত্তি। (বোখারী ৩য় খন্ডঃ ১০০ পৃঃ)

পাঠক বন্ধু আমার, এতো ছিল নবী (আঃ)-এর প্রতি আল্লাহর নির্দেশ আর এ নির্দেশ তিনি সানন্দে পালন করে গিয়েছেন। বলুন তো এ দায়িত্ব এখন কার উপর বর্তিয়েছে? নিশ্চয় উলামায়ে কেরামের উপর, কেননা-"উলামাগণ বনী'র ওয়ারিছ"। দ্বিতীয়ত ঃ প্রত্যেক মু'মিনের উপর, তারা এ ফরয বিধান কেতালের প্রতি অপর মুসলমানকে আহবান করবে।

**(১০) বল-মানুষকে এতই উৎসাহিত করার পরও যদি কেউই জিহাদে না আসে, তখন কি আমি জিহাদ থেকে বিরত থাকব?**

"আল্লাহর রাহে যুদ্ধ করতে থাকুন, আপনি নিজের সত্তা ব্যতীত অন্য কোন বিষয়ের জিম্মাদার নন। আর আপনি মুসলমানদেরকে উৎসাহিত করতে থাকুন। শীঘ্রই আল্লাহ কাফেরদের শক্তি সামর্থ খর্ব করে দেবেন।" (নিসা-৮৪)

এ আয়াতের প্রথম বাক্যে রাসূলে করীম (সাঃ)-কে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, "আপনি একাই যুদ্ধের জন্য তৈরী হয়ে পড়ুন; কেউ আপনার সাথে থাক বা নাই থাক।" কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে দ্বিতীয় বাক্যে একথাও বলা হয়েছে যে, অন্যান্য মুসলমানদেরকে এ

ব্যাপারে উৎসাহদানের কাজটিও পরিহার করবেন না। এভাবে উৎসাহদানের পরেও যদি তারা যুদ্ধের জন্য উদ্বুদ্ধ না হয়, তবে আপনার দায়িত্ব পালিত হয়ে গেল; তাদের কর্মের জন্য আপনাকে জবাবদিহী করতে হবেনা। এতদসঙ্গে একা যুদ্ধ করতে গিয়ে যেসব বিপদাশঙ্কা দেখা দিতে পারে, তার প্রেক্ষিতে বলা হয়েছে-"আশা করা যায় আল্লাহ্ কাফেরদের যুদ্ধ বন্ধ করে দেবেন এবং তাদেরকে ভীত ও পরাজিত করে দেবেন। আর আপনাকে একাই জয়ী করবেন।"

প্রিয় পাঠক বন্ধু আমার! এখান থেকেই শিক্ষা গ্রহণ করুন। আমার পরওয়ারদিগার, নবীউস সাইফ (সাঃ)-কে এ নির্দেশ দিলেন তাঁর উম্মতের শিক্ষার জন্য।

**<u>(১১) বল-আমরা সংখ্যায় কম হওয়াতে জিহাদ থেকে বিরত থাকব না দৃঢ়পদ থাকব?</u>**

"কাজেই তোমাদের মধ্যে যদি দৃঢ়চিত্ত একশ' লোক বিদ্যমান থাকে তবে জয়ী হবে দু'শর উপর। আর যদি তোমরা এক হাজার হও তবে আল্লাহর হুকুম অনুযায়ী জয়ী হবে দু'হাজারের উপর। আর আল্লাহ রয়েছেন দৃঢ়চিত্ত লোকদের সাথে।" (আনফাল-৬৬)

আমরা যদি বিজয়ের অটুট মনোবল নিয়ে পূর্ণ ঈমানের সহিত কাফেরের মোকাবিলায় দৃঢ়পদ থাকি তাহলে অবশ্যই আল্লাহর ওয়াদা অনুযায়ী আমরা বিজয় লাভ করব। সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ) এভাবেই তো বিজয় ছিনিয়ে এনেছিলেন অথচ তাঁরা ছিলেন সংখ্যায় কম। ইতিহাসের পাতায় দেখা যায় আল্লাহর দুশমনের সাথে মুজাহিদের দ্বিপাক্ষিক যুদ্ধে ঐ অল্প সংখ্যক মুজাহিদগণই বিজয় লাভ করে আসছে।

**<u>(১২) বল-কিভাবে দৃঢ়পদ থাকব?</u>**

হে আল্লাহ! চতুর্দিক থেকে গোলা বারুদ নিক্ষিপ্ত হচ্ছে; সামনে থেকে দৈত্যাকারের বিশাল ট্যাংক ধেয়ে আসছে, মাথার উপর থেকে যুদ্ধ বিমান বোমা নিক্ষেপ করছে, বোমার বিষ্ফোরণে পৃথিবী অন্ধকার দেখা যাচ্ছে, এমন ভয়াবহ কঠিন অবস্থায় কিভাবে যুদ্ধের মাঠে দৃঢ়পদ থাকব! এখন আল্লাহ তা'আলা স্পষ্ট ভাষায় বলে দিচ্ছেন-

"হে ঈমানদারগণ, তোমরা যখন কোন বাহিনীর সাথে সংঘাতে লিপ্ত হও, তখন সুদৃঢ় থাক এবং আল্লাহকে অধিক পরিমাণে স্মরণ কর যাতে তোমরা উদ্দেশ্যে কৃতকার্য হতে পার।" (আনফাল-৪৫)

এখানে আল্লাহপাক মুজাহিদীনে ইসলামকে দুটি বিশেষ হেদায়ত দান করেছেন। প্রথমটি হল 'দৃঢ়তা' পৃথিবীর প্রতিটি জাতি নিজেদের যুদ্ধে এই দৃঢ়তারই উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করে থাকে। দ্বিতীয়টি হল আল্লাহর যিকির এটি সেই বিশেষ ধরনের আধ্যাত্মিক হাতিয়ার যার ব্যাপারে ঈমানদারগণ ব্যতীত সাধারণ পৃথিবী

গাফেল। সমগ্র পৃথিবী যুদ্ধের জন্য সর্বোত্তম অস্ত্রশস্ত্র, আধুনিকতম সাজ-সরঞ্জাম ও উপায়-উপকরণ সংগ্রহ করার জন্য পরিপূর্ণ চেষ্টা নেয়। কিন্তু মুসলমানদের আধ্যাত্মিক ও পার্থিব এ হাতিয়ার সম্পর্কে তারা অপরিচিত ও অজ্ঞ। সে কারণেই এই হেদায়ত, এই নির্দেশনামা। আজ আফগান-তালেবানগণ এই দেহায়াত গ্রহণ করেছেন বলেই পৃথিবীর তাবৎ শক্তি সমূহ তাদের প্রতি ভীত সন্ত্রস্ত।

হে মুজাহিদ ভাইয়েরা আমার! আপনারা যদি আল্লাহর রাহে যুদ্ধের ময়দানে দৃঢ়পদ থেকে বুকটান করে যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়ার ইচ্ছা রাখেন, তবেই আল্লাহ আপনাদেরকে দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত রাখবেন, আল্লাহ বলেন-"হে বিশ্বাসীগণ! যদি তোমরা আল্লাহকে সাহায্য কর আল্লাহ তোমাদেরকে সাহায্য করবেন এবং তোমাদের দৃঢ় প্রতিষ্ঠ করবেন।" (মুহাম্মদ-৭)

"হে ঈমানদারগণ! ধৈর্যধারণ কর এবং মোকাবিলায় দৃঢ়তা অবলম্বন কর। আর আল্লাহকে ভয় করতে থাক যাতে তোমরা তোমাদের উদ্দেশ্য লাভে সমর্থ হতে পার।" (ইমরান-২০০)

**(১৩) বল-আমাদের যদি যুদ্ধাস্ত্র কম থাকে তখনো কি আমরা জিহাদ করব?**

"তোমরা বের হয়ে পড় স্বল্প বা প্রচুর সরঞ্জামের সাথে এবং জিহাদ কর আল্লাহর পথে নিজেদের মাল ও জান দিয়ে, এটি তোমাদের জন্যে অতি উত্তম, যদি তোমরা বুঝতে পার।" (তাওবাহ-৪১)

আল্লাহ তাঁর আপন বান্দাগণকে একথাই বুঝিয়েছেন যে, জিহাদে বের হওয়ার জন্য রাসূলুল্লাহ (সাঃ) যখন তোমাদেরকে আদেশ করেন, তখন সর্বাবস্থায় তা তোমাদের জন্য ফরয হয়ে গেল। আর এ আদেশ পালনের মাঝেই নিহিত রয়েছে তোমাদের সমুদয় কল্যাণ।

পৃথিবীর যে কোন স্থানে কোন মানুষ নির্যাতিত হচ্ছে খোঁজ নিলে দেখা যাবে যে, ঐ নির্যাতিতরা মুসলমান। নুবুয়তের সুতীক্ষ্ম দৃষ্টি দ্বারা চৌদ্দশত বছর পূর্বে আপন উম্মতের এই দৈন্যদশা দেখইেতো আমার নবী, নবী উস্‌সাইফ (সাঃ) বলেছিলেন- اَلْجِهَادُ مَاضٍ اِلٰى يَوْمِ الْقِيَامِةِ এই জিহাদ ক্বিয়ামত পর্যন্ত বলবৎ থাকবে। উপরন্তু আল্লাহর নির্দেশ হল যা আছে তা নিয়ে বের হও। তোমাদের সফলতা লাভের জন্য এ পরিমাণ যুদ্ধোপকরণ ও অস্ত্রশস্ত্র অপরিহার্য নয় যে, তোমাদের প্রতিপক্ষের নিকট যে ধরনের এবং যে পরিমাণ উপকরণ রয়েছে, বরং সামর্থ্য অনুযায়ী যা কিছু উপকরণ জোগাড় করতে পার তাই সংগ্রহ করে নাও, তবে সেটুকুই যথেষ্ট, আল্লাহর সাহায্য ও সহায়তা অবশ্যই তোমাদের সঙ্গে থাকবে।

সিরিয়ার মুসলমানদের সেই জিহাদের কথা মনে পড়ল-যখন কাফিররা মুসলিম রমনীকে বন্দী করে সারিতে দাঁড় করিয়ে যৌন লালসা নিবৃত্তকরণের ধৃষ্টতা দেখিয়ে আঙ্গুলের ইশারায় নিজেরা বন্টন করে নিচ্ছিল, তখন হযরত জাররা (রাঃ)-এর বীরঙ্গনা বোন হযরত খাওলা (রাঃ) সকল মহিলাকে বললেনঃ বোনেরা আমার! অবশ্যই দেখেছ কাফিররা তোমাদেরকে ভোগ করার উদ্দেশ্যে এইতো এখন আঙ্গুলের ইশারায় পরস্পর ভাগ-বন্টন করে নিল। তোমরা তাদের ভোগের খোরাক হতে যাচ্ছ। হে কুরাইশ বীর কন্যাগণ! হে আরবের মর্যাদাদীপ্ত মা ও ভগ্নীগণ! ইসলামের জন্য যাদের জীবন উৎসর্গিত, ইসলামের ছায়ায় আশ্রয় নিয়ে যাদের জীবন আজ ধন্য তারা আজ এই সময় কেন আপন মর্যাদা রক্ষায় স্ফুলিংগের মত জ্বলে উঠছে না! কেন তারা প্রতিরোধ গড়ে তুলে কাফিরের নাপাক অস্তিত্ব পৃথিবী থেকে মুছে দিচ্ছে না! একথা শুনে সকল মহিলা উত্তেজনায় কাঁপতে লাগল। তারা বলল, হে খাওলা! আমরা ভীরু নই, কিন্তু লড়ব কি দিয়ে, একটি তরবারীও তো আমাদের নিকট নেই। খাওলা (রাঃ) বললেন, তাঁবুর খুঁটিও কি নেই? আর কিছু না হলেও আপন অমলিন চরিত্র ও উঁচু মর্যাদা সুরক্ষার স্বার্থে শরীরের রক্ততো ঝরাতে পারব। তোমরা ঝাঁপিয়ে পড়।

তাদের তাঁবুর বাইরে পাহারাদার টহল দিচ্ছিল। হঠাৎ পাহারাদারের মাথায় আঘাত করলে সে মাটিতে পড়ে যায়। তার হাতের তরবারী খানা মুজাহিদ মহিলাগণ দখল করে নেন। অল্প সময়ের মধ্যে আরও কয়েকখানা তরবারী তাঁদের হাতে আসে। এহেন সঙ্গীন অবস্থা দেখে সৈনিকরা তাদেরকে ঘিরে ফেলে। কিন্তু কেউ তাঁদের সামনে আসার সাহস পাচ্ছিলনা। সকল মহিলা লাঠি ঘুরিয়ে কাফিরদের তাড়িয়ে দিচ্ছিলেন। মহিলাদের দমন করার জন্য তাদের চেষ্টায় ত্রুটি ছিল না। কিন্তু তাদের সাথে পারছেনা। জীবন-মরণ লড়ে যাচ্ছেন ইসলামের শ্রেষ্ঠ রমনীগণ। এমন সময় দূর থেকে "তাকবীরের" আওয়াজ শুনা গেল। পৃথিবী তাকিয়ে দেখল, এদিকেই এগিয়ে আসছেন ইতিহাসের শ্রেষ্ঠ যোদ্ধা আল্লাহর তরবারী খালেদ ইবনে ওয়ালিদ (রাঃ)। আকাশ-বাতাস কাঁপানো তার "তাকবীর" ধ্বনী শুনে কাফির সেনারা সন্ত্রস্ত হল। যুদ্ধরত রমনীগণও তাকবীর দিয়ে নবচেতনায় ঝাঁপিয়ে পড়ল ব্যূহ ভেদ করে কাফিরদের উপর। একটি কাফির ও সেদিন জীবন বাঁচিয়ে ফিরে যেতে পারেনি। অথচ কিছুক্ষণ আগে এদের হাতেই বন্দী ছিল পরাজিত রমনীগণ! আর এখন তাঁরাই বিজয়ী।

এবার একটু লক্ষ্য করুন আল্লাহ তা'আলা যখন জিহাদ ফরয করছিলেন তখন মুসলমানদের সংখ্যা যেমন কম ছিল তেমনি সমরাস্ত্র ও কম ছিল।

তাইতো আল্লাহ যথার্থই বলেছিলেন- وَاِنَّ اللّٰهَ عَلٰى نَصْرِهِمْ لَقَدِيْرٌ

**(১৪) বল-জিহাদ চলাকালীন সময় আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে কি সাহায্য করবেন?**

"আল্লাহ মুমিনদের থেকে শত্রুদেরকে হটিয়ে দেবেন। আল্লাহ কোন বিশ্বাসঘাতক অকৃতজ্ঞকে পছন্দ করেন না।" (হজ্জ-৩৮)

"নিশ্চয় দুটো দলের মোকাবিলার মধ্যে তোমাদের জন্য নিদর্শন ছিল। একটি দল আল্লাহর রাহে যুদ্ধ করে। আর অপর দল ছিল কাফেরদের, এরা স্বচক্ষে তাঁদেরকে দ্বিগুণ দেখছিল। আর আল্লাহ যাকে ইচ্ছা নিজের সাহায্যের মাধ্যমে শক্তিদান করেন। এরই মধ্যে শিক্ষনীয় রয়েছে দৃষ্টি সম্পন্নদের জন্য।" (ইমরান:১৩)

"যৎ সামান্য কষ্ট দেওয়া ছাড়া তারা তোমাদের কোন ক্ষতি করতে পারবেনা। আর যদি তারা তোমাদের সাথে লড়াই করে, তাহলে তারা পশ্চাদপসারণ করবে, অতঃপর তাদের সাহায্য করা হবে না।" (ইমরান-১১১)

"অথচ আল্লাহ তোমাদের শত্রুদেরকে যথার্থই জানেন। আর অভিভাবক হিসেবে আল্লাহই যথেষ্ট এবং সাহায্যকারী হিসেবেও আল্লাহই যথেষ্ট।" (নিসা-৪৫)

"আল্লাহ তোমাদের সাহায্য করেছেন অনেক ক্ষেত্রে এবং হোনাইনের দিনে, যখন তোমাদের সংখ্যাধিক্য তোমাদের প্রফুল্ল করেছিল, কিন্তু তা তোমাদের কোন কাজে আসেনি।" (তওবাহ-২৫)

সুপ্রিয় পাঠক বন্ধু আমার! আল্লাহর এইসব নিশ্চয়তাপূর্ণ প্রতিশ্রুতির প্রতি কি আপনার বিশ্বাস নেই? যদি বিশ্বাস থাকে এখনই চলে আসুন জিহাদের ময়দানে। আর যদি মৃত্যুকে ভয় করে জিহাদের ময়দানে না আসেন, তাহলে আল্লাহর এই বাণী জেনে রাখুন-"তোমরা যেখানেই থাকনা কেন; মৃত্যু কিন্তু তোমাদেরকে পাকড়াও করবেই। যদি তোমরা সুদৃঢ় দূর্গের ভেতরেও অবস্থান কর, তবুও।" (নিসা-৭৮)

**(১৫) বল-আল্লাহর সাহায্যের ফেরেস্তারাও কি আমাদের পক্ষ হয়ে জিহাদ করবে?**

"আপনি যখন বলতে লাগলেন মু'মিনগণকে তোমাদের জন্য কি যথেষ্ট নয় যে, তোমাদের সাহায্যার্থে তোমাদের পালনকর্তা আসমান থেকে অবতীর্ণ তিন হাজার ফেরেস্তা পাঠাবেন! অবশ্য তোমরা যদি সবর কর এবং বিরত থাক আর তারা যদি তখনই তোমাদের উপর চড়াও হয়, তাহলে তোমাদের পালনকর্তা চিহ্নিত ঘোড়ার উপর পাঁচ হাজার ফেরেস্তা তোমাদের সাহায্যে পাঠাতে পারেন। বস্তুতঃ এটাতো আল্লাহ তোমাদের সুসংবাদ দান করলেন, যাতে তোমাদের মনে এতে শান্তনা আসতে পারে। আর সাহায্য শুধুমাত্র পরাক্রান্ত, মহাজ্ঞানী আল্লাহরই পক্ষ থেকে।" (ইমরান-১২৫-১২৬)

"তোমরা যখন ফরিয়াদ করতে আরম্ভ করেছিলে স্বীয় পরওয়ারদিগারের নিকট,

তখন তিনি তোমাদের ফরিয়াদের মঞ্জুরী দান করলেন যে, আমি তোমাদেরকে সাহায্য করব ধারাবাহিকভাবে আগত হাজার ফেরেস্তার মাধ্যমে। আর আল্লাহ তো শুধু সুসংবাদ দান করলেন যাতে তোমাদের মন আশ্বস্ত হতে পারে। আর সাহায্য আল্লাহর পক্ষ থেকে ছাড়া অন্য কারো পক্ষ থেকে হতে পারে না। নিঃসন্দেহে তিনি মহাশক্তির অধিকারী, হেকমতওয়ালা"। (আনফাল-৯,১০)

"যখন নির্দেশ দান করেন ফেরেস্তাদিগকে তোমাদের পরওয়ারদেগার যে, আমি সাথে রয়েছি তোমাদের সুতরাং তোমরা মুসলমানদের চিত্ত সমূহকে ধীরস্থির করে রাখ। আমি কাফেরদের মনে ভীতির সঞ্চার করে দেব।" (আনফাল-১২)

"অতঃপর আল্লাহ নাযিল করেন নিজের পক্ষ থেকে শান্তনা তাঁর রাসূল ও মু'মিনদের প্রতি এবং অবতীর্ণ করেন এমন সেনা বাহিনী যাঁদের তোমরা দেখতে পাওনি। আর শাস্তি প্রদান করেন কাফেরদের এবং এটি কাফেরদের কর্মফল।" (তওবাহ-২৬)

পাঠক বন্ধু আমার! কোরআনের এরূপ উক্তি থেকে কি আপনার বুঝে আসছেনা আল্লাহ ফেরেস্তার মাধ্যমে মুজাহিদদের সাহায্য করেন এবং তারাও কাফেরের সাথে সম্মুখ যুদ্ধে অবতীর্ণ হন। কোরান বলে ৯০০ ফেরেস্তা মোজাহিদের পক্ষ হয়ে কাফেরদের বিরুদ্ধে জিহাদ করে। অতএব আমাদের আর কোন ভয় নেই।

এক ফরাসী সাংবাদিক বলেছিলেন-

"আমি আফগানিস্তানে জিহাদের রিপোর্ট সংগ্রহ করতে গিয়েছিলাম। যুদ্ধের ভেতর বহুদিন সেদেশে কাটিয়েছি। দেশে ফিরে ইসলাম গ্রহণ করেছি। আমি মুজাহিদদের আল্লাহকে তাদের সাথে মিলিত হয়ে যুদ্ধ করতে দেখেছি।"

আল্লাহর সাহায্য দেখে কাট্টা কাফেরও ইসলাম গ্রহণ করছে, কিন্তু এখনো কি আপনার মনে এরূপ এলোপাতাড়ি প্রশ্ন জাগবে? আল্লাহর দোহায় দিয়ে বলছি অতি- সত্ত্বর তাঁর দরবারে তওবাহ প্রার্থনা করুন। কোরআন হাদীস পড়ে, বুঝে-শুনে আমলে লাগুন তবেই আল্লাহর সন্তুষ্টি ও জান্নাতের আশা করা যাবে। আরও অনুরোধ করব আপনার এই তওবা প্রার্থনাটি যেন জিহাদের ময়দানে হয়; কেননা জিহাদের ময়দানে যে কোন প্রার্থনা আল্লাহর দরবারে নবীগণের প্রার্থনা সম কবুল হয়।

**(১৬) বল-কাফেরদের পরাস্ত করে যদি তাদের কোন ধন-সম্পদ পেয়ে যাই তবে, উহা কি আমরা ব্যবহার করতে পারব?**

"সুতরাং তোমরা খাও গনীমত হিসেবে তোমরা যে পরিচ্ছন্ন ও হালাল বস্তু অর্জন করেছ তা থেকে।" (আনফাল-৬৯)

"আল্লাহ তোমাদেরকে বিপুল পরিমাণ যুদ্ধলব্ধ সম্পদের ওয়াদা দিয়েছেন, যা তোমরা লাভ করবে। তিনি তা তোমাদের জন্য তরান্বিত করবেন"। (ফাত্হ-২০)

কাফেরদের পরাস্ত করে যে সম্পদ পাওয়া যাবে তাকে কোরআন গনীমত বলছে আর তা মুজাহিদদের জন্য হালাল করে দেওয়া হয়েছে।

হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত, নবী করীম (সাঃ) ইরশাদ করেছেন, "আমার পূর্বের কোন জাতির জন্য গনীমতের মাল হালাল ছিলনা। আল্লাহ পাক আমাদের দুর্বলতা এবং অক্ষমতার দিকে লক্ষ করে আমাদের জন্য তা হালাল করে দিয়েছেন।" (বোখারী ও মুসলিম)

পূর্বের উম্মতদের জন্য গনীমতের মাল হালাল ছিলনা। তাঁরা গনীমতের মাল সমূহ এক স্থানে জমা করলে আকাশ থেকে আগুন এসে তা জ্বালিয়ে ফেলত। আগুন এসে সে মাল জ্বালিয়ে না ফেললে বুঝা যেত, উক্ত জিহাদ আল্লাহর দরবারে কবুল হয়নি।

**(১৭) বল-সমস্ত গনীমত কি শুধু কমান্ডার সাহেব নিয়ে নিবেন?**

"আপনার কাছে জিজ্ঞেস করে, গনীমতের হুকুম সম্পর্কে। বলে দিন-গনীমতের মাল হল আল্লাহর এবং রাসূলের।" (আনফাল-১)

"আর এ কথাও জেনে রাখ যে, কোন বস্তু-সামগ্রীর মধ্য থেকে যা কিছু তোমরা গনীমত হিসেবে পাবে, তার এক পঞ্চমাংশ হল আল্লাহর জন্য, রাসূলের জন্য, তাঁর নিকট আত্মীয়-স্বজনের জন্য এবং এতিম-অসহায় ও মুসাফিরদের জন্য; যদি তোমাদের বিশ্বাস থাকে আল্লাহর উপর এবং সে বিষয়ের উপর যা আমি আমার বান্দার প্রতি অবতীর্ণ করেছি ফায়সালার দিনে, যে দিন সম্মুখীন হয়ে যায় উভয় সেনাদল। আর আল্লাহ সব কিছুর উপর ক্ষমতাসীন।" (আনফাল-৪১)

"আল্লাহ বনু-নুযায়রের কাছ থেকে তাঁর রাসূলকে যে ধনসম্পদ দিয়েছেন, তজ্জন্যে তোমরা ঘোড়ায় কিংবা উটে চড়ে যুদ্ধ করনি, কিন্তু আল্লাহ যার উপর উচ্ছা তাঁর রাসূলগণকে প্রাধান্য দান করেন। আল্লাহ সবকিছুর উপর সর্বশক্তিমান।" (হাশর-৬)

আগেই বলা হয়েছে, কাফেরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ও জিহাদের ফলশ্রুতিতে যে ধন-সম্পদ মুসলমানদের হস্তগত হয়, তাই গনীমতের মাল। যুদ্ধ ও জিহাদ ব্যতিরেখে তাদের থেকে যে সম্পদ অর্জিত হয়, যে সব মাল ফেলে রেখে তারা পলায়ন করে অথবা জিযিয়া ও খেরাজ আকারে সম্মতিক্রমে প্রদান করে এসবই 'ফায়'-এর অন্তর্ভুক্ত এগুলোর ৬ প্রকার ব্যয় খাতের কথা উল্লেখ করা হয়েছে-আল্লাহ, রাসূল, আত্মীয়-স্বজন, এতিম, মিসকিন, মুসাফির। বলাবাহুল্য যে, আল্লাহ তা'আলা দুনিয়া

আখেরাত ও সমস্ত সৃষ্টি জগতের মালিক, তাঁর পবিত্র নামে অংশ বর্ণনা নিছক বরকতের জন্য উল্লেখ করা হয়েছে। এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, এই ধন-সম্পদ অভিজাত, ফযীলতময় হালাল ও পুতঃপবিত্র।

এখন সর্বমোট ব্যয়খাত রয়ে গেল ৫টি। রাসূল, আত্মীয়-স্বজন, এতিম, মিসকীন ও মসাফির। এরা গনীমতের সম্পদের এক পঞ্চমাংশের হকদার এবং সে সঙ্গে ফায়-এর সম্পদের হকদারও এরাই। গনীমত ও ফায় উভয় প্রকার সম্পদের হুকুম এই যে, এগুলো প্রকৃত পক্ষে রাসূল (সাঃ) ও তৎপরবর্তী সময়ে খলিফাগণের পূর্ণ এখতিয়ারে থাকবে। তাঁরা ইচ্ছা করলে এই ধন-সম্পদ সাধারণ মুসলমানদের উপকারার্থে বায়তুল মালে জমা করতে পারেন অথবা ইচ্ছে করলে বন্টনও করতে পারেন। তবে বন্টন করলে উপরে বর্ণিত ৫ প্রকার হকদারের মধ্যে সীমিত থাকতে হবে। (মাসায়েলে মা'আরিফুল কোরআ-১৬২ পৃঃ)

হযরত ইবনে ওমর (রাঃ) বলেন, "আমরা যুদ্ধ চলাকালে (শত্রুদের) মধু এবং আঙ্গুর পেলে খেয়ে ফেলতাম তা বন্টন করার জন্য রাসূলে করীমের (সাঃ) নিকট নিয়ে যেতাম না।" (বোখারী)

এ ব্যাপারে ফেকাহবিদগণ একমত যে, মুজাহিদগণ যতক্ষণ পর্যন্ত দারুল হরবে (শত্রু কবলিত দেশে) থাকেন ততক্ষণ পর্যন্ত গনীমতে পাওয়া খাদ্য সামগ্রী (রুটি, গোস্ত ইত্যাদি) বন্টন হওয়ার পূর্বে প্রয়োজনমত পানাহার করতে পারেন। গনীমতের বিভিন্ন প্রকার মাল ও তার হুকুম আহকাম নিম্নে দেয়া হলো।
বর্তমান যুগে গনীমতের মাল দু'ধরনের হবে। খাদ্য ও পেয় সামগ্রী, খাদ্যও নয় পেয়েও নয় অন্য রকম সামগ্রী। প্রথম প্রকার আবার দু'ধরনের-আহার্য ও ঔষধ জাতীয়। এমনিভাবে খাদ্যও নয় পেয়েও নয় অন্য রকম সামগ্রী ও দু'ধরনের। অস্ত্র, অস্ত্র নয় এমন। সারকথাঃ গনীমতের মাল চার প্রকার (১) আহার্য্য সামগ্রী, যেমন-গোস্ত, রুটি, ঘি, মধু, চিনি, গুড়, ফল, পিয়াজ অথবা গরু-ছাগল যা জবেহ করে খাওয়া যায়। (২) ঔষধ (৩) অস্ত্র (৪) অস্ত্র ছাড়া অন্য কিছু। যেমন-কাপড়, কম্বল ইত্যাদি।

প্রথম প্রকারের হুকুমঃ মুজাহিদগণ যতক্ষণ পর্যন্ত দারুল হরবে থাকবেন ততক্ষণ পর্যন্ত প্রয়োজন অনুপাতে এ প্রকার গনীমতের মাল থেকে বন্টনের পূর্বে খেতে পারবেন। গরু-ছাগল হলে তা জবেহ করতে পারবেন। তবে চামড়াটা অবশ্যই বায়তুল মালে জমা করে দিতে হবে।

দ্বিতীয় প্রকারের হুকুম ঃ তা কেউ ব্যবহার করতে পারবেনা। পাওয়া মাত্রই বায়তুল মালে জমা দিতে হবে তবে কোন মুজাহিদ যদি রোগী হন এবং প্রাপ্ত

ঔষধ তার প্রয়োজন হয়, তাহলে তিনি তা ব্যবহার করতে পারবেন।

তৃতীয় ও চতুর্থ প্রকারের হুকুম ঃ এসব গনীমতের মাল তৎক্ষণাত মারকাযে জমা দিতে হবে। এসব মাল বন্টন হওয়ার পূর্বে কোন মুজাহিদ নিজের কাছে রাখতে পারবেনা। তবে যদি কোন মুজাহিদের গুলি শেষ হয়ে গিয়ে থাকে অথবা মেগ্জিন, বন্দুক, সওয়ারী, গরম কাপড় ইত্যাদির প্রয়োজন দেখা দেয়, তাহলে বন্টন হওয়ার পূর্বে আমীরের অনুমতিক্রমে যুদ্ধ শেষ হওয়া পর্যন্ত এসব সামগ্রী ব্যবহার করতে পারবে। যুদ্ধ শেষ হওয়া মাত্র এসব সামগ্রী মারকাযে জমা দিয়ে দিতে হবে। যদি যুদ্ধ শেষ হওয়ার পূর্বে সে বস্তু নষ্ট হয়ে যায় তাহলে তার ক্ষতিপূরণ দিতে হবে না।

**(১৮) বল-জিহাদের পরে যারা (কাফেররা) আমাদের হাতে বন্ধি হবে তাদেরকে কি করব?**

"হে নবী! তাদেরকে বলে দাও, যারা তোমার হাতে বন্ধি হয়ে আছে, আল্লাহ যদি তোমাদের অন্তরে কোন রকম মঙ্গল চিন্তা রয়েছে বলে জানেন, তবে তোমাদেরকে তার চেয়ে বেশী দান করবেন যা তোমাদের কাছ থেকে বিনিময়ে নেয়া হয়েছে। তাছাড়া তোমারদেক তিনি ক্ষমা দেবেন। বস্তুতঃ আল্লাহ ক্ষমাশীল করুণাময়।" (আনফাল-৭০)

"অতঃপর যখন তেমরা কাফেরদের সাথে যুদ্ধে অবতীর্ণ হও, তখন তাদের গর্দান মার, অবেশেষে যখন তাদেরকে পূণরূপে পরাভূত করবে তখন তাদেরকে শক্ত করে বেঁধে ফেল। অতঃপর হয় তাদের প্রতি অনুগ্রহ কর, না হয় তাদের নিকট হতে মুক্তি পণ নাও।" (মুহাম্মদ-৪)

**মাসআলা ঃ** যুদ্ধ বন্ধীদেরকে হত্যা করা বা দাসে পরিণত করার বিষয়ে মুসলিম শাসন কর্তার পূর্ণ অধিকার রয়েছে, এ বিষয়ে সমগ্র উম্মত একমত; অবশ্য মুক্তিপণ নিয়ে বা মুক্তিপণ ব্যতিরেখে ছেড়ে দেওয়ার বিষয়ে যদিও কিছু মতানৈক্য রয়েছে, কিন্তু অধিকাংশ ফেকাহ্বিদগণের মতে উপরোক্ত উভয় পন্থাই জায়েয।

**মাসআলা ঃ** যুদ্ধ বন্ধিদেরকে দাসে পরিণত করার বিধান কেবল বৈধতা পর্যন্ত সীমিত। অর্থাৎ ইসলামী হুকুমত যদি সমীচিন বিবেচনা করে, তবে তাদেরক দাসে পরিণত করতে পারে, এরূপ করা মুস্তাহাব বা ওয়াজীব নয়। বরং কোরআন ও হাদীসের সমষ্টিগত বাণী থেকে মুক্ত করাই আফ্যল বা উত্তম বলে বোঝা যায়। দাসে পরিণত করার অনুমতিও তখন, যখন শত্রু পক্ষের সাথে এর বিপরীত কোন চুক্তি হয়ে যায় যে, তারা আমাদের বন্ধিদেরকে দাসে পরিণত করবেনা এবং আমরাও তাদের বন্ধিদেরকে দাসে পরিণত করব না; তবে এ চুক্তি মেনে চলা অবশ্য জরুরী

হবে। বর্তমানে অনেক দেশ পরস্পর এ চুক্তিতে আবদ্ধ রয়েছে। যে সমস্ত ইসলামী দেশ এরূপ চুক্তিতে আবদ্ধ রয়েছে, তাদের জন্য চুক্তি বিদ্যমান থাকা পর্যন্ত শত্রু পক্ষের যুদ্ধ বন্ধিদেরকে দাসে পরিণত করা জায়েয হবেনা। (মাসায়েলে মা'আরিফুল কো ঃ ১৫৯০-১৬০ পৃঃ)

**(১৯) বল-আমরা মনে করি-কাফেররা এক সংঘবদ্ধ শক্তি আসলে কি তাই?**

"তারা সংঘবদ্ধভাবেও তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে পারবেনা। তারা যুদ্ধ করবে কেবল সুরক্ষিত জনপদে অথবা দুর্গ প্রাচীরের আড়ালে থেকে। তাদের পারস্পরিক যুদ্ধই প্রচন্ড হয়ে থাকে। আপনি তাদেরকে ঐক্যবদ্ধ মনে করবেন; কিন্তু তাদের অন্তর শতধাবিচ্ছিন্ন। এটা এ কারণে যে, তারা এক কান্ডজ্ঞানহীন সম্প্রদায়।" (হাশর-১৪)

যুদ্ধের ময়দানে ক্যাম্পে অবস্থানকারী কাফেরদের কোন এক জনের শরীরে যখন মুজাহিদদের নিক্ষিপ্ত বুলেট এসে বিদ্ধ হয় আর যখন সে মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা লড়ে তার এই অবস্থা দেখে অন্যান্য কাফেররাও পিছনে ছুটতে থাকে। এ ব্যাপারটি কোরআনে আল্লাহ তা'আলা এভাবে উল্লেখ করেছেন ঃ ইহুদীরা দাবী করে বলেছিল, আমরা আল্লাহর সন্তান। আমরাই আল্লাহর প্রিয় পাত্র। এরই পরিপ্রেক্ষিতে বলা হয়েছেঃ

"যদি তোমরা সত্যবাদী হয়ে থাক, তবে মৃত্যু কামনা কর।" (বাক্বারা-৯৪) মৃত্যু অতিদ্রুত তোমাদেরকে মিলিত করবে তোমাদের প্রেমাস্পদ আল্লাহর সাথে। প্রত্যেক প্রেমিক প্রেমাস্পদের মিলন কামনা করে। তোমাদের প্রেমাস্পদ আল্লাহর সাথে তোমাদের মিলনে একমাত্র বাঁধা মৃত্যু। অতএব মৃত্যুর ময়দানে তথা জিহাদের ময়দানে এস। কিন্তু-"কস্মিনকালেও তারা মৃত্যু কামনা করবে না।" (বাক্বারা-৯৫) মৃত্যুর ঘনঘটা শুরু হলে তারা সেখান থেকে দূরে পালায় এবং বলে যেখানে মরণ আছে সেখানে আমরা নেই। অপর দিকে মুজাহিদরা মৃত্যুকে ভয় করেনা বরং তারা শাহাদাতের সুধা পান করার জন্য সদা অপেক্ষমান।

**(২০) বল-কেউ যদি ভয়ে ময়দান থেকে পালিয়ে যায়, তার জন্য কি বিধান?**

"হে ঈমানদারগণ, তোমরা যখন কাফেরদের মুখোমুখী হবে, তখন পশ্চাদ-পসারণ করবেনা। আর যে লোক সে দিন তাদের থেকে পশ্চাদ পসারণ করবে, অবশ্য যে লড়াইয়ের কৌশল পরিবর্তন কল্পে কিংবা যে নিজ সৈন্যদের নিকট আশ্রয় নিতে আসে সে ব্যতীত অন্যরা আল্লাহর গজব সাথে নিয়ে প্রত্যাবর্তন করবে। আর তার ঠিকানা হল জাহান্নাম। বস্তুতঃ সেটা হল নিকৃষ্ট অবস্থান।" (আনফাল-১৫,১৬)

উল্লেখিত আয়াত দু'টিতে ইসলামের একটি সমরনীতি বাতলে দেওয়া হয়েছে।

১৫নং-এর মর্মার্থ হল, উভয় বাহিনীর মোকাবিলা ও মুখোমুখি সংঘর্ষ। অর্থাৎ-যুদ্ধ আরম্ভ হয়ে যাবার পর পশ্চাদপসারণ এবং যুদ্ধ ক্ষেত্র থেকে পালিয়ে যাওয়া মুসলমানদের জন্য জায়েয নয়। অতঃপর ১৬ নং আয়াতে এ হুকুমের আওতা থেকে একটি অব্যাহতি এবং নাজায়েয পন্থায় পলায়ন কারীদের সুকঠিন আযাবের বিষয় বর্ণনা করা হয়েছে। বলা হচ্ছে-যুদ্ধাবস্থায় পশ্চাদপসারণ করা দুই অবস্থায় জায়েয।

প্রথমত ঃ যুদ্ধক্ষেত্র থেকে এ পশ্চাদপসারণ হবে শুধুমাত্র যুদ্ধের কৌশল স্বরুপ, শত্রুকে দেখাবার জন্য। প্রকৃতপক্ষে এতে যুদ্ধ ছেড়ে পলায়নের কোন উদ্দেশ্য থাকবেনা; বরং প্রতিপক্ষকে অসতর্কাবস্থায় ফেলে হঠাৎ আক্রমণ করাই থাকবে এর প্রকৃত উদ্দেশ্য। দ্বিতীয়ত ঃ বিশেষ কোন অবস্থা যাতে সমর ক্ষেত্র থেকে পশ্চাদপসারণের অনুমতি রয়েছে, তাহল এই যে, নিজেদের উপস্থিত সৈন্যদের দূর্বলতা বোধ করে সে জন্য পেছনের দিকে সরে আসা, যাতে মুজাহিদগণ অতিরিক্ত শক্তি অর্জন করে পুনরায় আক্রমণ করতে সক্ষম হয়।

এই স্বতন্ত্রতার বর্ণনার পর সে সব লোকের শাস্তির কথা বলা হয়েছে, যারা এই স্বতন্ত্রাবস্থা ছাড়াই অবৈধভাবে যুদ্ধক্ষেত্র ত্যাগ করেছে কিংবা পশ্চাদপসারণ করেছে। এরশাদ হচ্ছে-"যুদ্ধ ক্ষেত্র ছেড়ে যারা পালিয়ে যায় তারা আল্লাহ তা'আলার গযব নিয়ে ফিরে যায় এবং তাদের ঠিকানা হল জাহান্নাম। আর সেটি হল নিকৃষ্ট অবস্থান।" পাঠক বন্ধু আমার, দুশমন যেমন কোন দেশের সৈনিক, মুজাহিদও তেমিন আল্লাহর সৈনিক। মুজাহিদ যুদ্ধের ময়দানে ভয় করেনা, কেননা আল্লাহ স্বয়ং তাদেরকে শান্ত না দিয়ে বলেন-"তাদের পশ্চাদ্বাবনে শৈথিল্য করোনা। যদি তোমরা আঘাত প্রাপ্ত, তবে তারাওতো তোমাদের মতই হয়েছে আঘাতপ্রাপ্ত এবং তোমরা আল্লাহর কাছে আশা কর, যা তারা আশা করেনা। আল্লাহ মহাজ্ঞানী, প্রজ্ঞাময়।" (নিসা-১০৪)

**<u>(২১) বল-কম সংখ্যক মুজাহিদ অধিক সংখ্যক কাফিরের উপর ঝাপিয়ে পড়ে কোন সাহসে?</u>**

"বহু ক্ষুদ্র দল বিরাট দলের মুকাবিলায় জয়ী হয়েছে আল্লাহর হুকুমে।" (বাক্বারাহ-২৪৯)

"তোমরা কাফিরদেরকে পৃথিবীতে পরাক্রমশালী মনে করোনা।" (নূর-৫৭)

"যদি কাফিররা তোমাদের মোকাবিলা করত, তবে তারা অবশ্যই পৃষ্ঠ প্রদর্শন করত। তখন তারা কোন অভিভাবক ও সাহায্যকারী পেত না।" (ফাত্হ্-২২)

"নিশ্চয় তোমরা তাদের অন্তরে আল্লাহ তায়ালা অপেক্ষা অধিকতর ভয়াবহ।

এটা এ কারণে যে, তারা এক নির্বোধ সম্প্রদায়।" (হাশর-১৩)

"হে পাঠক বন্ধু আমার, আল্লাহ তাআলার উপরোক্ত চিরন্তন সত্য প্রতিশ্রুতিই মুজাহিদদের দৃঢ় ঈমানের ভিত্তি, যা অল্প সংখ্যক মুজাহিদ হয়েও অধিক সংখ্যক কাফিরের উপর ঝাপিয়ে পড়ার সাহস যোগায়।

**(২২) বল-হুজুর পাক (সাঃ) ও কি স্বয়ং জিহাদ করেছেন?**

"আর আপনি যখন পরিজনদের কাছ থেকে সকাল বেলা বেরিয়ে গিয়ে মুমিনগণকে যুদ্ধের অবস্থানে বিন্যস্ত করলেন, আর আল্লাহ সব বিষয়েই শুনেন এবং জানেন।" (আলে ইমরান-১২১)

হুজুর (সাঃ) যে স্বয়ং জিহাদ করেছেন তা কোরআনের অসংখ্য আয়াত দ্বারা প্রমাণ রয়েছে। উপরোক্ত আয়াতের দ্বারা যদি তা আপনার বুঝে না আসে তাহলে খোদ নবী (সাঃ) এর পবিত্র জবান থেকে শুনুন।

"সে সত্তার শপথ, যার কুদরতী হাতের মুঠোয় আমার জীবন। যদি এমন মুসলমান না থাকত যাদের পক্ষে আমি যুদ্ধে চলে যাওয়ার পর ঘরে বসে থাকা সহনযোগ্য নয়, এদিকে আমারও এতটুকু সামর্থ নেই যে, তাদের যুদ্ধে নিয়ে যাওয়ার জন্য সওয়ারীর ব্যবস্থা করে দিতে পারি, তাহলে আমি খোদার রাহে যুদ্ধরত কোন সৈন্য দলের সাথে যুদ্ধে শরিক না হয়ে পেছনে থাকতাম না।" (বোখারী ও মুসলিম)

হুজুরে পাক (সাঃ) ২৭টি সশস্ত্র জিহাদের কমান্ডার ইন চীফ ছিলেন এবং ৪৩টি মতান্তরে ৫০টি জিহাদে সাহাবায়ে কেরামকে সেনাপতি বানিয়ে পাঠিয়েছিলেন। নিম্নে উহার বর্ষওয়ারী একটি নকশা পেশ করছি ঃ

১ হিজরী ঃ এ হিজরীতে হযরত (সাঃ) ২টি সারিয়া প্রেরণ করেন। ১ম সারিয়ায়ে হামযা (রাঃ) এবং ২য় সারিয়ায়ে উবায়দা (রাঃ)।

২ হিজরী ঃ ৭টি গাযওয়া সংঘটিত হয়- ১. গাযওয়ায়ে আবওয়াহ; ২. গায্ওয়ায়ে বয়াত; ৩. গায্ওয়ায়ে বদরে কুবরা; ৪. গায্ওয়ায়ে বনী কায়নুকা; ৫. গায্ওয়ায়ে সাবীক; ৬. সাফওয়ান; ৭. যুল-উশায়রা। ৩টি সারিয়া প্রেরণ করেন- ১. সারিয়ায়ে আব্দুল্লাহ বিন জাহাশ (রাঃ) ২. সারিয়ায়ে উমায়র (রাঃ); ৩. সারিয়ায়ে সালেম (রাঃ)।

৩ হিজরী ঃ ৪টি গায্ওয়া সংঘটিত হয়- ১. গায্ওয়ায়ে গাতফান; ২. গায্ওয়ায়ে ওহুদ; ৩. গায্ওয়ায়ে হামরাউল আসাদ; ৪. বুহরান। ২টি সারিয়া প্রেরণ করেন- ১. সারিয়ায়ে মুহাম্মদ বিন মাসলামা (রাঃ); ২. সারিয়ায়ে যায়দ বিন হারিসা (রাঃ)।

৪ হিজরী ঃ ২টি গাযওয়া সংঘটিত হয়- ১. গায্ওয়ায়ে বনী নযীর; ২. গায্ওয়ায়ে বদরে সুগরা। ৪টি সারিয়া প্রেরিত হয়- ১. সারিয়ায়ে আবু সালমা (রাঃ); ২.

সারিয়ায়ে আবদুল্লাহ বিন ওনাইস (রাঃ); ৩. সারিয়ায়ে মুনজির (রাঃ); ৪. সারিয়ায়ে মুরহিদ (রাঃ)।

৫ হিজরী ঃ ৫টি গায্ওয়া সংঘটিত হয়- ১. গায্ওয়ায়ে জাতুররেকা, ২. গায্ওয়ায়ে দাওমাতুল জন্দল; ৩. গায্ওয়ায়ে মরীসিয়াহ্; ৪. গায্ওয়ায়ে খন্দক; ৫. বনু-কুরায়যা।

৬ হিজরী ঃ ৩টি গায্ওয়া সংঘটিত হয়- ১. গাযওয়ায়ে বনী লিহইয়ান; ২. গায্ওয়ায়ে গাবা; ৩. গায্ওয়ায়ে হুদায়বিয়া। ১১টি সারিয়া প্রেরণ করা হয়- ১. সারিয়ায়ে মুহাম্মদ বিন মাসলামা (রাঃ); ২. সারিয়ায়ে আকাশা; ৩. সারিয়ায়ে মুহাম্মদ বিন মাসলামা (রাঃ); ৪. সারিয়ায়ে যায়দ বিন হারিসা (রাঃ); ৫. সারিয়ায়ে আব্দুর রহমান বিন আউফ (রাঃ); ৬. সারিয়ায়ে আলী (রাঃ); ৭. সারিয়ায়ে যায়দ বিন হারিসা (রাঃ); ৮. সারিয়ায়ে আব্দুল্লাহ বিন আতীক (রাঃ); ৯. সারিয়ায়ে আব্দুল্লাহ বিন রাওয়াহা (রাঃ); ১০. সারিয়ায়ে কুরজ বিন জাবের (রাঃ); ১১. সারিয়ায়ে আমরুদ দামরী।

৭ হিজরী ঃ এ বছর শুধু গাযওয়ায়ে খায়বর সংঘটিত হয় এবং ৫টি সারিয়া প্রেরণ করা হয়- ১. সারিয়ায়ে আবু বদর (রাঃ); ২. সারিয়ায়ে বাশার বিন সা'আদ (রাঃ); ৩. সারিয়ায়ে গালিম বিন আব্দুল্লাহ (রাঃ); ৪. সারিয়ায়ে বশীর (রাঃ), ৫. সারিয়ায়ে আহজাম (রাঃ)।

৮ হিজরী ঃ ৪টি গায্ওয়া সংঘটিত হয়- ১. গায্ওয়ায়ে মাওতা; ২. ফতেহ মক্কা ; ৩. গাযওয়ায়ে হুনায়ন; ৪. গায্ওয়ায়ে তায়েফ। ১০টি সারিয়া প্রেরণ করা হয়। ১. সারিয়ায়ে গালিব (রাঃ); ২. সারিয়ায়ে গাহিব; ৩. সারিয়ায়ে শুজা (রাঃ); ৪. সারিয়ায়ে কা'ব (রাঃ); ৫. সারিয়ায়ে আমর ইবনুল আস (রাঃ); ৬. সারিয়ায়ে আবু উবায়দা বিন জাররাহ (রাঃ); ৭. সারিয়ায়ে আবু কাতাদা (রাঃ); ৮. সারিয়ায়ে খাবিদ (রাঃ); ৯. সারিয়ায়ে তোফায়ল বিন আমর দূসী (রাঃ); ১০. সারিয়ায়ে কাতবা (রাঃ)।

৯ হিজরী ঃ এ বছর 'গায্ওয়ায়ে তাবুক' নামক একটি গুরুত্বপুর্ণ গায্ওয়া সংঘটিত হয়। ৩টি সারিয়াও প্রেরণ করা হয়- ১. সারিয়ায়ে আলকামাহ (রাঃ); ২. সারিয়ায়ে আলী (রাঃ); ৩. সারিয়ায়ে আকাশা (রাঃ)।

১০ হিজরী ঃ এ বছর মাত্র ২টি সারিয়া প্রেরণে করা হয়- ১. সারিয়ায়ে খালিদ বিন ওয়ালীদ (রাঃ), ২. সারিয়ায়ে আলী (রাঃ)।

১১ হিজরী ঃ এ বছর নবী করিম (সাঃ) হযরত উসামা (রাঃ)র নেতৃত্বে একটি সারিয়া প্রেরণ করার নির্দেশ দেন, যা তাঁর ওফাতের পর রওয়ানা হয়। (সীরাতে খাতিমুল আম্বিয়া ঃ ৬১-৬৩)।

**(২৩) বল- পূর্ববর্তী নবীগণও কি জিহাদ করেছেন?**

"মূসার পরে তুমি কি বনী-ইসরাঈলের একটি দলকে দেখনি, যখন তারা বলেছে নিজেদের নবীর কাছে যে, আমাদের জন্য একজন বাদশাহ নির্ধারিত করে দিন যাতে আমরা আল্লাহর পথে যুদ্ধ করতে পারি। নবী বললেন, তোমাদের প্রতিও কি এমন ধারণা করা যায় যে, লড়াইর হুকুম যদি হয়, তাহলে তখন তোমরা লড়বেনা? তারা বলল, আমাদের কি হয়েছে যে, আমরা আল্লাহর পথে লড়াই করব না? অথচ আমরা বিতাড়িত হয়েছি নিজেদের ঘরবাড়ী ও সন্তান-সন্ততি থেকে।

অতঃপর যখন লড়াইয়ের নির্দেশ হল, তখন সামান্য কয়েকজন ছাড়া তাদের সবাই ঘুরে দাঁড়ালো। আর আল্লাহ তা'আলা জালেমদের ভাল করেই জানেন। আর তাদেরকে তাদের নবী বললেন- নিশ্চয়ই আল্লাহ তালূতকে তোমাদের জন্য বাদশাহ সাব্যস্ত করেছেন। তারা বলতে লাগল, তা কেমন করে হয় যে, তার শাসন চলবে আমাদের উপর! অথচ রাষ্ট্রক্ষমতা পাওয়ার ক্ষেত্রে তার চেয়ে আমাদেরই অধিকার বেশী। আর সে সম্পদের দিক দিয়েও সচ্ছল নয়। নবী বললেন নিশ্চয় আল্লাহ তোদের উপর তাকে পছন্দ করেছেন এবং স্বাস্থ্য ও জ্ঞানের দিকে দিয়ে প্রাচুর্য দান করেছেন। বস্তুতঃ আল্লাহ যাকে ইচ্ছা তাকেই রাজ্য দান করেন। আর আল্লাহ হলেন অনুগ্রহ দানকারী এবং সব বিষয়ে অবগত। বনী-ইসরাইলদেরকে তাদের নবী আরও বললেন, তালুতের নেতৃত্বের চিহ্ন হল এই যে, তোমাদের কাছে একটা সিন্দুক আসবে তোমাদের পালনকর্তার পক্ষ থেকে তোমাদের মনের সন্তুষ্টির নিমিত্তে। আর তাতে থাকবে মূসা, হারুন এবং তাদের সন্তানবর্গের পরিত্যক্ত কিছু সামগ্রী, সিন্দুকটিকে বয়ে আনবে ফেরেস্তারা। তোমরা যদি ঈমানদার হয়ে থাক, তাহলে এতে তোমাদের জন্য নিশ্চয় পরিপূর্ণ নির্দশন রয়েছে। অতঃপর তালুত যখন সৈন্য-সামন্ত নিয়ে বেরুল, তখন বলল, নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদিগকে পরীক্ষা করবেন একটি নদীর মাধ্যমে। সুতরাং যে লোক সেই নদীর পানি পান করবে সে আমার নয়! আর যে লোক তার স্বাদ গ্রহণ করলনা নিশ্চয় সে আমার লোক। কিন্তু যে লোক হাতের আঁজলা ভরে সামান্য খেয়ে নেবে তার দোষ অবশ্য তেমন গুরুতর হবেনা। অতঃপর সবাই পান করল সে পানি, সামান্য কয়েকজন ছাড়া। পরে তালুত যখন তা পার হল এবং তাঁর সাথে ছিল মাত্র কয়েকজন ঈমানদার তখন তারা বলতে লাগল, আজকের দিনে জালুত এবং তার সেনাবাহিনীর সাথে যুদ্ধ করার শক্তি আমাদের নেই। যাদের ধারণা ছিল যে, আল্লাহর সামনে তাদের একদিন উপস্থিত হতে হবে, তারা বার বার বলতে লাগল, সামান্য দলই বিরাট দলের মোকাবিলায় জয়ী হয়েছে আল্লাহর হুকুমে। আর যারা ধৈর্য্যশীল আল্লাহ তাদের

সাথে রয়েছেন। আর যখন তালুত ও তাঁর সেনাবাহিনী শত্রুর সম্মুখীন হল, তখন বলল হে আমাদের পালনকর্তা আমাদের মনে ধৈর্য সৃষ্টি করে দাও এবং আমাদেরকে দৃঢ়পদ রাখ, আর আমাদের সাহায্য কর সে কাফির জাতির বিরুদ্ধে, তারপর ঈমান- দাররা আল্লাহর হুকুমে জালুতের বাহিনীকে পরাজিত করে দিল এবং দাউদ জালুতকে হত্যা করল। আর আল্লাহ দাউদকে দান করলেন রাজ্য ও অভিজ্ঞতা। (বাক্কারা-২৪৬, ২৪৭, ২৪৮, ২৪৯, ২৫০, ২৫১)।

"আর বহু নবী ছিলেন; যাঁদের সঙ্গী সাথীরা তাঁদের অনুবর্তী হয়ে জিহাদ করেছে; আল্লাহর পথে তাদের কিছু কষ্ট হয়েছে বটে, কিন্তু আল্লাহর রাহে তারা হেরেও যায়নি, ক্লান্তও হয়নি এবং দমেও যায়নি। আর যারা সবর করে, আল্লাহ তাদেরকে ভালবাসেন। (ইমরান-১৪৬)

কোরআনের এতটুকু আলোচনার দ্বারা বুঝতে পারি যে, পূর্ববর্তী নবীগণ অবশ্যই জিহাদ করেছিলেন।

**(২৪) বল- সাহাবায়েকেরামের প্রতি আল্লাহর সন্তুষ্টি কখন কোথায় ঘোষণা করা হয়?**

"আল্লাহ মুমিনদের প্রতি সন্তুষ্ট হলেন যখন তারা বৃক্ষের নিচে আপনার কাছে শপথ করল। আল্লাহ অবগত ছিলেন যা তাদের অন্তরে ছিল। অতঃপর তিনি তাদের প্রতি 'ছকীনাহ' (প্রশান্তি) নাযিল করলেন এবং তাদেরকে 'ফাতহে মুবীন' (আসন্ন বিজয়) পুরস্কার দিলেন"। (ফাতাহ-১৮)

একটি বিশেষ ঘটনার প্রেক্ষিতে এ আয়াত নাযিল হয়। যাকে "বাইয়াতে রিযওয়ান" বলা হয়ে থাকে। এ আয়াতে আল্লাহ তাআলা এই শপথে অংশগ্রহণ কারীদের প্রতি স্বীয় সন্তুষ্টি ঘোষণা করেছেন। এ কারণেই একে সন্তুষ্টির শপথ বলা হয়। ঘটনাটি হল এই, ষষ্ঠ হিজরীতে রাসুলুল্লাহ (সাঃ) বায়তুল্লাহ শরীফের জেয়ারতের উদ্দেশ্যে ১৪শত সাহাবায়ে কেরামকে সাথে নিয়ে মক্কায় যাওয়ার ইচ্ছা করেন। মক্কার সর্দারগণ এ সংবাদ জানতে পেরে জাতীয় পর্যায়ের এক প্রতিনিধি সভায় এ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে বসে "কোন অবস্থাতেই আমরা মুসলমানদের এবং তাঁদের কায়েদকে মক্কায় প্রবেশ করতে দেবনা।" মুশরিকদের এই সিদ্ধান্ত অবগত হয়ে হুজুর (রাঃ) একটি কুটনৈতিক মিশন মক্কায় প্রেরণ করার সিদ্ধান্ত গ্রহন করেন। যাতে মুশরিকদের বলা হবে "আমরা যুদ্ধ করার জন্য আসিনি, তওয়াফ করতেই এসেছি। তোমাদের ভয়ের কোন কারণ নেই"। তবে এ কুটনৈতিক মিশনে কাকে পাঠানো হবে চিন্তা করে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) ফারুকে আজম (রাঃ) পাঠানোর ইচ্ছা করলেন। অত্যন্ত স্নেহের দৃষ্টিতে রহমতে আলম (সাঃ) ওমরের প্রতি তাকালেন,

অতঃপর বললেন "হে ওমর! এটা কি ভাল হবে না? আপনি আমাদের প্রতিনিধি হয়ে মক্কায় গিয়ে তথাকার অধিবাসিদেরকে বলবেন, আমরা যুদ্ধ করার জন্য আসিনি, বায়তুল্লাহ শরীফের তাওয়াফ করার জন্য এসেছি"। ফারুকে আজম (রাঃ) আরজ করলেন, এটা কি পরামর্শ না হুকুম? মনে হয় পরামর্শ, যদি তাই হয়, তবে আরজ করছি যে, আমার জন্য এ কর্তব্য সৌভাগ্যের বিষয় যে আমি আপনার প্রতিনিধি হয়েই মক্কায় যাব এবং ইতিহাসের পাতায় "রাসুলুল্লাহ (সাঃ) এর দূত শিরোনামের মধ্যে আমার নাম লিখিত হবে। কিন্তু পরিস্থিতি হল, যে মিশনে আমাকে পাঠাবেন সে মিশনটা সৌন্দর্যময় জমালী এবং স্বভাব গতভাবে আমি হলাম তেজস্বী জলালী। আমার নাম শুনলেই তো ওরা উত্তেজিত হয়ে পড়বে। আমাকে দেখে ওরা যদি তরবারি নিয়ে বের হয়, তবে আমিও তো তসবীহ পড়তে থাকব না। তাদের উত্তরে আমাকেও কিছু করতে হবে বৈকি, ঐদিকে তো তরবারী যুদ্ধ হয়েই যাবে আর আপনি এখানেই অপেক্ষা করতে থাকবেন? এখন বলুন কি হুকুম? রাসুলুল্লাহ (সাঃ) ঠিকই বলেছেন বলে একটু মুচকি হাসলেন। এখন রাসুলুল্লাহ (সাঃ) এর দৃষ্টি নিবদ্ধ হয় এমন এক লোকের প্রতি, যিনি দান খয়রাত, লজ্জা শরম ও ধৈর্য এবং সবরের মূর্তপ্রতীক। হুজুর (সাঃ) বলেন- "হে ওসমান! আপনি আমাদের প্রতিনিধি হয়ে যাওয়াটা ভাল হবেনা? আমি আশাকরি মক্কাবাসিরা আপনার প্রতি লজ্জিত থাকবে" আল্লাহর রাসূর (সাঃ) এর অনুমান ছিল সঠিক। মক্কাবাসীরা তো হযরত ওসমান (রাঃ) এর প্রতি লজ্জাবনত হত। কিন্তু তথাকথিত চিন্তাবিদ (?) মওদূদীর লজ্জাবোধ নেই। সে হযরত ওসমান (রাঃ) এর মাঝে খেয়ানত ও স্বজনপ্রীতি দেখতে পায় (নাউজুবিল্লাহ) "খেলাফত ও মুলুকিয়াত" এ সে এ অভিযোগ উত্থাপন করেছে। দেখুন "ভুলসংশোধন" ১১০ পৃষ্ঠা।

ওসমান (রাঃ) রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর প্রতিনিধি হয়ে মক্কায় আসেন, অতঃপর কুফফারে মক্কার উদ্দেশ্যে তিনি বলেন- "আমি তোমাদেরকে একথা জানিয়ে দিতে এসেছি যে, আমার মুনিব বায়তুল্লাহ শরীফের তাওয়াফ করতে এসেছেন যুদ্ধ করার জন্য আসেননি। তোমরা যে তাঁকে প্রবেশ করতে না দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছ, তা সঠিক হয়নি। এ রকম না করা উচিত"। মক্কাবাসিরা বলল হে ওসমান! আমাদের জাতীয় পর্যায়ের অধিবেশনে এ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। সুতরাং পরিবর্তন করা সম্ভব নয়। অবশ্য আপনি ইচ্ছে করলে বায়তুল্লাহর তাওয়াফ করতে পারেন আমরা আপনাকে সুযোগ দিতে পারি। তিনি বলেন, তোমরা তো আমাকে কাবা দেখিয়েছ। কিন্তু আমার কাবা প্রদর্শনকারী তো হুদায়বিয়াতে অবস্থান করছেন। সে অন্তর কোথায় পাব যে, তাঁকে বাদ দিয়ে বায়তুল্লাহর তাওয়াফ করব? আল্লামা ইবনে

তাইমিয়া বলেন, মক্কাবাসীরা উত্তেজিত হয়ে পড়ল যে আমাদের পেশকৃত প্রস্তাব ওসমান প্রত্যাখ্যান করল? মক্কাবাসীরা হযরত ওসমানকে (রাঃ) নজর বন্দী করার সিদ্ধান্ত গ্রহন করল। ওসমান তো মুহাম্মদ (সাঃ) কে বাদ দিয়ে বায়তুল্লাহর তওয়াফ ও করছেনা আমরা একটু ওসমান নিহত হয়েছে বলে সংবাদটা ছড়িয়ে দিই। তখনই আমরা বুঝতে পারব যে, মুহাম্মদের অনুসারীদের মধ্যে ওসমানের কতমূল্য ও কত গুরুত্ব আছে। এবার বিষয়টি একজন মুসলমানের রক্তের মূল্য আদায়ের পর্যায়ে এসে দাঁড়িয়েছে। প্রিয়নবী (সাঃ) ওসমান (রাঃ) এর হত্যার সংবাদ শুনেই একটি গাছের তলায় বসে গেছেন। তিনি সাহাবীদের থেকে চরম অঙ্গীকার নিচ্ছিলেন। অথচ এ যাত্রায় সাহাবীগণের যুদ্ধ করার কোনই ইচ্ছা ছিলনা শুধুমাত্র একেকজনের কাছে একখানা করে তরবারী ছিল যা তাদের সাথে সবসময়ই থাকে।

যখন শপথ অনুষ্ঠান চলছিল,নীচে হুজুর (রাঃ) এর পবিত্র হাত মোবারক, মাঝখানে ১৪ শত ছাহাবায়ে কেরামের পবিত্র হাত, তখন আল্লাহ বলেন- "আল্লাহর হাত তাদের হাতের উপর রয়েছে।" (ফাত্‌হ্‌-১০)

আল্লাহর হাত তাঁদের হাতের উপর। অপরদিকে তাঁদের ভাগ্য নির্ধারিত হচ্ছিল। আল্লাহর পক্ষ থেকে আদেশ হয়, হে জিবরাঈল! এখনই গিয়ে আমার হাবীবকে সুসংবাদ জানিয়ে দাওঃ "আল্লাহ মুমিনদের প্রতি সন্তুষ্ট হলেন যখন তারা বৃক্ষের নীচে আপনার হাতে জিহাদের বায়আত গ্রহন করল। আল্লাহ অবগত ছিলেন যা তাদের অন্তরে ছিল। আমরণ যুদ্ধ করার অঙ্গীকার ব্যক্ত করল।" আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্টি প্রকাশ করার সাথে সাথে ওয়াদা করলেন "বিজয় লাভের সকল দ্বার তাদের জন্য উন্মুক্ত করে দেয়া হবে।"

সুপ্রিয় পাঠকবন্ধু আমার! একটু চিন্তা করুন বাস্তবেই কি ওসমান (রাঃ) কে হত্যা করা হয়েছিল? নিশ্চয়ই না, তবুও কেন হুজুর (সাঃ) সহ ১৪শত জলিলুর কদর সাহাবায়ে কেরাম জিহাদের বায়আত নিলেন? তিনি কি পারতেন না ১৪শত সাহাবী নিয়ে লংমার্চ করে কুফফারে মক্কাকে (জাতীয় সংসদ) সম্পূর্ণরূপে ঘেরাও করতে? সেরূপ জ্ঞান কি হুজুর (সাঃ)এর ছিলনা? অবশ্যই ছিল। কিন্তু তিনি জানতেন সেভাবে মুসলমানের রক্তের বদলা নেয়া যাবেনা, মজলুমের মুক্তির সুরাহা হবেনা। তার জন্য শুধু মাত্র কিতাল ফি সাবীলিল্লাহর কর্মসূচী নিতে হবে।

আর একটু চিন্তা করুন, আল্লাহ হচ্ছেন আ'লিমুল গায়েব, তবুও কেন তিনি নবী কে জীবরাইলের মাধ্যমে জানিয়ে দিলেন না যে, হে নবী আপনার ওসমানকে হত্যা করা হয়নি, কেন আপনি অনর্থক জিহাদের বায়আত নিচ্ছেন। "তা না বলে বরং আল্লাহ বলেছেন "আল্লাহ মুমিনদের প্রতি সন্তুষ্ট হলেন যখন তারা বৃক্ষের নিচে

আপনার হাতে শপথ গ্রহণ করল। আল্লাহ্ অবগত ছিলেন যা তাদের অন্তরে ছিল। অতঃপর তিনি তাদের প্রতি প্রশান্তি নাযিল করলেন এবং তাদেরকে আসন্ন বিজয় পুরস্কার দিলেন।"

এর দ্বারা প্রমাণিত হয় তথাকথিত গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে আন্দোলন নয়, শুধুমাত্র কিতাল ফি সাবীলিল্লাহ্‌র আন্দোলনই অর্থাৎ জিহাদী আন্দোলনই মানবতার মুক্তি ও শান্তির পথ। এবার আপনি বুঝে নিন সাহাবায়ে কেরামের প্রতি আল্লাহর সন্তুষ্টি কোথায় কখন ঘোষণা করা হল। সাহাবীগণ বলেছেন, প্রিয় নবী (সাঃ) (হুদায়বিয়ায়) বৃক্ষের নীচে বসে যখন হযরত ওসমান (রাঃ) এর রক্তের বদলা নেয়ার উদ্দেশ্যে আমাদের প্রত্যেকের নিকট থেকে মৃত্যু ও জিহাদের ময়দান থেকে পিঠ টান দিয়ে পেছনে ফিরে না থাকার বায়আত গ্রহণ করছিলেন তখন তিনি বলেছিলেন- "আজ আল্লাহর জমীনে তোমাদের চেয়ে উত্তম কোন লোক নেই এবং আকাশেও তোমাদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ ও উচুঁ মর্যাদার দাবীদার কেউ নেই।"

**(২৫) বল- আমি শহীদ হওয়ার পর আমার পূর্ববর্তী গুনাহ সমুহ ক্ষমা করা হবে কি?**

"যারা আল্লাহর পথে শহীদ হয় আল্লাহ কখনই তাঁদের কর্ম বিনস্ট করবেনা। তিনি তাঁদেরকে পথপ্রদর্শন করবেন এবং তাঁদের অবস্থা ভাল করবেন। অতঃপর তিনি তাদেরকে জান্নাতে দাখিল করবেন, যা তাঁদেরকে জানিয়ে দিয়েছেন। " (মুহাম্মদ ৪,৫,৬)।

যারা কুফরী ও শিরক করে এবং অপরকে ইসলাম থেকে বিরত রাখে আল্লাহ তাআলা তাদের সৎ কর্মসমূহ বিনষ্ট করে দিবেন; এর বিপরীতে আলোচ্য আয়াতে বলা হয়েছে যে, যাঁরা আল্লাহর পথে শহীদ হয় তাঁদের কর্ম বিনষ্ট হয় না; বরং অনেক সময় তাঁদের সৎকর্ম তাঁদের গোনাহর কাফফারা হয়ে যায়।

এতে শহীদের জন্য দু'টি নেয়ামতের কথা বর্ণিত হয়েছে। (১) আল্লাহ তাঁকে হেদায়েত করবেন (২) তাঁর সমস্ত অবস্থা ভাল করে দিবেন। অবস্থা-বলে দুনিয়া ও আখেরাত উভয় জাহানের অবস্থা বোঝানো হয়েছে। দুনিয়াতে এই যে, যে ব্যক্তি জিহাদে যোগদান করে, সে শহীদ না হলেও শহীদের সওয়াবের অধিকারী হবে। আখেরাতে এই যে, সে কবরের আযাব থেকে এবং হাশরের পেরেশানী থেকে মুক্তিলাভ করবে। কিছু লোকের হক তার জিম্মায় থেকে গেলে আল্লাহ তাআলা হকদারকে তাঁর প্রতি রাযী করিয়ে তাকে মুক্ত করে দেবেন। শহীদ হওয়ার পর হেদায়েত করার অর্থ এই যে, তাঁদেরকে জান্নাতে পৌছিয়ে দেবেন।

এ হচ্ছে তৃতীয় নেয়ামত। অর্থাৎ তাঁদেরকে কেবল জান্নাতেই পৌছানো হবেনা বরং তাঁদের অন্তরে আপনা আপনি জান্নাতে নিজ নিজ স্থান ও জান্নাতের নেয়ামত

তথা হুর ও গেলমানের এমন পরিচয় সৃষ্টি হয়ে যাবে, যেমন তাঁরা চিরকাল তাঁদের মধ্যে বসবাস করত এবং তাঁদের সাথে পরিচিত ছিল। কারণ, জান্নাত ছিল একটা নতুন জগত। সেখানে নিজ নিজ স্থান খুঁজে নেয়ার মধ্যেও সেখানকার বস্তু সমূহের সাথে সম্পর্ক স্থাপিত হওয়ার মধ্যে সময় লাগত এবং বেশ কিছু কাল পর্যন্ত অপরিচিতির অনুভূতির কারণে মন অশান্ত থাকত। হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করেন; রাসূল (সাঃ) বলেনঃ সেই আল্লাহর কসম যিনি আমাকে সত্য ধর্মসহ প্রেরণ করেছেন তোমরা দুনিয়াতে যেমন তোমাদের স্ত্রী ও গৃহকে চিন তার চাইতেও বেশী জান্নাতে তোমাদের স্থান ও স্ত্রীদেরকে চিনবে এবং তাঁদের সাথে অন্তরঙ্গ হবে। (সংঃ তাফঃ মাআরিফুল কোরআন ১২৫৭ পৃঃ)।

"জমউল ফাওয়ায়েদ" গ্রন্থে উল্লেখিত হয়েছে (ইমাম বোখারী ও কিতাবুল জিহাদে প্রায় অনুরূপ রেওয়ায়েত উদ্বৃত করেছেন) যুদ্ধের ময়দান থেকে কোন এক কাফের সামনে বেরিয়ে এসে চ্যালেঞ্জ ঘোষণা করে, কে আছ আমার মোকাবিলায় যুদ্ধ করার সাহস রাখ? এই চ্যালেঞ্জ শুনে এক মুসলমান তার সাথে দ্বৈবথ যুদ্ধে অবতীর্ণ হন, কাফির বিজয়ী হয়। অপর এক মুসলমান তার মোকাবিলায় অবতীর্ণ হন, তিনিও শহীদ হয়ে যান এরপর লোকটি বিজয়ের উত্তেজনায় ঘোড়া দৌড়িয়ে প্রিয় নবী (সাঃ) এর নিকট উপস্থিত হয়ে জিজ্ঞেস করে আপনি কেন আমাদের সাথে যুদ্ধ করছেন? প্রিয় নবী (সাঃ) তাকে বললেন- "আমি একজন্য লড়ছি যেন সমস্ত পৃথিবীতে আল্লাহর বিধান বিজয়ী হয়, সকল মানুষ যেন আল্লাহর অনুগত বান্দায় পরিণত হয়"। লোকটি বলল এতো চমৎকার কথা, আমিও কি পারব আপনার দলভূক্ত হতে? প্রিয় নবী (সাঃ) বললেন হ্যাঁ, তুমিও ইসলাম গ্রহণ করতে পার। লোকটি তৎক্ষণাৎ কলেমা পড়ল এবং মুসলমান হয়ে গেল। অতপর বিলম্ব না করে সে মুসলিম পক্ষে যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়ে প্রচন্ড বেগে কাফিরবাহিনীর উপর আক্রমণ শুরু করে এবং এক পর্যায়ে শহীদ হয়ে যায়। আল্লাহর প্রিয় নবী (সাঃ) তাকে ময়দান থেকে তুলে আনেন এবং কাফির পক্ষে যুদ্ধ চলাকালীন সময়ে তার আঘাতে যে দু'সাহাবী শহীদ হয়েছিলেন তাদের সাথেই তাকে দাফন করেন। আর বলেন, কেয়ামতের দিন আল্লাহপক এদের মনে পরস্পরের জন্য ভালবাসা সৃষ্টি করে দেবেন। অথচ ঐব্যক্তির এক ওয়াক্ত নামায পড়ারও সুযোগ ঘটেনি। একটি সেজদা দেয়ার সৌভাগ্যও তাঁর হয়নি।

কিন্তু জিহাদে অবতীর্ণ হয়ে শাহাদত বরণের ফলে তার জান্নাতবাসী হওয়ার ব্যাপারে কারও কোন সন্দেহ আছে কি? তাই আমি আহবান করব ওহে ব্যাভিচারী,

ব্যাভিচার পরিত্যাগ করে জিহাদের ময়দানের এসে দুশমনের মুকাবিলায় ক্লাসিনকোব হাতে নাও। আর যুদ্ধ করতে করতে যদি তুমি নিহত হও, তবে আল্লাহ্ তোমার সমস্ত গুনাহ ক্ষমা করে দেবেন। ওহে মদ্যপায়ী, মদের বোতল হাত হতে ছুড়ে ফেলে ক্লাসিনকোভ হাতে নাও, আর শত্রু মোকাবিলায় ঝাপিয়ে পড়। যদি তুমি এতে মৃত্যু বরণ কর, তবে আল্লাহ্ তোমার সকল গুনাহ ক্ষমা করে দিবেন। ওহে জুয়াড়ি, জুয়ার তাস ছিড়ে ফেলে টাইম বোমা হাতে নাও আর শত্রু ঘাটিতে নিক্ষেপ কর, এভাবে যুদ্ধের ময়দানে লড়তে লড়তে যদি তুমি মারা যাও তবে আল্লাহ তোমার সকল গুনাহ ক্ষমা করে দেবেন। কেননা তোমার একটি জীবনের বিনিময়ে লক্ষ কোটি মজলুমের জীবনের মুক্তি লাভ হবে আর সে কারণেই জাহান্নামের কঠিন আযাব হতে আল্লাহ্ তোমাকে মুক্ত করবেন।

প্রিয় পাঠক বন্ধু আমার! এখনও যদি আপনার মন এতে শায় না দেয়, তবে কোরআনের নিম্নোক্ত আয়াত দু'টি ভালভাবে অনুধাবন করুন।

"এবং যারা লড়াই করেছে ও মৃত্যুবরণ করেছে, অবশ্যই আমি তাদের উপর থেকে অকল্যাণকে অপসারিত করব এবং তাঁদেরকে প্রবিষ্ট করাব জান্নাতে যার তলদেশে নহর সমূহ প্রবাহিত, এই হল বিনিময় আল্লাহর পক্ষ থেকে। আর আল্লাহর নিকট রয়েছে উত্তম বিনিময়"। (ইমরান-১৯৫)

"বস্তুতঃ যারা আল্লাহর রাহে লড়াই করে অতঃপর মৃত্যুবরণ করে কিংবা বিজয় অর্জন করে, আমি তাদেরকে মহাপূণ্য দান করব।" (নিসা-৭৪)

হুজুরপাক (সাঃ) এরশাদ করেন, "শহীদের প্রথম রক্তের ফোঁটা মাটিতে পড়া মাত্র তাঁর সকল পাপ ক্ষমা করে দেওয়া হয়।" (কনজুল উম্মাল ৪র্থ খনড ২১০ পৃঃ)

**(২৬) বল- আমি শহীদ হলে বেহেস্তে যাওয়ার নিশ্চয়তা কি?**

"তিনি তোমাদের পাপরাশি ক্ষমা করবেন এবং এমন জান্নাতে দাখিল করাবেন যার পাদদেশে নদী প্রবাহিত এবং স্থায়ী জান্নাতের উত্তম বাস গৃহে, এটা মহাসাফল্য"। (আছ ছফ-১২)।

তাদের সুসংবাদ দিচ্ছেন তাদের পরওয়ারদেগার স্বীয় দয়া ও সন্তোষের এবং জান্নাতের, সেখানে আছে তাদের জন্য স্থায়ী শান্তি। তথায় তারা থাকবে চিরদিন, নিঃসন্দেহে আল্লাহর কাছে আছে মহা পুরস্কার। (তাওবাহ-২১,২২)

এখানে আল্লাহ তা'আলা শহীদের জন্য পরকালীন নেয়ামতের ওয়াদা করেছেন। আর আল্লাহর ওয়াদা চিরন্তন সত্য এবং তিনি অবশ্যই ওয়াদা পূরণকারী।

হযরত আবু দারদা (রাঃ) রাসূলুল্লাহ (সাঃ) থেকে বর্ণা করেনঃ শুহাদায়ে কেরামের জন্য আল্লাহ বাব্বুল আলমিনের নিকট ছয়টি অসাধারণ পুরস্কার রয়েছে।

(১) আল্লাহ রাব্বুল আলামিন শহীদের ছোট বড় সকল গুনাহ ক্ষমা করে দিবেন। (২) কবরের ভয়াবহ আযাব থেকে শহীদকে পরিপূর্ণ নিরাপত্তা দান করবেন এবং জান্নাতে তাঁকে এত উচ্চ মর্যাদা দান করবেন যা দেখে সবাই বিস্মিত হবে। (৩) কেয়ামতের ভয়াবহ ধ্বংলীলা থেকে শহীদকে হেফাজত করবেন। (৪) কাল কেয়ামতের দিন হাশরের ময়দানে আল্লাহ বাব্বুল আলামীন শহীদের মাথায় এমন এক মহামূল্যবান মুকুট পরিয়ে দিবেন যাতে প্রতিস্থাপিত একেকটি মনি মুক্তা সমগ্র পৃথিবী ও এর যাবতীয় ধন-সম্পদের চেয়েও অনেক অনেক বেশী মূল্যবান হবে। (৫) একেকজন শহীদকে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বেহেস্তের অপরূপ সুন্দরী বাহাত্তরটি হুরকে স্ত্রী হিসেবে দান করবেন (৬) এবং পরিবার পরিজনদের মধ্যে হতে জাহান্নাম অবধারিত এমন সত্তরজনকে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন শহীদের বিশেষ সুপারিশে জান্নাত দান করবেন। (তিরমিযী)

হযরত জাবের (রাঃ) থেকে বর্ণিত জনৈক সাহাবী রাসুলুল্লাহ (সাঃ) কে জিজ্ঞেস করলেন ইয়া রাসুলুল্লাহ! আমি নিহত হলে কোথায় থাকব? রাসুলুল্লাহ (সাঃ) উত্তর দিলেন "জান্নাতে" অতঃপর তিনি হাতের খেজুর গুলো ফেলে দিয়ে যুদ্ধ করতে করতে শহীদ হয়ে গেলেন।" (মুসলিম)

একটু চিন্তা করুন, শহীদ ব্যক্তি জান্নাতের কত নিকটতম, তাঁর আর জান্নাতের মাঝে শাহাদত ছাড়া অন্য কোন বাঁধা নেই। হাদীসটি থেকে অনুমান করা যায় যে, সাহাবায়েকেরামগণ নবী করীমের (সাঃ) কথার প্রতি কতখানি বিশ্বাস রাখতেন এবং আমলের প্রতি কত উৎসাহী ছিলেন। দুঃখের বিষয় আজ মুজাহিদগণ আমাদের সামনে বয়ানে কত আয়াত আর হাদীস পেশ করতেছেন তবুও আমরা জিহাদের ময়দানে আসছিনা। এটা আমাদের বদ নসীব।

**(২৭) বল- এমন একটি ব্যবসার কথা যা আমাকে জাহান্নামের কঠিন শাস্তি হতে মুক্তি দেবে?**

"হে মুমিনগণ, আমি কি তোমাদেরকে এমন একটি বাণিজ্যের সন্ধান দেব, যা তোমাদেরকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি থেকে মুক্তি দেবে? তা এই যে, তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করবে এবং আল্লাহর পথে নিজেদের ধন সম্পদ ও জীবন দ্বারা জিহাদ করবে। এটাই তোমাদের জন্য উত্তম যদি তোমরা বুঝ"। (আছছফ-১০, ১১)

এখানে আল্লাহ তায়ালা ঈমান এবং ধন সম্পদ ও জীবন পন করে জিহাদ করাকে বাণিজ্য আখ্যা দিয়েছেন। কারণ বাণিজ্যে যেমন কিছু ধন সম্পদ ও শ্রম ব্যয় করার বিনিময়ে মুনাফা অর্জিত হয় তেমনি ঈমান সহকারে আল্লাহর পথে জান

ও মাল ব্যয় করার বিনিময়ে আল্লাহর সন্তুষ্টিও পরকালের চিরস্থায়ী নেয়ামত অর্জিত হয়। অতঃপর বলা হচ্ছে, যে এ বাণিজ্য অবলম্বন করবে, আল্লাহ তাআলা তার গুনাহ মাফ করবেন এবং জান্নাতে উৎকৃষ্ট বাসগৃহ দান করবেন। এসব বাসগৃহে সর্বপ্রকার আরাম ও বিলাস ব্যসনের সরঞ্জাম থাকবে।

পাঠক বন্ধু আমার! এই ব্যবসার পলিসিটা ভালভাবে বুঝার চেষ্টা করুন। যদি বুঝে শুনে গ্রহণ করতে পারেন তো উত্তম সফলতা পাওয়া যাবে। প্রথমে পুরাটা বুঝে আসবেনা তবুও এ পথ অবলম্বন করুন। কেননা নামাজ-রোজার সকল মাসআলা তো একসাথে বুঝে আসেনা তবুও ফরজ পালনার্থে উহা আদায় করতে হয়। তাই এই ফরজ জিহাদও বুঝে আসুক আর নাই আসুক আদায় করতেই হবে, অন্যথায় আল্লাহর শাস্তি অবধারিত।

**(২৮) বল- এই মুক্তির নিশ্চয়তা কতটুকু?**

নিশ্চয়তা সম্পর্কে এতক্ষণ বুঝানোর পরও কি আপনার বুঝে আসছেনা? তাহলে খোলা মনে নিয়ে কোরআনের নিম্নোক্ত আয়াত পর্যবেক্ষণ করুন।

"আল্লাহ ক্রয় করে নিয়েছেন মুসলমানদের থেকে তাঁদের জান ও মাল এই মূল্যে যে, তাঁদের জন্য রয়েছে জান্নাত। তাঁরা যুদ্ধ করে আল্লাহর রাহে; অতঃপর মারে ও মরে। তাওরাত, ইঞ্জিল ও কোরআনে তিনি এসত্য প্রতিশ্রুতিতে অবিচল। আর এমন কে আছে যে আল্লাহর চেয়ে অধিক প্রতিশ্রুতি রক্ষাকারী? সুতরাং তোমরা আনন্দিত হও সে লেন-দেনের উপর, যা তোমরা করেছ তাঁর সাথে। আর এ হল মহা সাফল্য। (তাওবাহ-১১১)

আমরা জানি ক্রয়-বিক্রয়ের বেলায় টাকা পয়সা ও মাল-সওদাই বিনিময় হয়। অর্থাৎ জান্নাতকে মূল্য হিসেবে টাকা ধরা হয়েছে আর জান-মালকে সওদা হিসেবে ধরা হয়েছে। আল্লাহ তাআলার ভাষ্যমতে এখানে ক্রেতা হলেন তিনি স্বয়ং আর বিক্রেতা হল আপন জান-মাল উৎসর্গকারী মুজাহিদ। কেননা আল্লাহ তো এরূপ বলেননি যে, মুসলমানরা নিজ জীবন ও সম্পদের বিনিময়ে জান্নাত ক্রয় করেছে। বরং বলা হয়েছে, আল্লাহ মু'মিনের জীবন ও সম্পদকে জান্নাতের বিনিময়ে ক্রয় করে নিয়েছেন।

একটু চিন্তা করুন জান্নাতের সঠিক মূল্য সম্পর্কে একমাত্র আল্লাহ ছাড়া কেউই জানেন না। আর তার চেয়ে অধিক মূল্যবান বুঝাচ্ছেন তাঁর কাছে মুমিনের জান মালের সঠিক মূল্য। আমাদের জীবন কি মূল্যহীন ও খেলার বস্তু? কখনো না। তবে কেন আমরা আজ আভ্যন্তরীন কোন্দলের মাধ্যমে একজন আরেকজনের জীবন ধ্বংস করছি। দলীয় নীতি প্রতিষ্ঠার জন্য কেন আমরা রাজনৈতিক সংঘর্ষে লিপ্ত হয়ে

আপন মূল্যবান জান-মাল নষ্ট করে যাচ্ছি? অথচ আমাদের উচিত ছিল এই হাদীসের উপর আমল করা। "আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, নবী (সাঃ) বলেছেন, বেহেস্তের একধনু পরিমান (তথা সামান্য) অংশ সমগ্র বিশ্বের ধন সম্পদ অপেক্ষা অধিক উত্তম। নবী (সাঃ) আরও বলেছেন, দিনের প্রথমার্ধের বা শেষার্ধের কোন সময়ে আল্লাহর রাস্তায় বের হওয়া সমগ্র বিশ্বের ধন সম্পদ অপেক্ষা উত্তম।" (বোখারী)

ওহে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে ইসলাম কায়েমের আন্দোলনের কর্মীরা, কুফরী মতবাদ পরিত্যাগ করে কোরআনী মতবাদ তথা আল্লাহর দেয়া মতবাদের উপর নিজের জান-মাল কোরবানী করার আন্দোলনের দিকে এসো। আল জিহাদের ক্লাসিন কোভের ছায়ার নীচে আশ্রয় নাও তবেই ইসলাম কায়েম সম্ভব হবে ও বেহেস্তে যাওয়া সহজ হবে। আমার নবী সাহিবুস সাইফ (সাঃ) তো তাই করেছিলেন এবং বলেছিলেন, "জেনে রেখো বেহেশত তরবারীর ছায়ার নীচে" (বোখারী শরীফ ১ম খন্ড ৩৯৫ পৃঃ)

এই ক্রয়-বিক্রয় কি ঘরে বসে বা কোন বাজারে হবে? আলোচ্য আয়াতের পরবর্তী অংশে আল্লাহ সে কথাই বলেছেনঃ "তারা যুদ্ধ করে আল্লাহর রাহে, অতঃপর মারে ও মরে।" তাই আমাদের জীবন বিক্রয়ের সঠিক মূল্য পেতে হলে যুদ্ধের ময়দানে (বাজারে)অবতীর্ণ হতে হবে। কখনো আমরা তাদের হত্যা করব, আবার কখনো আমাদেরকে তারা হত্যা করবে।

উপরোক্ত হাদীসের ব্যাখ্যায় মুহাদ্দিসগণ বলেন ভয়াবহ সংঘাতময় কঠিন যুদ্ধে শরীক হওয়ার কথা এ হাদীস দ্বারা বুঝানো হয়েছে। যখন পরস্পরের তরবারীর আঘাতের ঝন ঝন শব্দে পরিবেশ মুখরিত হয়ে উঠে, যখন শুধু একে অপরকে কুপোকাত করার চেষ্ঠায় সকল শক্তি ও কৌশল নিয়োজিত করে, তখন সত্যই এক লোভনীয় ও নান্দনিক দৃশ্যের সৃষ্টি হয়ে থাকে। আর তখনই জান্নাত ও জাহান্নামের দরজা গুলো খুলে দেওয়া হয়। যে মুজাহিদ যুদ্ধে শাহাদাত বরণ করে তখনই তাঁকে সোজা জান্নাতে নিয়ে যাওয়া হয়। কোন কাফের নিহত হলে কঠিন জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হয়।

হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত, নবী করিম (সাঃ) ইরশাদ করেছেন, "কাফের ও তার হত্যাকারী (মুজাহিদ) কখনো জাহান্নামে একত্র হবে না।" (মুসলিম) হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত, নবী করিম (সাঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তির দু'পা খোদার রাহের ধুলিতে আচ্ছন্ন হয়েছে, তাকে দোযখের আগুন স্পর্শ করবে

না। (বোখারী)।

হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত, নবী করিম (সাঃ) ইরশাদ করেছেন, "আল্লাহ তায়ালা একথার জামানত দিয়েছেন যে, যে ব্যক্তি তাঁর রাস্তায় বের হবে এবং তাঁকে শুধু আমার প্রতি ঈমান আর রাসূলের প্রতি বিশ্বাসই এ রাস্তায় বের করবে তাকে আমি সওয়াব ও গনীমতের মাল সহকারে বাড়িতে ফিরিয়ে আনব অথবা তাকে শহীদ করে বেহেস্তে প্রবেশ করাব। (বোখারী ও মুসলিম)

পাঠক বন্ধু আমার! এবার বলুন এর চেয়ে আরও বেশী কি নিশ্চয়তা থাকতে পারে? আমার বিশ্বাস এর চেয়ে আর কোন নিশ্চয়তা পৃথিবীর বুকে নেই। এই হচ্ছে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি পূর্ণ ঈমান রাখার স্বীকারোক্তি। এও যার বিশ্বাস হবে না তার ঈমান থাকবেনা। ইহা বিশ্বাস করার পর যদি আমল না করে তবে বুঝতে হবে তা দূর্বল থেকে দূর্বলতর ঈমান। অতএব, ঈমানকে পাকাপোক্ত করার জন্য এখনই ছুটে আসুন জিহাদের ময়দানে।

**(২৯) বল- রনাঙ্গনে যদি আমরা নিহত হই তবে লোকে আমাদেরকে কি মৃত বলবে?**

"যারা আল্লাহর রাস্তায় নিহত হয়, তাদের মৃত বলোনা বরং তারা জীবিত, কিন্তু তোমরা তা বুঝনা।" (বাক্বারা-১৫৪)

ইসলামী রেওয়ায়েত মোতাবেক প্রত্যেক মৃতব্যক্তি আলমে বরযখে বিশেষ ধরনের এক হায়াত বা জীবন প্রাপ্ত হয় এবং সে জীবনে সংশ্লিষ্ট কবরের আযাব বা সওয়াব অনুভব করে থাকে। এই জীবন প্রাপ্তির ব্যাপারে মুমিন-কাফের এবং পূর্ণবান ও গোনাহগারের কোন পার্থক্য নেই। তবে বরযখের এ জীবনের বিভিন্ন স্তর রয়েছে। এক স্তরে সর্বশ্রেণীর লোকই সমানভাবে শরীক। কিন্তু বিশেষ এক স্তর নবী রাসূল এবং বিশেষ নেক্কার বান্দাদের জন্য নির্ধারিত। এ স্তরেও অবশ্য বিশেষ পার্থক্য এবং পরস্পরের বৈশিষ্ট রয়েছে।

যে সব লোক আল্লাহর রাস্তায় নিহত হন তাদেরকে শহীদ বলা হয়। সাধারণ ভাবে অবশ্য তাঁদের মৃত বলাও জায়েজ। তবে তাঁদের মৃত্যুকে অন্যান্যদের মৃত্যুর সমপর্যায়ভূক্ত মনে করতে নিষেধ করা হয়েছে। কেননা মৃত্যুর পর প্রত্যেকেই বরযখের জীনব লাভ করে থাকে এবং সে জীবনের পুরস্কার অথবা শাস্তি ভোগ করতে থাকে। কিন্তু শহীদগণকে সে জীবনে অন্যান্য মৃতের তুলনায় তাঁদের বেশি অনুভূতি দেয়া হয়। শহীদের এ জীবনানুভূতি অনেক ক্ষেত্রে তাঁদের জড়দেহেও এসে পৌঁছে থাকে। অনেক সময় তাঁদের হাড়-মা'সের দেহ পর্যন্ত মাটিতে বিনষ্ট হয়না, জীবিত মানুষের দেহের মতই অবিকৃত থাকতে দেখা যায়। হাদীসের বর্ণনা এবং বহু প্রত্যক্ষ সাক্ষী

এর যথার্থতা প্রমাণিত হয়েছে। এ কারণেই শহীদকে জীবিত বলা হয়েছে। হুজুর (সাঃ) বলেন- "মাটি শহীদের লাশে বিকৃতি ঘটাতে পারেনা।"

বরযখের অবস্থা মানুষের সাধারণ পঞ্চেন্দ্রিয়ের মাধ্যমে অনুভব করা যায়না বিধায়- তোমরা বুঝতে পারবেনা বলা হযেছে।

" আর যারা আল্লাহর রাহে নিহত হয়, তাদের কে তুমি কখনো মৃত মনে করোনা। বরং তারা নিজেদের পালনকর্তার নিকট জীবিত ও জীবিকাপ্রাপ্ত। আল্লাহ নিজের অনুগ্রহ থেকে যা দান করেছেন তার প্রেক্ষিতে তাঁরা আনন্দ উদযাপন করছে। আর যাঁরা এখনো তাঁদের কাছে এসে পৌঁছেনি তাঁদের পেছনে তাঁদের জন্য আনন্দ প্রকাশ করে। কারণ তাঁদের কোন ভয়-ভীতিও নেই এবং কোন চিন্তা-ভাবনাও নেই। (ইমরান-১৬৯-১৭০)

যুদ্ধে যে সব মুজাহিদ শহীদ হয়ে থাকে আল্লাহ তাঁদেরকে এমন সব প্রতিদান দিয়ে থাকেন, যার প্রতি অন্যান্যদের ঈর্ষা হওয়া উচিত। উপরোক্ত আয়াতে আল্লাহ তা'আলা শহীদের বিশেষ মর্যাদার বিবরণ দিয়েছেন এছাড়া বিশুদ্ধ হাদীসেও এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা এসেছে। ইমাম কুরতুবী (রাঃ) বলেছেন, শহীদের অবস্থা ও মর্যাদার মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। কাজেই হাদীসের রেওয়ায়েতে যে সবদিক বর্ণিত হয়েছে, তাও বিভিন্ন অবস্থারই প্রেক্ষিতে বলা হয়েছে। ১৭০ নং আয়াতে শহীদের প্রথম বৈশিষ্ট্য বলা হয়েছে তাঁদের অনন্ত জীবন লাভকে। অতঃপর দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য হল আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে তাঁদের রিযিক প্রাপ্তি। তৃতীয় বৈশিষ্ট্য হল তাঁরা সদাসর্বক্ষণ আনন্দমুখর থাকবেন। চতুর্থ বৈশিষ্ট্য হল তাঁরা যে সব উত্তরসূরীকে পৃথিবীতে রেখে গিয়েছিলেন, তাঁদের ব্যাপারে তাঁদের এ আনন্দ অনুভূত হয় যে, তারাও পৃথিবীতে থেকে সৎকাজ ও জিহাদে নিয়োজিত রয়েছে। ফলে তারাও এখানে এসে ঐসব নেয়ামত এবং উচ্চ মর্যাদা লাভ করবেন।

এ আয়াতের যে শানে নুযুল ইমাম আবু দাউদ (রঃ) বিশুদ্ধ সনদের মাধ্যমে হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেছেন, তা হল এই, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ) কে বললেন যে, ওহুদের ঘটনায় যখন তোমাদের ভাইয়েরা শহীদ হন তখন আল্লাহ তাঁদের আত্মাগুলোকে সবুজ পাখীর পালকের ভেতর স্থাপন করে মুক্ত করে দেন। তাঁরা জান্নাতের ঝর্ণা ও উদ্যানসমূহ থেকে নিজেদের রিযিক আহরণ করেন এবং অতঃপর তারা সেই আলোকধারায় ফিরে আসেন, যা তাঁর জন্য আল্লাহর আরশের নীচে টাঙ্গিয়ে দেয়া হয়েছে, যখন তারা নিজেদের জন্য আনন্দ ও শান্তিময় এ জীবন প্রত্যক্ষ করলেন, তখন বললেন আমাদের আপনজনরা পৃথিবীতে আমাদের মৃত্যুতে শোকার্ত। আমাদের অবস্থা সম্পর্কে কি

কেউ তাদের জানিয়ে দিতে পারে, "যাতে তারা আমাদের জন্য দুঃখ না করে এবং তারাও যাতে জিহাদে (অংশগ্রহণের) চেষ্টা করে। তখন আল্লাহ বললেন, "তোমাদের এ সংবাদ তাদেরকে পৌছে দিচ্ছি" এরই প্রেক্ষিতে ১৭০ নং আয়াত নাযিল হয়। বুঝা গেল শহীদকে মৃত না বলতে তো বলছে, উপরন্তু মৃত ধারণাও করতে বারণ করা হয়েছে।

**(৩০) বল- আমরা জিহাদ না করলে কি জিহাদ বন্ধ হয়ে যাবে?**

"যদি বের না হও, তবে আল্লাহ তোমাদের মর্মান্তিক আযাব দেবেন এবং অপর জাতিকে তোমাদের স্থলাভিষিক্ত করবেন। তোমরা তাঁর কোন ক্ষতি করতে পারবেনা। আর আল্লাহ সর্ব বিষয়ে শক্তিমান।" (তাওবাহ-৩৯)

আয়াতে অলস ও নিষ্ক্রিয় লোকদের ব্যাধিও তার প্রতিকারের উপায় উল্লেখ করে সর্বশেষ ফয়সালা জানিয়ে দেওয়া হয় "তোমরা জিহাদে বের না হলে আল্লাহ তোমাদের মর্মান্তিক শাস্তি দেবেন। এ প্রসঙ্গে হুজুর (সাঃ) বলেন, "যদি তোমরা জেহাদ থেকে বিরত থাক তা হলে আল্লাহ তোমাদের উপর লাঞ্ছনা গঞ্জনা চাপিয়ে দেবেন।" তোমাদের স্থলে অন্য জাতির উত্থান ঘটাবেন, আর দ্বীনের আমল থেকে বিরত হয়ে তোমরা আল্লাহ ও রাসূলের বিন্দুমাত্র ক্ষতি করতে পারবেনা। কেননা, আল্লাহ সর্ববিষয়ে শক্তিমান।

আমরা জিহাদ না করলেও জিহাদ বন্ধ হবে না, দাজ্জালকে খতম না করা পর্যন্ত জিহাদ চলবে, জালেম বাদশাহর জুলুমের কারণে ও আদেল বাদশাহর ইনসাফের কারণেও জিহাদ বন্ধ হবে না। অন্য হাদিসে আসছে জাবের ইবনে সামুরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, নবী করিম (সাঃ) বলেছেন, "এদ্বীন সর্বদা প্রতিষ্ঠিত থাকবে। মুসলমানদের এক জামাত এর সংরক্ষণের জন্য কিয়ামত পর্যন্ত যুদ্ধরত থাকবে।" (মুসলিম শরীফ)

**(৩১) বল- ঐ জাতির বৈশিষ্ট্য কি হবে?**

"হে মুমিনগণ! তোমাদের মধ্যে যে কেউ স্বীয় ধর্ম থেকে ফিরে যাবে, তাহলে অচিরেই আল্লাহ এমন এক সম্প্রদায় সৃষ্টি করবেন, যাদেরকে তিনি ভালবাসবেন এবং তারা তাঁকে ভালবাসবে। তারা মুসলমানদের প্রতি বিনয়-নম্র হবে এবং কাফেরদের প্রতি কঠোর হবে। তারা আল্লাহর পথে জিহাদ করবে। এবং কোন তিরস্কারকারীর তিরস্কারে ভীত হবেনা। এটি আল্লাহর অনুগ্রহ তিনি যাকে ইচ্ছা দান করেন। আল্লাহ প্রাচুর্য দানকারী মহাজ্ঞানী। (মায়েদাহ-৫৪)।

এ আয়াতে যেখানে একথা বলা হয়েছে যে, মুসলমানরা ধর্মত্যাগী হয়ে গেলে আল্লাহ তায়ালা কোন জাতির অভ্যুত্থান ঘটাবেন, সেখানে সেই পূণ্যাত্মা জাতির

কিছু গুণাবলীও বর্ণনা করেছেন। যারা ধর্মের কাজ করে, এগুণগুলোর প্রতি তাদের লক্ষ্য রাখা উচিত। কারণ, এসবগুণের অধিকারীরা আল্লাহর দৃষ্টিতে প্রিয় ও মকবুল। তাদের প্রথম গুণঃ আল্লাহ্ তাআলা তাদেরকে ভালবাসবেন এবং তারা নিজেরাও আল্লাহ্ তাআলাকে ভালবাসবে। এখানে আর একটি আয়াত প্রনিধানযোগ্য-

"হে রাসূল, আপনি বলে দিন, যদি তোমরা আল্লাহকে ভালবাস, তবে আমাকে অনুসরণ কর। তাহলে আল্লাহ্ তাআলা তোমাদেরকে ভালবাসবেন।" (ইমরান-৩১)।

এ আয়াত থেকে জানা যাচ্ছে যে, যে ব্যক্তি আল্লাহ্ তাআলার ভালবাসা লাভ করতে চায়, তার উচিত জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে এবং প্রতিটি পদক্ষেপে রাসুলুল্লাহ (সাঃ) এর সুন্নত অনুসরণে অবিচল থাকা। এমন করলে আল্লাহ্ তাআলা তাকে ভালবাসবেন বলে ওয়াদা দিয়েছেন।

তাঁদের দ্বিতীয় গুণ হলঃ তাঁরা মুসলমানদের সামনে নম্র হবে এবং কোন ব্যাপারে মতবিরোধ হলে সত্যপন্থী হওয়া সত্ত্বেও সহজে বশ হয়ে তারা ঝগড়া ত্যাগ করবে। দ্বিতীয় গুণের সারমর্ম হল, তাঁরা হবে এমন একটি জাতি, যাঁদের ভালবাসা ও শত্রুতা নিজ সত্ত্বা ও সত্ত্বাগত অধিকারের পরিবর্তে শুধু আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল ও ধর্মের খাতিরে নিবেদিত প্রাণ হবে। এ কারণেই তাঁদের বন্দুকের নল আল্লাহ ও রাসূলের অনুগতদের দিকে নয়; বরং তাঁর শত্রু ও অবাধ্যদের দিকে নিবদ্ধ থাকবে।

তৃতীয় গুণ হল, তাঁরা সত্য ধর্মের প্রচার ও প্রসারের লক্ষ্যে জিহাদে প্রবৃত্ত হবে। এর সারমর্ম এই যে, কুফর ও ধর্ম ত্যাগের মুকাবিল করার জন্য শুধু কতিপয় প্রচলিত এবাদত এবং নম্র ও কঠোর হওয়াই যথেষ্ট নয়, বরং ধর্মকে প্রতিষ্ঠিত করার উদ্দীপনাও থাকতে হবে। এ উদ্দীপনাকে পূর্ণতা দানের জন্য চতুর্থ গুণ উল্লেখ করা হচ্ছে যে, ধর্মকে প্রতিষ্ঠিত ও সমুন্নত করার চেষ্টায় তাঁরা কোন ভর্ৎসনাকারীর ভর্ৎসনারই পরওয়া করবেনা।

বর্তমান বিশ্বে উপরোক্ত বৈশিষ্ট্যপুর্ণ মুসলমান পাওয়া যাচ্ছে আফগান তালেবানকে। পাঠক ভাই আপনি একটু আফগানিস্তান গিয়ে তাঁদের কর্মনীতি সহ বর্তমান কার্যক্রম সমূহ দেখে আসুন। অতিদ্রুত আপনার সমস্যার সমাধান পাবেন।

আয়াতের বাস্তবতা আমি এরূপ দেখতেছি যে, দ্বিতীয় আবু রেগালের রাহবারিতে মক্কা-মদীনায় ইহুদী নাছারাদের আধিপত্যের কারণে সেখানকার মুসলমানদের ঈমানী চেতনা বিলুপ্ত হয়ে তারা দ্বীন হারা হয়ে যাচ্ছে; আবার অপরদিকে আফগানিস্তানের জমিনে তৃতীয় ওমরের নেতৃত্বে ইসলামের পূনঃজাগরণ হচ্ছে। যার ইঙ্গিত হুজুর

(সাঃ) এভাবে দিয়েছেন- "আখেরি জামানায় ইসলামের পূনঃজাগরণ হবে এশিয়ার কেন্দ্র থেকে।" আফগানিস্তান হচ্ছে এশিয়া মহাদেশের কেন্দ্রবিন্দু।

অন্য হাদিসে আসছে, "আখেরী জামানায় জেরুজালেম রক্ষার জন্য যে বাহিনী তৈরী হবে তারা বের হবেন খোরাসান থেকে।" উল্লেখ্য, খোরাসান-আফগানিস্ত ানের একটি প্রদেশ।

**(৩২) বল, মুজাহিদরা দেশ ফতেহ করার পর কি করবে?**

"তারা এমন লোক যাদেরকে আমি পৃথিবীতে শক্তি সামর্থ দান করলে তারা নামায কায়েম করবে, যাকাত দেবে এবং সৎকাজে আদেশ ও অসৎ কাজে নিষেধ করবে। প্রত্যেক কর্মের পরিণাম আল্লাহর এখতিয়ার ভূক্ত।" (হজ্ব-৪১)

এ আয়াত মদীনায় হিজরতের অব্যবহিত পরে তখন অবতীর্ণ হয়, যখন মুসলমানদের কোথাও রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা ছিলনা। কিন্তু আল্লাহ তাআলা তাঁদের সম্পর্কে পূর্বেই বলে দিলেন যে, তারা রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা লাভ করলে তা ধর্মের উল্লেখিত গুরুত্বপূর্ণ কার্য সম্পাদনে ব্যয় করবে। এ কারণেই হযরত ওসমান গণী (রাঃ) বলেনঃ আল্লাহ তাআলার এই এরশাদ কর্ম অস্তিত্ব লাভ করার পূর্বেই কর্মীদের গুণ ও প্রশংসা কীর্তন করার শামিল।" এরপর আল্লাহ তাআলার এই নিশ্চিত সংবাদ দুনিয়াতে বাস্তব রূপ লাভ করেছে।

আল্লাহ তাআলা সর্বপ্রথম তাঁদেরকেই পৃথিবীতে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দান করলেন এবং কোরআনের ভবিষ্যদ্বাণীর অনুরূপ তাঁদের কর্ম ও কীর্তি বিশ্ববাসীকে দেখিয়ে দিয়েছেন যে, তাঁরা তাদের ক্ষমতা এ কাজেই ব্যবহার করেন। তাঁরা নামায প্রতিষ্ঠিত করেন, যাকাত ব্যবস্থা চালু করেন, সৎকাজের প্রবর্তন করেন এবং মন্দ কাজের পথরুদ্ধ করেন। একারণেই আলেমগণ বলেনঃ এই আয়াত সাক্ষ্য দেয় যে, খোলাফায়ে রাশেদীন সবাই এই সুসংবাদের যোগ্য ছিলেন এবং তাদের আগমনে যে রাষ্ট্রব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিল, তা সত্য, বিশুদ্ধ এবং আল্লাহর ইচ্ছা, সন্তুষ্টি ও আগাম সংবাদের অনুরূপ ছিল। এ হচ্ছে আলোচ্য আয়াতের শানে নুযুলের ঘটনা ভিত্তিক দিক। কিন্তু বলা বাহুল্য কোরআনের ভাষা ব্যাপক হলে তা কোন বিশেষ ঘটনার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকেনা; বরং নির্দেশ ও ব্যাপক হয়ে থাকে। এ কারণেই তাফসীরবিদ যাহহাক (রাহঃ) বলেনঃ এই আয়াতে তাঁদের জন্য নির্দেশ রয়েছে; যাদেরকে আল্লাহ তাআলা রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় আসীন করেন। ক্ষমতাসীন থাকাকালে তাঁদের এমন সব কর্ম আঞ্জাম দেয়া উচিত, যেগুলো খোলাফায়ে রাশেদীন তাঁদের যামানায় আঞ্জাম দিয়েছিলেন। (তাফসীরে মাআরিফুল কোরআন ৯০৪ পৃঃ)।

আজ প্রায় দেড় হাজার বছর অতিবাহিত হওয়ার পরও শুধুমাত্র কিতাল ফী

সাবিলিল্লাহর মাধ্যমে খোলাফায়ে রাশেদীনের অনুরূপ রাষ্ট্র কায়েম করেছেন আফগানিস্তানে তালেবানগণ। এর বিপরীতে বিশ্বের সবখানে জালেম ও কাফিরদের শয়তানী হুকুমত প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। দীপ্ত কণ্ঠে আজ বাংলাদেশ সরকার (আওয়ামী লীগ) কে জালিম সরকার বললে অত্যেক্তি হবেনা। কেননা; আল্লাহ বলেন -"যারা আল্লাহ প্রেরিত বিধান অনুযায়ী ফায়সালা করেনা, তারা জালেম।" (মায়েদাহ-৪৫)।

তাই আমি আহবান করব, হে প্রিয় পাঠক বন্ধু, আমার আল্লাহর যমিনে কোরআনের বিধান ক্বায়েম হওয়ার দরুন আফগানিস্তানে যে শান্তির হিমেল হাওয়া বইতেছে তা উপভোগ করার জন্যে একবার গিয়ে ঘুরে আসুন। তৃতীয় ওমরের (মোল্লা ওমর মুজাহিদ) প্রতিষ্ঠিত খেলাফতের নমুনা দেখে আসুন। যেখানে, চুরি, ডাকাতি, খুন-রাহাজানি, ছিনতাই-হাইজ্যাক, মদ-জুয়া, সুদ-ঘুষ, জেনা-ব্যভিচার, মারা-মারি, গালা-গালি বলতে কিছুই নেই। এ যেন বেহেস্তরূপী দুনিয়া। আজ যারা তালেবানের বিরোধীতা করে তারা শিয়া, রাফেজি, খারেজি, ইহুদী, খৃষ্টান, মুশরিক, মুনাফেক ও ফাসেক এবং আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত বহির্ভূত গোমরাহ দল। ইহুদী-নাছারাদের বার্তা মাধ্যম সমূহেই এঁদের (তালেবান) বিরুদ্ধে অপপ্রচার শোনা যায়। যেরূপ অপপ্রচার খোলাফায়ে রাশেদীন সহ সকল সাহাবায়ে কেরামের বিরুদ্ধে মুনাফেক চক্র ছড়িয়ে ছিল।

**(৩৩) বল- পৃথিবীতে ইনসাফ প্রতিষ্ঠার জন্য আল্লাহ তাআলা কি নাযিল করেছেন?**

"আমি আমার রাসূলগণকে সুস্পষ্ট নিদর্শন সহ প্রেরণ করেছি এবং তাঁদের সাথে অবতীর্ণ করেছি কিতাব ও ন্যায়নীতি, যাতে মানুষ ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করে। আর আমি নাযিল করেছি লৌহ, যাতে আছে প্রচন্ড রণশক্তি এবং মানুষের বহুবিধ উপকার। এটা এজন্য যে, আল্লাহ জেনে নিবেন কে না দেখে তাঁকে ও তাঁর রাসূলগণকে সাহায্য করে। আল্লাহ শক্তিধর, পরাক্রমশালী"। (হাদীদ-২৫)

আয়াতে কিতাব নাযিল হওয়া এবং ফেরেস্তার মাধ্যমে পয়গম্বর পর্যন্ত পৌঁছা সুবিবেচিত কিন্তু মীযান নাযিল করার অর্থ কি? এ সম্পর্কে তফসীরে রুহুল-মাআনী, মাযহারী ইত্যাদিতে বলা হয়েছে যে, মীযান নাযিল করা মানে দাঁড়িপাল্লার ব্যবহার ও ন্যায় বিচার সম্পর্কিত বিধানাবলী নাযিল করা। কুরতুবী বলেনঃ প্রকৃতপক্ষে কিতাবই নাযিল করা হয়েছে, কিন্তু এর সাথে দাঁড়িপাল্লা স্থাপন ও আবিস্কারকে সংযুক্ত করে দেওয়া হয়েছে। আরবদের বাকপদ্ধতিতে এর নজীর বিদ্যমান আছে।

কিতাব ও মীযানের পর লৌহ নাযিল করার কথা বলা হয়েছে। এখানেও নাযিল করার মানে সৃষ্টি করার কথা বলা হয়েছে। কোরআনের এক আয়াতে চতুষ্পদ জন্তুদের বেলায়ও নাযিল করা শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। অথচ চতুষ্পদ জন্তু

আসমান থেকে নাযিল হয়না- পৃথিবীতে জন্ম লাভ করে। সেখানেও সৃষ্টি করার অর্থ বোঝানো হয়েছে। তবে সৃষ্টি করাকে নাযিল করা শব্দে ব্যক্ত করার মধ্যে ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, সৃষ্টির বহুপূর্বেই লওহেমাহফুযে লিখিত ছিল। এদিক দিয়ে দুনিয়ার সব কিছুই আসমান থেকে অবতীর্ণ।

আয়াতে লৌহ নাযিল করার দু'টি রহস্য উল্লেখ করা হয়েছে। (১) এর ফলে শত্রুদের মনে ভীতি সঞ্চার হয় এবং এর সাহায্যে অবাধ্যদেরকে খোদায়ী বিধান ও ন্যায়নীতি পালনে বাধ্য করা যায়। (২) এতে আল্লাহ তাআলা মানুষের জন্য বহুবিধ কল্যাণ নিহিত রেখেছেন। এখানে আরও একটি প্রণিধানযোগ্য বিষয় এই যে, আলোচ্য আয়াতে পয়গম্বর ও কিতাব প্রেরণ এবং ন্যায়নীতির দাঁড়িপাল্লা সৃষ্টি ও ব্যবহারের আসল লক্ষ্য বর্ণনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে- মানুষ যাতে ইনসাফের উপর প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়। এরপর লৌহ সৃষ্টি করার কথাও উল্লেখ করা হয়েছে। এর লক্ষ্যও প্রকৃতপক্ষে ন্যায় ও সুবিচার প্রতিষ্ঠা করা। কেননা, পয়গাম্বরগণ ও আসমানী কিতাব সমূহ ন্যায় ও সুবিচার প্রতিষ্ঠা করার সুস্পষ্ট প্রমাণাদি দেন এবং যারা সুবিচার প্রতিষ্ঠা করে না তাদেরকে পরকালের শাস্তির ভয় দেখান। মীযান ইনসাফের সীমা ব্যক্ত করে। কিন্তু যারা অবাধ্য ও হঠকারী, যারা কোন প্রমাণ মানেনা এবং ন্যায় নীতি অনুযায়ী কাজ করতে সম্মত হয় না। তাদেরকে স্বাধীন ছেড়ে দেওয়া হলে দুনিয়াতে ন্যায় ও ইনসাফ কায়েম করা সুদূরপরাহত। তাদেরকে বশে আনা লৌহ ও তরবারির কাজ, যা শাসকবর্গ অবশেষে বেগতিক হয়ে ব্যবহার করে। (তাফ: মাআরিফুল কোরআন ১৩৩৯-১৩৪০ পৃঃ)

**(৩৪) বল- জিহাদের ময়দানে আমরা কিভাবে নামাজ আদায় করব?**

যখন আপনি তাদের মাঝে থাকেন, অতঃপর নামাযে দাঁড়ান, তখন যেন এক দল দাঁড়ায় আপনার সাথে এবং তারা যেন স্বীয় অস্ত্র সাথে নেয়। অতঃপর যখন তারা সেজদা সম্পন্ন করে, তখন আপনার কাছ থেকে যেন সরে যায় এবং অন্য দল যেন আসে যারা নামাজ পড়েনি। অতঃপর তারা যেন আপনার সাথে নামাজ পড়ে এবং আত্মরক্ষার হাতিয়ার সাথে নেয়। কাফেররা চায় যে, তোমরা কোনরূপে অসতর্ক থাক, যাতে তারা একযোগে তোমাদেরকে আক্রমণ করে বসে। যদি বৃষ্টির কারণে তোমাদের কষ্ট হয় অথবা তোমরা অসুস্থ হও, তবে স্বীয় অস্ত্র পরিত্যাগ করায় তোমাদের কোন গোনাহ নেই এবং সাথে নিয়ে যাও তোমাদের আত্মরক্ষার অস্ত্র। নিশ্চয় আল্লাহ কাফেরদের জন্যে অপমানকর শাস্তি প্রস্তুত করে রেখেছেন। (নিসা-১০২-১০৩)

আয়াতে বলা হয়েছে, (আপনি যখন তাদের মধ্যে থাকেন), এতে এরূপ মনে

করার অবকাশ নেই যে, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর তিরোধানের পর এখন 'সালাতুল খওফ' এর বিধান নেই। কেননা, তখনকার অবস্থানুযায়ী আয়াতে এ শর্ত বর্ণিত হয়েছে। নবী বিদ্যমান থাকলে ওযর ব্যতিত অন্য কেউ নামাযে ইমাম হতে পারেনা।

রাসুলুল্লাহ (সাঃ) এরপর এখন যে ইমাম হবেন, তিনিই তাঁর স্থলাভিষিক্ত হবেন এবং 'সালাতুল–খওফ' পড়াবেন। সব ফেকাহবিদদের মতে সালাতুল খওফের বিধান এখনও অব্যাহত রয়েছে, রহিত হয়নি।

সুফীদের মনের সংশয় দূর করে আল্লাহ জিহাদকালীন নামাযের নিয়ম ঘোষণা করেছেন। আরও বিস্তারিত জানার জন্য হাদীস খুলে দেখুন। পাঠক বন্ধুকে আমি আহবান করব, আসুন জিহাদের ময়দানে এসে তা প্রেক্টিক্যালী শিখুন। দেখবেন যখন চতুর্পাশ থেকে গোলাবারুদ আসতেছে আর এমন সময় মুজাহিদ নামাযে দন্ডায়মান অবস্থায় বলতেছেন "সকল প্রশংসা রব্বে কায়েনাতের জন্যে।" এভাবে আরো কত গুণ কির্তন ও যিকির। এবার আপনিই বলুন এই মুজাহিদের চাইতে বড় সুফী আর কে হতে পারে?

**(৩৫) বল- কেন আমাদেরকে শ্রেষ্ঠ উম্মত বলা হয়েছে?**

"তোমরাই হলে সর্বোত্তম উম্মত, মানবজাতির কল্যাণের জন্যেই তোমাদের উদ্ভব ঘটানো হয়েছে। তোমরা সৎকাজের আদেশ দান করবে ও অন্যায় কাজে বাধা দেবে এবং আল্লাহর প্রতি ইমান আনবে।" (ইমরান-১১০)

এখানে প্রশ্ন জাগে ঈমান গ্রহণ, সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজ থেকে মানুষকে বারণ করার দায়িত্ব পূর্ববর্তী উম্মতগণ নিষ্ঠার সাথে পালন করেছিলেন। যদি তা'ই হয়, তবে বর্তমান উম্মতগন পূর্ববর্তী উম্মতগণের চেয়ে শ্রেষ্ঠ হল কিরূপে? ইমাম কাফফাল শাশী (রহঃ) এর যথার্থ জবাব দিয়েছেন, যা ইমার রাযী তাঁর বিখ্যাত তাফসীর গ্রন্থ "তাফসীরুল কবীর"- এ উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেছেনঃ

(১) সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজের নিষেধ এর নিম্নস্তর হল মন ও মুখ দিয়ে বারণ করা।

(২), সর্বোচ্চ স্তর হল, কিতাল বা যুদ্ধের মাধ্যমে সকল অন্যায় ও অপরাধ সমূলে বিদূরীত করা। তিনি তাঁর এ ব্যাখ্যার স্বপক্ষে তাফসীর শাস্ত্রের জনক ইবনে আব্বাস (রাঃ) এর অভিমত উদ্বৃত করেন যে, তিনি আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেছেন- "তোমাদেরকে আদেশ করা হচ্ছে যে, তোমরা এক আল্লাহর ইবাদত কর, আর যা তিনি নাযিল করেছেন তা স্বীকার ও পালন কর এবং যে তা পালন করবেনা তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর।"

অতএব অন্য উম্মতের চেয়ে এ উম্মতের বৈশিষ্ট্য ও শ্রেষ্ঠত্বের প্রমাণ হল, "আমরু বিল মারুফ ওয়ানাহি আনিল মুনকারের সর্বোচ্চ স্তর যুদ্ধের মাধ্যমে আল্লাহর হুকুম পালন করা। অর্থাৎ এ উম্মত বাতিলের মোকাবিলায় যুদ্ধ করে, তাই এরা অন্য উম্মতের চেয়ে শ্রেষ্ঠ।"

পাকিস্তানের মুফতীয়ে আজম মুফতী শফী (রহঃ) তাঁর বিখ্যাত তাফসীর গ্রন্থ মা'রিফুল কোরআনের মধ্যেও এ অভিমতকে সর্বাপেক্ষা গ্রহণযোগ্য বলে ব্যক্ত করেছেন। তিনি বলেছেন, পূর্ববর্তী উম্মতগণকে ও আমরু বিল মা'রুফ ওয়া নাহি আনিল মুনকারের আদেশ দেওয়া হয়েছিল; কিন্তু তাদের কথা কেউ শুনত কেই উপেক্ষা করত। অন্যায়কারীদের প্রতিহত করার মত কঠিন দায়িত্ব পালন থেকে তারা বঞ্চিত ছিল। তাই এ উম্মত তাদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ হওয়ার কারণ হল, তারা আমরু বিল মা'রুফ ওয়া নাহি আনিল মুনকারের দায়িত্ব পালন করবে এবং যারা আল্লাহর হুকুম পালন করবেনা তাদের মোকাবিলায় যুদ্ধে অবতীর্ণ হবে। অর্থাৎ বর্তমান উম্মত দাওয়াতের সাথে সাথে জিহাদের দায়িত্ব ও পালন করবে, তাই তারা সকল উম্মতের চেয়ে সেরা উম্মত। (মারিফুল কোরআন ২ খ: ৩০ পৃঃ)
একটু মনোযোগী হোন, প্রথমে বুঝতে হবে আমার বিল মা'রুফ কি? নাহী আনিল মুন্‌কার কি? "আমর" হল এমন একটি "আদেশ" যার পিঁছনে শক্তি আছে; অর্থাৎ এটা কর-করতে হবে, না করলে শাস্তি। এখানে শরিয়তে অবশ্যকর্তব্য কর্ম যা আছে তা সবই এর মধ্যে অন্তর্ভূক্ত। "নাহী" হল এমন একটি "নিষেধাজ্ঞা" যার পিঁছনে শক্তি আছে; অর্থাৎ এটা করোনা,করতে পারবে না, করলে শাস্তি। এখানে শরিয়তে নিষিদ্ধ কর্ম,যা আছে তা সবই এর মধ্যে অন্তর্ভূক্ত।
কোরআন আমাদেরকে এ কথারই নির্দেশ করে। আল্লাহর প্রত্যেক আদেশ-নিষেধ এরকমইতো। অনুরোধকে-আদেশ বললে ভুল হবে, অর্থাৎ "Application" কে কেউ অর্ডার "Ordar" বললে ভুল হবে।

উল্লেখ্য যে, একথা স্পষ্ট বুঝা গেল, এ উম্মতের উত্তম উম্মত হওয়ার একমাত্র কারণ জিহাদ ও যুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়া, উপরন্তু মুসলিম জীবনের সর্বাপেক্ষা উত্তম ও মর্যাদাপূর্ণ কাজ হল যুদ্ধ করা। সাহাবীগণের প্রতি আল্লাহ তা'আলা সন্তুষ্টি ও রেযা-মন্দির সনদ দিয়েছেন জিহাদ ও যুদ্ধের জন্য আমৃত্যু বায়আত গ্রহণ করার প্রেক্ষিতে; সে কথা পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে।

এ আয়াতের দৃষ্টিকোণে আমরা দেখতে পাই বর্তমানে আফগান তালেবানগণই শ্রেষ্ঠ উম্মত। অতএব আসুন আমরা তাঁদের সাথে মিলিত হয়ে শ্রেষ্ঠ উম্মতের কাতারে দাঁড়াই, তবেই আমরা আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভে সক্ষম হব ইন্‌শাল্লাহ।

**(৩৬) বল- জিহাদ না করলে কি আল্লাহ আমাদেরকে শাস্তি দিবেন?**

"হে ঈমানদারগণ, তোমাদের কি হল, যখন আল্লাহর পথে বের হওয়ার জন্যে তোমাদের বলা হয়, তখন মাটি জড়িয়ে ধর, তোমরা কি আখেরাতের পরিবর্তে দুনিয়ার জীবনে পরিতুষ্ট হয়ে গেলে? অথচ আখেরাতের তুলনায় দুনিয়ার জীবনের উপকরণ অতি অল্প। যদি বের না হও তবে আল্লাহ তোমাদের মর্মন্তুদ আযাব দেবেন।" (তাওবাহ-৩৮,৩৯)

অলস মুসলমানদের অলসতা প্রতিকারের উপায় এ আয়াতে বর্ণিত হয়েছে। কেননা দ্বীনের ব্যাপারে সকল আলস্য, নিস্ক্রিয়তা ও সকল অপরাধ এবং গুনাহের মূলে রয়েছে দুনিয়া প্রীতি ও আখেরাতের প্রতি উদাসীনতা। হাদীস শরীফে আছে "দুনিয়ার মোহ সকল গোনাহের মূল।" সে জন্য আয়াতে বলা হয়েছে- "হে ঈমানদারগণ, তোমাদের কি হল, আল্লাহর পথে বের হওয়ার জন্য বলা হলে তোমরা মাটি জড়িয়ে ধর (জিহাদে যেতে চাও না)। আখেরাতের পরিবর্তে দুনিয়ার জীবন নিয়েই কি পরিতুষ্ট হয়ে গেলে।"

রোগ নির্ণয়ের পর তার প্রতিকার দেয়া সত্ত্বেও যারা সেদিকে অগ্রসর হবে না তাদের জন্য শাস্তির বিধান করে বলা হয়েছে- "যদি তোমরা বের না হও, তবে আল্লাহ তোমাদের মর্মন্তুদ আযাব দেবেন।"

এ প্রসঙ্গে নবীউসসাইফ (সাঃ) বলেছেন- "যখন তোমরা জিহাদ পরিত্যাগ করবে, তখন আল্লাহ পাক তোমাদের লাঞ্চিত করবেন।" (কানযুল উম্মাল-২৮২ পৃঃ ৪র্থ খঃ)

হে মু'মিন- মুসলমান ভাইরা আমার, আজ একমাত্র জিহাদ পরিত্যাগ করার কারণেই আমরা লাঞ্চিত ও অপমানিত হচ্ছি এবং আল্লাহর গযবে নিপতিত হচ্ছি সর্বক্ষণ। তাই জিহাদের মত গুরুত্বপূর্ণ ফরিজা আদায় করতে ময়দানে ছুটে আসুন। আমি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বাণী সত্য দেখছি। আপনারা কেন তা উপলব্ধি করতে পারছেন না। যাঁরা এ জিহাদের মাধ্যমে কোরআনের বিধান প্রতিষ্ঠা করেছেন এবং যাঁদের শহীদী রক্তে আজ আফগানিস্তানে কোরআনের বিধান প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, তাঁরা আজ কতইনা শান্তি উপভোগ করছেন। শহীদ কমান্ডার আব্দুর রহমান ফারুকী (রহঃ) আজ জান্নাতের হুরদের নিয়ে আনন্দোৎসব করতেছেন আর এদিকে একজন মাত্র মর্দে মুজাহিদ উসামা বিন লাদিন এর ভয়ে আমেরিকা পর্যন্ত ভীত সন্ত্রস্ত। আমিরুল মুমেনিন মোল্লা মোহাম্মদ ওমরের নেতৃত্বে প্রতিষ্ঠিত খেলাফত আ'লা মিন হাজিন নুবুয়াহ আফগানিস্তানের জমিনে শান্তির হিমেল হাওয়া বইতেছে।

**(৩৭) বল- আমাদের এ অবনতির মূল কারণ কি?**

"আর ব্যয় কর আল্লাহর পথে, তবে নিজের জীবনকে ধ্বংসের সম্মুখীন করোনা। আর মানুষের প্রতি অনুগ্রহ কর। আল্লাহ্ অনুগ্রহকারীদের ভাল বাসেন। (বাক্বারা-১৯৫)

এ আয়াতে স্বীয় অর্থসম্পদ থেকে প্রয়োজন মত ব্যয় করা মুসলমানদের প্রতি ফরজ করা হয়েছে। এ আয়াত থেকে ফেকাহ্ শাস্ত্রবিদগণ এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে, মুসলমানদের উপর ফরয যাকাত ব্যতিত আরও এমন কিছু দায় দায়িত্ব ও ব্যয় খাত রয়েছে যেগুলো ফরজ। কিন্তু সেগুলো স্থায়ী কোন খাত নয় বা সেগুলোর জন্যে কোন নির্ধারিত নেসাব বা পরিমাণও নেই। বরং যখন যতটুকু প্রয়োজন তখন ততটুকু খরচ করা প্রত্যেক মুসলমানের উপর ফরজ। আর যদি প্রয়োজন না হয় তবে কিছুই ফরয নয়। জিহাদে অর্থব্যয়ও এ পর্যায়ভূক্ত। অতঃপর বলা হচ্ছে- "এবং স্বহস্তে নিজেকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দিওনা।" এখন কথা হলো যে, "ধ্বংসের মুখে নিক্ষেপ করা" বলতে এক্ষেত্রে কি বুঝানো হয়েছে? এ প্রসঙ্গে কোরআন মজিদের ব্যাখ্যাদাতাগণের অভিমত বিভিন্ন প্রকার। ইমাম জাস্সাস ও ইমাম রাযী (রহঃ) বলেছেন, আয়াতের ব্যাখ্যায় বর্ণিত বিভিন্ন উক্তির মাঝে কোন বিরোধ নেই, প্রত্যেকটি উক্তি গৃহীত হতে পারে। হযরত আবু আইয়ুব আনছারী (রাঃ) বলেন, এ আয়াত আমাদের সম্পর্কেই নাযিল হয়েছে; আমরা এর ব্যাখ্যা উত্তমরূপেই জানি। কথা হল এই যে, আল্লাহ্ তাআলা ইসলামকে যখন বিজয়ী ও সুপ্রতিষ্ঠিত করলেন, তখন আমাদের মধ্যে আলোচনা হল যে, এখন আমাদের জিহাদের কি প্রয়োজন? এখন আমরা আপন গৃহে অবস্থান করে বিষয় সম্পত্তির দেখা-শোনা করি। এ প্রসঙ্গেই এ আয়াতটি নাযিল হল। এতে সুস্পষ্ট বুঝা যাচ্ছে যে, ধ্বংসের দ্বারা এখানে জিহাদ পরিত্যাগ করাকেই বুঝানো হয়েছে। এর দ্বারা প্রমাণিত হচ্ছে যে, জিহাদ পরিত্যাগ করা মুসলমানদের জন্য ধ্বংসেরই কারণ। সে জন্যই হযরত আবু আইয়ুব আনছারী (রাঃ) সারা জীবনই জিহাদ করে গেছেন। শেষ পর্যন্ত ইস্তাম্বুলে শহীদ হয়ে সেখানেই সমাহিত হয়েছেন। (তাফসীরে মাআরিফুল কোরআন-১০০ পৃঃ)

আজ ইসলামের দৈন্য দশা। দিকে দিকে মুসলিম মা ও শিশুদের করুন আর্তনাদে আকাশ-বাতাশ ভারি হয়ে আসছে। এখনই আমাদের উচিত তাঁদের সাহায্যে হাতে ক্লাসিনকোভ, বুকে বল, মুখে তৌহিদীগান গেয়ে জালিমের মোকাবিলায় ঝাঁপিয়ে পড়া। কেননা, নবীউসসাইফ (সাঃ) বলেছেন- "তোমরা পৃথিবীবাসীর উপর রহম কর। তবে, আকাশবাসি তোমাদের উপর রহম করবে।"

**(৩৮) বল- যারা পরিবার পরিজনের উদ্বৃতি দিয়ে জিহাদ থেকে বিরত থাকার**

**বাহানা করে, তাদের জন্য কি ফায়সালা?**

"আর জেনে রাখ, তোমাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি অকল্যাণের সম্মুখীনকারী। বস্তুতঃ আল্লাহর নিকট রয়েছে মহা সওয়াব।" (আনফাল-২৮)

"হে মুমিনগণ, তোমাদের কোন কোন স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততি তোমাদের দুশমন। অতএব, তাদের ব্যাপারে সতর্ক থাক। যদি মার্জনা কর, উপেক্ষা কর, এবং ক্ষমা কর, তবে আল্লাহ ক্ষমাশীল, করুণাময়। তোমাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি তো কেবল পরীক্ষা স্বরূপ। আর আল্লাহর কাছে রয়েছে মহা পুরস্কার। (তাগাবুন-১৪,১৫)।

"তোমাদের স্বজন-পরিজন ও সন্তান-সন্ততি কিয়ামতের দিন কোন উপকারে আসবেনা। তিনি তোমাদের মধ্যে ফয়সালা করবেন। তোমরা যা কর, আল্লাহ তা দেখেন।" (মুমতাহিনা-৩)

সূরাহ মুমতাহিনার প্রথমভাগের আয়াত সমূহ একটি বিশেষ ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে নাযিল হয়। ঘটনাটি হল এই, তাফসীরে কুরতুবীতে কুশায়রী ও সা'লাবীর বরাত দিয়ে বর্ণিত আছে যে, বদর যুদ্ধের পর মক্কা বিজয়ের পূর্বে মক্কার সারা নাম্নী নামক একজন গায়িকা প্রথমে মদীনায় আগমন করে। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) তাকে জিজ্ঞাসা করেন ঃ তুমি কি হিজরত করে মদীনায় এসেছ? সে বললঃ না। আবার জিজ্ঞাসা করেনঃ তুমি কি হিজরত করে মদীনায় এসেছ? সে এরও নেতিবাচক উত্তর দিল। রাসুলুল্লাহ (সাঃ) বললেনঃ তা হলে কি উদ্দেশ্যে আগমন করেছ? সে বললঃ আপনারা মক্কার সম্ভ্রান্ত পরিবারের লোক ছিলেন। আপনাদের মধ্য থেকে আমি জীবিকা নির্বাহ করতাম। এখন মক্কার বড় বড় সরদাররা বদর যুদ্ধে নিহত হয়েছে এবং আপনারা এখানে চলে এসেছেন। ফলে আমার জীবিকা নির্বাহ কঠিন হয়ে গেছে। আমি ঘোর বিপদে পড়েও অভাবগ্রস্থ হয়ে আপনাদের কাছ থেকে সাহায্য গ্রহণের উদ্দেশ্যে আগমন করেছি। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন তুমি মক্কার পেশাদার গায়িকা। মক্কার সেই যুবকরা কোথায় গেল, যারা তোমার গানে মুগ্ধ হয়ে টাকা-পয়সার বৃষ্টি বর্ষণ করত? সে বললঃ বদর যুদ্ধের পর তাদের উৎসব পর্ব ও গান-বাজনার জৌলুস খতম হয়ে গেছে। এ পর্যন্ত তারা কেউ আমাকে আমন্ত্রণ জানায়নি। অতঃপর রাসুলুল্লাহ (সাঃ) আব্দুল মুত্তালিব বংশের লোকগণকে তাকে সাহায্য করার জন্যে উৎসাহ দিলেন। তাঁরা তাকে নগদ অর্থ-কড়ি, পোশাক-পরিচ্ছদ ইত্যাদি দিয়ে বিদায় দিল।

এটা তখনকার কথা, যখন মক্কার কাফেররা হোদায়বিয়ার সন্ধি চুক্তি ভঙ্গ

করেছিল এবং রাসুলুল্লাহ (সাঃ) কাফেরদের বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনার ইচ্ছায় গোপনে প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন। তাঁর আন্তরিক আকাঙ্খা ছিল যে, এই গোপন তথ্য পূর্বাহ্নে মক্কাবাসীদের কাছে ফাঁস না হোক। এদিকে সর্বপ্রথম হিজরতকারীদের মধ্যে একজন সাহাবী ছিলেন হাতেম ইবনে আবীবালতায়া (রাঃ)। তিনি ছিলেন ইয়ামেনী বংশোদ্ভুত এবং মক্কায় এসে বসবাস করেছিলেন। মক্কায় তাঁর স্বগোত্র বলতে কেউ ছিল না। মক্কায় বসবাস কালেই মুসলমান হয়ে মদীনায় হিজরত করেছিলেন। তাঁর স্ত্রী ও সন্তানগণ তখনো মক্কায় ছিল। রাসুলুল্লাহ (সাঃ) ও অনেক সাহাবীর হিজরতের পর মক্কায় বসবাসকারী মুসলমানদের উপর কাফেররা নির্যাতন চালাত এবং তাদেরকে উত্যক্ত করত। যেসব মুহাজিরের আত্মীয়-স্বজন মক্কায় ছিল, তাঁদের সন্তান-সন্ততিরা কোনরূপে নিরাপদে ছিলনা। হাতেব চিন্তা করলেন যে, তাঁর সন্তান-সন্ততিকে শত্রুর নির্যাতন থেকে বাঁচিয়ে রাখার কেউ নেই। অতএব, মক্কা বাসীদের প্রতি কিছু অনুগ্রহ প্রদর্শন করলে তারা হয়তো তাঁর সন্তানদের উপর জুলুম করবেনা। তাই গায়িকার মক্কা গমনকে তিনি একটি সুবর্ণ সুযোগ হিসেবে গ্রহণ করলেন। হাতেব স্বস্থানে নিশ্চিত বিশ্বাসী ছিলেন যে, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) কে আল্লাহ তাআলা বিজয় দান করবেন। এই তথ্য ফাঁস করে দিলে তাঁর কিংবা ইসলামের কোন ক্ষতি হবেনা। তিনি ভাবলেন, আমি যদি পত্র লিখে মক্কার কাফেরদেরকে জানিয়ে দেই যে, রাসুলুল্লাহ (সাঃ) তোমাদের বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনার ইচ্ছে রাখেন, তবে আমার ছেলে-মেয়েদের হেফাযত হয়ে যাবে। সুতরাং হাতেব এ ভুলটি করে ফেললেন এবং মক্কাবাসীদের নামে একটি পত্র লিখে গায়িকা সারার হাতে সোপর্দ করলেন। এদিকে ওহীর মাধ্যমে আল্লাহ তাআলা ব্যাপারটি রাসুলুল্লাহ (সাঃ) কে জানিয়ে দিলেন। তিনি আরও জানতে পারলেন যে, মহিলাটি এ সময়ে রওযায়ে খাক নামক স্থান পর্যন্ত পৌঁছে গেছে।

বোখারী ও মুসলিমে হযরত আলী (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন রাসুলুল্লাহ (সাঃ) আমাকে, আবু মুরসাদকে ও যুবায়র ইবনে আওয়ামকে আদেশ দিলেন, অশ্বে আরোহণ করে সেই মহিলার পশ্চাদ্ধাবন কর। তোমরা তাকে রওযায়ে খাকে পাবে। তার সাথে মক্কাবাসীদের হাতেব ইবনে আবী বালতায়ার পত্র আছে। তাকে পাকড়াও করে পত্রটি ফিরিয়ে নিয়ে আস। হযরত আলী (রাঃ) বলেন, আমরা নির্দেশ মত দ্রুতগতিতে তার পশ্চাদ্ধাবন করলাম। রাসুলুল্লাহ (সাঃ) যে স্থানের কথা বলেছিলেন, ঠিক সে স্থানেই আমরা তাকে উটে সওয়ার হয়ে যেতে দেখলাম এবং তাকে পাকড়াও করলাম। আমরা বললাম পত্রটি বের কর। সে বলল; আমার কাছে কারো কোন পত্র নেই। আমরা তার উটকে বসিয়ে দিলাম। এরপর তালাশ করে

কোন চিঠি পেলাম না। আমরা মনে মনে বললামঃ রাসুলুল্লাহ (সাঃ) এর সংবাদ ভ্রান্ত হতে পারে না। নিশ্চয়ই সে পত্রটি কোথাও গোপন করেছে। এবার আমরা তাকে বললাম, হয় পত্র বের কর, না হয় আমরা তোমাকে বিবস্ত্র করে দিব।

অগত্যা সে নিরুপায় হয়ে পায়জামার ভেতর থেকে পত্র বের করে দিল। আমরা পত্র নিয়ে রাসুলুল্লাহ (সাঃ) এর কাছে চলে এলাম। হযরত ওমর (রাঃ) ঘটনা শোনে মাত্রই ক্রোধে অগ্নিশর্মা হয়ে রাসুলুল্লাহ (সাঃ) এর কাছে আরজ করলেন, এই ব্যক্তি আল্লাহ, তাঁর রাসুল ও সকল মুসলমানের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। সে আমাদের গোপন তথ্য কাফেরদের কাছে লিখে পাঠিয়েছে। অতএব, অনুমতি দিন আমি তার গর্দান উড়িয়ে দেব। রাসুলুল্লাহ (সাঃ) হাতেব কে ডেকে এনে জিজ্ঞাসা করলেনঃ তোমাকে এই কান্ড করতে কিসে উদ্বুদ্ধ করল? হাতেব আরজ করলেনঃ ইয়ারাসুলুল্লাহ (সাঃ) আমার ঈমানে এখনো তফাৎ হয়নি। ব্যাপার এই যে, আমি ভাবলাম, আমি যদি মক্কাবাসীদের প্রতি একটু অনুগ্রহ প্রদর্শন করি তবে তারা আমার সন্তানদের কোন ক্ষতি করবেনা। আমি ব্যতিত অন্য কোন মুহাজির এরূপ নেই যার স্বগোত্রের লোক মক্কায় বিদ্যমান নেই। তাদের স্বগ্রোত্রীয়রা তাদের পরিবার পরিজনের হেফাজত করে। রাসুলুল্লাহ (সাঃ) হাতেবের জবানবন্দী শোনে বললেন, সে সত্য বলেছে। অতএব, তার ব্যাপারে তোমরা ভাল ছাড়া মন্দ বলো না। হযরত ওমর (রাঃ) ঈমানের জোশে নিজ বাক্যের পুনারাবৃত্তি করলেন এবং তাঁকে হত্যা করার অনুমতি চাইলেন। রাসুলুল্লাহ (সাঃ) বললেন, সে কি বদর যোদ্ধাদের একজন নয়? আল্লাহ তায়ালা বদর যোদ্ধাদেরকে ক্ষমা করার ও তাঁদের জন্য জান্নাতের ঘোষণা দিয়েছেন একথা শোনে হযরত ওমর (রাঃ) অশ্রু বিগলিত করে আরজ করলেন, আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর রাসুলই আসল সত্য জানেন। কোন কোন রেওয়ায়েতে হাতেবের এই উক্তিও বর্ণিত আছে যে, আমি এ কাজ ইসলাম ও মুসলমানদের ক্ষতি করার জন্যে করিনি। কেননা, আমার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, রাসুলুল্লাহ (সাঃ)-ই বিজয়ী হবেন। মক্কাবাসীরা জেনে গেলেও তাতে কোন ক্ষতি হবেনা। (তাফসীরে মাআরিফুল কোরআন ১৩৫৮-১৩৫৯)।

আপনার প্রশ্নের উত্তরে শুধুমাত্র এই আয়াতটিই যথেষ্ট মনে করি। "কিয়ামতের দিন তোমাদের আত্মীয়তা ও তোমাদের সন্তান-সন্ততি তোমাদের কোন উপকারে আসবেনা। যে আত্মীয় ও সন্তান-সন্ততিরা ফরয পালনে বাঁধা দেয়। আল্লাহ তায়ালা সেদিন এসব সম্পর্ক ছিন্ন করে দেবেন। সন্তানরা পিতামাতার কাছ থেকে ও পিতা-মাতারা সন্তানদের কাছ থেকে পলায়ন করবে। এতে হযরত হাতেব (রাঃ) এর ওযর খন্ডন করা হয়েছে যে, যে সন্তানদের মহব্বতে তুমি একাজ করেছিলে, মনে

রেখ কিয়ামতের দিন তারা তোমার কোন উপকারে আসবেনা। আল্লাহর কাছে কোন কিছু গোপন নয়"।

হে মুমিন মুসলমান ভাইরা আমার হযরত হাতেব (রাঃ)'র তো বেহেশতের সনদ ছিল, দ্বিতীয়ত ইসলাম ও মুসলমানের ক্ষতি করা তাঁর অন্তরে ছিলনা। তারপরও এ ব্যাপারে তিনি আল্লাহ পক্ষ থেকে নিষেধাজ্ঞা পেয়েছিলেন। কিন্তু আপনাদের কাছে তো কোন সনদ নেই, তবুও কেন পরিবার পরিজনের দোহায় দিয়ে জিহাদ হতে বিমুখ থেকে ফরজ তরক করছেন? অবশ্যই একদিন মৃত্যু সুধা পান করতে হবে, কিয়ামত সংঘটিত হবে, হাশরের ময়দানে উপস্থিত হতে হবে। তার আগে একবার চিন্তা করুন আখেরাতে মুক্তির কোন নিশ্চয়তা নিয়ে যাচ্ছেন কিনা; নাকি খালি হাতে চলে যাচ্ছেন। অন্ততপক্ষে আল্লাহর সাথে সাক্ষাত করার ঠিকানা তো অবশ্যই নিয়ে যেতে হবে। আল্লাহ বলেন- "এই দিবস (কিয়ামত দিবস) সত্য। অতঃপর যার ইচ্ছা, সে তার পালনকর্তার নিকট ঠিকানা তৈরী করুক"। (আন নাবা-৩৯)

শিশা ঢালা প্রাচীরের মধ্যেও যদি লুকিয়ে থাকেন সেখানেও মৃত্যু আপনাকে গ্রাস করবে, অতএব, সেই অপমৃত্যুর চেয়ে শহীদি মৃত্যুই আপনার জন্যে উত্তম যা আপনাকে চিরমুক্তির সনদ দান করবে। এতে আপনার পরিবার-পরিজনও মুক্তি পাবে। আর দুনিয়াতে থাকতেও তারা সম্মানজনক জীবন অতিবাহিত করবে এবং পরকালে আপনার সাথে গিয়ে মিলিত হবে। এক্ষেত্রে হুজুরের একটি হাদীস উদ্বৃত করলাম যা অনুধাবন করতে পারলে উপকার হবে।

হযরত সুলায়মান ইবনে বুরায়দা (রাঃ) হতে বর্ণিত, নবী করিম (সাঃ) ইরশাদ করেছেন, " যারা যুদ্ধে অংশ নেয়নি তাদের জন্য মুজাহিদ পত্নীগনের মর্যাদা ও সম্ভ্রম আপন মায়েদের মর্যাদা ও সম্ভ্রমের সমান।" (কিতাব আসসিয়ারুল কাবীর) দেখুন স্বামী যুদ্ধে অংশ নেয়ার বরকতে ইসলাম স্ত্রীকে ইজ্জত সম্মানের এক উচ্চ শিখরে সমাসীন করেছেন। আপনিও যদি জিহাদে শরিক হন তবে আপনার স্ত্রীও সেই সম্মানের অন্তর্ভূক্ত হবেন। অন্যথায় এর বিপরীত অবস্থা পরিলক্ষিত হবে দুনিয়াতে এবং আখেরাতেও।

হাদীসে আছে- "দুনিয়ার স্ত্রী বেহেশতির জন্যে আপন হুরগণের সরদার হবেন।" কত বড় সৌভাগ্যের বিষয় মুজাহিদ পত্নীগণের জন্য।

**(৩৯) বল- যারা দুনিয়ার পরিবর্তে আখেরাতের সুখ-শান্তিকে বেশী প্রাধান্য দেয় তাদের কর্তব্য কি?**

"কাজেই আল্লাহর কাছে যারা পার্থিব জীবনকে আখেরাতের পরিবর্তে বিক্রি

করে দেয় তাদের জিহাদ করাই কর্তব্য।" (নিসা-৭৪)

প্রকৃত মুমিনই পার্থিব জীবনের পরিবর্তে আখেরাতের জীবনকে প্রাধান্য দিয়ে থাকে। যার কারণে তাঁরা তাঁদের অধিকাংশ সময় আল্লাহর ইবাদতে কাটায়। এদিকে আল্লাহ আরও এবাদতকে অবশ্য কর্তব্য করে দিয়েছেন যা তাঁর কাছে অধিক পছন্দনীয় এবং এর দ্বারাই যেন মুমিন আল্লাহর অধিক নৈকট্য হাসিল করতে সক্ষম হয়। এ এমন এবাদত যা স্বয়ং হুজুর (সাঃ) সহ সমস্ত সাহাবায়ে কেরাম, তাবেঈন, তবে-তাবেঈন, সহ যুগের সকল সিদ্ধ পুরুষগণ আদায় করেছেন। ইতিহাস তার স্বাক্ষী। এ শ্রেণীর লোকদের সাথেই আল্লাহ এরূপ ওয়াদা করেছেন যে-

"তোমাদের মধ্যে যারা বিশ্বাস স্থাপন করে ও সৎকর্ম করে, আল্লাহ তাদেরকে ওয়াদা দিয়েছেন যে, তাদেরকে অবশ্যই পৃথিবীতে শাসন কর্তৃত্ব দান করবেন। যেমন তিনি শাসন কর্তৃত্ব দান করেছেন তাদের পূর্ববর্তীদেরকে। (আন্-নূর-৫৫)। অতএব, আল্লাহ তাআলার এ চিহ্নিত এবাদতকে অবশ্যই অবশ্যই পালন করতে হবে।

**(৪০) হে কুরআন! মুনাফিকদের পরিচয় বলে দিবে কি?**

"আর তোমাদের মধ্যে এমনও কেউ কেউ রয়েছে, যারা অবশ্য বিলম্ব করবে এবং তোমাদের উপর কোন বিপদ উপস্থিত হলে বলবে, আল্লাহ আমার প্রতি অনুগ্রহ করেছেন যে, আমি তাদের সাথে যাইনি। পক্ষান্তরে তোমাদের প্রতি আল্লাহর পক্ষ থেকে কোন অনুগ্রহ আসলে তারা এমনভাবে বলতে শুরু করবে যেন তোমাদের মধ্যে এবং তাদের মধ্যে কোন মিত্রতাই ছিলনা। (বলবে) হায়, আমি যদি তাদের সাথে থাকতাম, তাহলে আমিও যে সফলতা লাভ করতাম।" (নিসা-৭২,৭৩)।

ঈমান পরীক্ষার স্থান হল জিহাদের ময়দান। আর এ জিহাদের মাধ্যমেই হুজুর (সাঃ) মুনাফিকদের চিনতে পেরেছিলেন। যখনই জিহাদের ডাক আসতো সাহাবায়ে কেরামগণ তখনই তরবারী ও সওয়ারী নিয়ে দুশমনদের মুকাবিলায় অবতীর্ণ হতেন। এদিকে মুনাফিকরা "সময়ে সরব অসময়ে নিরব" এর সুযোগ খুঁজত। যদি আল্লাহর পক্ষ থেকে কোন বিপদ এসে উপস্থিত হতো তখন তারা তামাশাচ্ছলে বলে বেড়াত আল্লাহ আমাদের প্রতি অনুগ্রহ করেছেন যে, আমরা তাদের সাথে যাইনি, নইলে আমরাও বিপদগ্রস্থ হতাম। আবার যখন আল্লাহর ইচ্ছায় সাহাবাগণ বিজয় লাভ করে গনীমত নিয়ে ফিরতেন তখন তারা গনীমতের অংশ খুঁজতো নির্লজ্জের মতো। আজ ১৪'শ বছর অতিবাহিত হওয়ার পরও সেই মুনাফেকের পদচারনা পরিলক্ষিত হচ্ছে জিহাদের ময়দানে। তারা আজ বলে বেড়াচ্ছে- "আল্লাহ আমাদের উপর

অনুগ্রহ করেছেন যে আমরা মুজাহিদ্বীনদের সাথে আরাকান জিহাদে যাইনি। যদি যেতাম তাহলে আমরাও ঐ ৪৫ জনের সাথে কারাবন্দি হয়ে যেতাম।" হে "বুয়্যুতানা আওরাহ"- এর গুষ্টিরা জেনে রাখ, তারা যদি আল্লাহর অনুগ্রহে আরাকান বিজয় করে শরয়ী বিধান কায়েম করে বসে, তবে তোমাদেরকেই প্রথম দৃষ্ঠান্তমূলক শাস্তি প্রদান করবে। যেরূপ তালেবানগণ দিয়েছিলেন নজিবুল্লাহকে। তোমাদের সম্পর্কে কোরআন আমাদেরকে স্পষ্ট সিদ্ধান্ত দিচ্ছে যে, তোমাদের সাথে যুদ্ধ করার জন্যে, তখন তোমরা কোথায় পালাবে? "মুনাফেকরা এ ব্যাপারে ভয় করে যে, মুসলমানদের উপর না এমন সূরাহ নাযিল হয়, যাতে তাদের অন্তরের গোপন বিষয় অবিহিত করা হবে। সুতরাং আপনি বলে দিন, ঠাট্টা-বিদ্রুপ করতে থাক; আল্লাহ তা অবশ্যই প্রকাশ করবেন যার ব্যাপারে তোমরা ভয় করছ। আর যদি তুমি তাদের কাছে জিজ্ঞেস কর, তবে তারা বলবে, আমরাতো কথার কথা বলছিলাম এবং কৌতুক করছিলাম। আপনি বলুন, তোমরা কি আল্লাহর সাথে, তাঁর হুকুম-আহ্‌কামের সাথে এবং তাঁর রাসূলের সাথে ঠাট্টা করছিলে? ছলনা করোনা, তোমরা যে কাফের হয়ে গেছ ঈমান প্রকাশ করার পর। তোমাদের মধ্যে কোন কোন লোককে যদি আমি ক্ষমা করে দিইও, তবে অবশ্য কিছু লোককে আযাবও দেব। কারণ, তারা ছিল পাপাচারী। মুনাফেক নর-নারী সবারই গতিবিধি একরকম; তারা মন্দের নির্দেশ করে, ভাল কথা থেকে বারণ করে এবং নিজ মুঠো বন্দ রাখে। আল্লাহকে ভুলে গেছে তারা, কাজেই তিনিও তাদের ভুলে গেছেন। নিঃসন্দেহে মুনাফেকরাই নাফরমান। ওয়াদা করেছেন আল্লাহ মুনাফেক পুরুষ ও মুনাফেক নারীদের এবং কাফেরদের জন্যে দোযখের আগুনের,তাতে তারা পড়ে থাকবে সর্বদা। সেটাই তাদের জন্য যথেষ্ট। আর আল্লাহ তাদের প্রতি অভিসম্পাত করেছেন এবং তাদের জন্য রয়েছে স্থায়ী আযাব। (সূরাহ তাওবাহ-৬৪-৩৮)

হে মুনাফেক সম্প্রদায় আল্লাহর নিকট তাওবাহ করে খাটি ঈমান গ্রহণ কর, তবেই তোমাদের ক্ষমা করা হবে।

"অতঃপর তোমাদের কি হল যে, মুনাফিকদের সম্পর্কে তোমরা দু'দল হয়ে গেলে? অথচ আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে ঘুরিয়ে দিয়েছেন তাদের মন্দ কাজের কারণে। তোমরা কি তাদেরকে পথ প্রদর্শন করতে চাও, যাদেরকে আল্লাহ পথভ্রষ্ট করেছেন? আল্লাহ যাকে পথভ্রষ্ট করেন, তুমি তার জন্যে কোন পথ পাবেনা।" (নিসা-৮৮)

যায়েদ ইবনে সাবেত (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, যখন নবী (সাঃ) ওহুদপানে যাত্রা করলেন তখন মধ্য পথ হতে তাঁর সঙ্গীয় কিছু লোক (মুনাফিক) ফিরে আসল।

তাদের সম্পর্কে সাহাবীগণের মধ্যে মতবিরোধ ঘটল। একদল বললেন, তাদের বিরুদ্ধে শত্রুর ন্যায় ব্যবস্থা অবলম্বন করা হউক। অপর দল বললেন, তাদের বিরুদ্ধে ঐরূপ ব্যবস্থাবলম্বন করা যাবেনা। (কারণ তারাতো মুসলিম দলভূক্ত) এই মত বিরোধের প্রতি কটাক্ষপাত করে কোরআনের উপরোক্ত আয়াত নাযিল হয়। একদ্ভিন্ন তাদের সম্পর্কে নবী করিম (সাঃ) বললেনঃ মদীনার অপর নাম 'তায়বাহ' (পবিত্রকারক)। সে দোষী ও অপরাধীকে বিচ্ছিন্ন করে দেয়, যেরুপ অগ্নি রৌপ্যের ময়লা বিচ্ছিন্ন করে দেয়। (বাংলা অনুবাদকৃত বোখারী ৩য় খঃ ১৫৭ পৃঃ)।

"আর যে দিন দু'দল সৈন্যের মোকাবিলা হয়েছে; সেদিন তোমাদের উপর যা আপতিত হয়েছে তা আল্লাহর হুকুমেই হয়েছে এবং তা এ জন্য যে, যাতে ঈমানদারদিগকে জানা যায়। এবং তাদেরকে যাতে সনাক্ত করা যায় যারা মুনাফিক ছিল। আর তাদেরকে বলা হয় এসো, আল্লাহর রাহে লড়াই কর কিংবা শত্রুদিগকে প্রতিহত কর। তারা বলেছিল, আমরা যদি জানতাম যে, লড়াই হবে, তাহলে অবশ্যই তোমাদের সাথে থাকতাম। সেদিন তারা ঈমানের তুলনায় কুফরীর কাছাকাছি ছিল। যা তাদের অন্তরে নেই তারা নিজের মুখে সে কথাই বলে। বস্তুতঃ-আল্লাহ ভালভাবে জানেন তারা যা কিছু গোপনে করে থাকে। ওরা হল সে সব লোক, যারা বসে থেকে নিজেদের ভাইদের সম্বন্ধে বলে, যদি তারা আমাদের কথা শুনত, তবে নিহত হতনা। তাদেরকে বলে দিন, এবার তোমাদের নিজেদের উপর থেকে মৃত্যুকে সরিয়ে দাও, যদি তোমরা সত্যবাদী হয়ে থাক।" (ইমরান-১৬৬-১৬৭-১৬৮)

"যদি আশুলাভের সম্ভাবনা থাকতো এবং যাত্রাপথও সংক্ষিপ্ত হতো, তবে তারা অবশ্যই আপনার সহযাত্রী হতো, কিন্তু তাদের নিকট যাত্রা পথ সুদীর্ঘ মনে হল। আর তারা এমনই শপথ করে বলবে, আমাদের সাধ্য থাকলে অবশ্যই তোমাদের সাথে বের হতাম, এরা নিজেরাই নিজেদের বিনষ্ট করছে, আর আল্লাহ জানেন যে, এরা মিথ্যাবাদী"। (তাওবাহ-৪২)

"আর যদি তারা বের হবার সংকল্প নিত, তবে অবশ্যই কিছু সরঞ্জাম প্রস্তুত করতো। কিন্তু তাদের উত্থান আল্লাহর পছন্দ নয়, তাই তাদের নিবৃত রাখলেন এবং বলা হল, বসা লোকদের সাথে তোমরা বসে থাক। (তাওবাহ-৪৬)

"এবং যখন মুনাফিক ও যাদের অন্তরে রোগ ছিল তারা বলছিল, আমাদেরকে প্রদত্ত আল্লাহ ও রসূলের প্রতিশ্রুতি প্রতারণা বৈ নয়। এবং যখন তাদের একদল বলেছিল হে ইয়াসরেববাসী! এটা ঠিকবার মত জায়গা নয়, তোমরা ফিরে চল। তাদেরই একদল নবীর কাছে অনুমতি প্রার্থনা করে বলেছিল, আমদের বাড়ী–ঘর খালি, অথচ সেগুলো খালি ছিলনা, পলায়ন করাই ছিল তাদের ইচ্ছা।" (আহ্যাব-

১২,১৩)

"তোমরা যখন যুদ্ধলব্দ ধন-সম্পদ সংগ্রহের জন্যে যাবে, তখন যারা পশ্চাতে থেকে গিয়েছিল, তারা বলবে, আমাদেরকেও তোমাদের সঙ্গে যেতে দাও। তারা আল্লাহর কালাম পরিবর্তন করতে চায়। বলুন, তোমরা কখনো আমাদের সঙ্গে যেতে পারবেনা। আল্লাহ্ পূর্বে থেকেই এরূপ বলে দিয়েছেন। তারা বলবেঃ বরং তোমরা আমাদের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করছ। পরন্তু তারা সামান্যই বোঝে। (ফাত্হ্-১৫)। তুমি যখন তাদের কাছে ফিরে আসবে, তখন তারা তোমাদের নিকট ছল-ছুতা নিয়ে উপস্থিত হবে; তুমি বল, ছল করোনা, আমি কখনো তোমাদের কথা শুনবনা; আমাকে আল্লাহ তা'আলা তোমাদের অবস্থা সম্পর্কে অবহিত করে দিয়েছেন। আর এখন তোমাদের কর্ম আল্লাহই দেখবেন এবং তাঁর রাসূলও। তারপর তোমরা প্রত্যাবর্তিত হবে সেই গোপন ও অগোপন বিষয়ে অবগত সত্বার নিকট। তিনি-ই তোমাদের বাতলে দেবেন যা তোমরা করছিলে। এখন তারা তোমার সামনে আল্লাহর কসম খাবে যখন তুমি তাদের কাছে ফিরে যাবে, যেন তুমি তাদের ক্ষমা করে দাও। সুতরাং তাদের ক্ষমা কর-নিঃসন্দেহে এরা অপবিত্র এবং তাদের কৃতকর্মের বদলা হিসাবে তাদের ঠিকানা হল দোযখ। তারা তোমার সামনে কসম খাবে যাতে তুমি তাদের প্রতি রাযী হয়ে যাও। অতএব, তুমি যদি রাযী হয়ে যাও তাদের প্রতি তবু আল্লাহ তা'আলা রাযী হবেন না, এ নাফরমান লোকদের প্রতি। বেদুইনরা কুফর ও মুনাফেকীতে অত্যন্ত কঠোর হয়ে থাকে এবং এরা সেসব নীতি-কানুন না শেখারই যোগ্য যা আল্লাহ তা'আলা তাঁর রাসূলের উপর নাযিল করেছেন। বস্তুতঃ আল্লাহ্ সবকিছুই জানেন এবং তিনি অত্যন্ত কুশলী। আবার কোন কোন বেদুইন এমনও রয়েছে যারা নিজেদের ব্যয় করাকে জরিমানা বলে গণ্য করে এবং তোমার উপর কোন দুর্দিন আসে কিনা সে অপেক্ষায় থাকে। তাদেরই উপর দুর্দিন আসুক। আর আল্লাহ হচ্ছেন শ্রবণকারী পরিজ্ঞাত। (সুরাহ তাওবাহ-৯৪-৯৮ এই আয়াত সমূহের তাফসীর মাআরিফুল কোরআনে দেখুন (৫৮৮ পৃঃ)

সুপ্রিয় পাঠক বন্ধু আমার, এ হচ্ছে কোরানের জবাব। বলুনতো আমরা যে সমস্ত বাহানা উপস্থাপন করি তা উপরোক্ত মুনাফিকেরই অনুরূপ বাহানা নয় কি? কোন কোন হাদীসে রয়েছে যে, একদল মুনাফিকের ব্যক্তিগত পরিচয়ও রাসুলুল্লাহ (সাঃ)কে দেয়া হয়েছিল। মুসনাদে- আহমদে ওকবা ইবনে আমরের হাদীসে আছে যে, রাসূর (সাঃ) একবার এক খোতবায় ৩৬ জন মুনাফিকের নাম বলে তাদেরকে মজলিস থেকে উঠিয়ে দেন। হাদীসে তাদের নাম গণনা করা হয়েছে। (মা'রিফুল কোরআন-১২৬১ পৃঃ)

আল্লাহ তা'আলা রাসূল (সাঃ)-কে মুনাফিকদের পরিচয় যেভাবে দিয়েছিলেন সেভাবে তিনি তা ব্যক্ত করেন, যা আবু হুরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন এভাবে- "নবী করিম (সাঃ) এরশাদ করেন, যে ব্যক্তি মারা গেল অথচ সে কখনো জিহাদে অংশ গ্রহণ করেনি আর তার অন্তরে কোন দিন জিহাদের সাধও জাগেনি, সে এক প্রকার নেফাকের উপর (মুনাফিক অবস্থায়) মারা গেল। (মুসলিম)

ওহে প্রিয় পাঠ বন্ধু আমার! আমি বলব আজ না হয় আপনি হুজুরের (সাঃ) মজলিসে অনুপস্থিত। কিন্তু হাশরের ময়দানে যখন তার সমীপে উপস্থিত হবেন তখন যদি তিনি বলেন যে, "তুমি তো কোন দিন জিহাদ কর নাই বরং জিহাদী কাফেলার প্রতি বিরুপ মন্তব্য করে বেড়াতে। তুমি মুনাফিক আমার সামনে থেকে সরে যাও"। তখন আপনি কোথায় যাবেন বলুন? মুনাফিকের স্থান জাহান্নামের সর্বনিম্নস্থলে।

অতএব, এখন আপনার কাছে মুনাফিকের পরিচয় আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সুস্পষ্ট উক্তি দ্বারা প্রমাণ হল। সুতরাং নিজের কর্তব্য কর্ম নির্ধারণ করুন।

**(৪১) বল- কতদিন পর্যন্ত আমাদেরকে জিহাদ করতে হবে?**

"আর তোমরা তাদের সাথে লড়াই কর যে পর্যন্ত না ফেতনার অবসান হয় এবং আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠিত হয়। অতঃপর যদি তারা নিবৃত হয়ে যায় তাহলে করো প্রতি কোন জবরদস্তি নেই, কিন্তু যারা জালেম (তাদের ব্যাপার আলাদা)"। (বাক্বারাহ-১৯৩)

"আর তাদের সাথে যুদ্ধ করতে থাক যতক্ষণ না ফেত্না শেষ হয়ে যায় এবং আল্লাহর সমস্ত হুকুম প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়। তারপর যদি তারা বিরত হয়ে যায়, তবে আল্লাহ তাআলা তাদের কার্যকলাপ লক্ষ্য করেন"। (আনফাল-৩৯)

বিভিন্ন তাফসীরের কিতাবে আনফালের ৩৯ নং আয়াতের বিস্তারিত ব্যাখ্যা রয়েছে। তবে এর সারমর্ম হল মুসলমানদের উপর ইসলামের শত্রুদের বিরুদ্ধে ততক্ষণ পর্যন্ত যুদ্ধ-জিহাদ অব্যাহত রাখা ওয়াজিব, যতক্ষণ না মুসলমানের উপর তাদের অত্যাচার উৎপীড়নের তথা ফেত্নার পরিসমাপ্তি ঘটে এবং যতক্ষণ না তথাকথিত সমস্ত ধর্মের উপর ইসলামের বিজয় সূচিত হয়। আর এমন অবস্থাটি কেয়ামতের নিকটবর্তী কালেই বাস্তবায়িত হবে এবং সে কারণে কেয়ামত পর্যন্ত জিহাদের হুকুম অব্যাহত থাকবে।

ইসলামের শত্রুদের বিরুদ্ধে জিহাদের পরিণতিতে দুটি অবস্থার সৃষ্টি হতে পারে। প্রথমঃ এই যে, তারা মুসলমানদের উপর অত্যাচার উৎপীড়ন থেকে বিরত

হয়ে যাবে, তা ইসলামী ভ্রাতৃত্বের অন্তর্ভূক্তির মাধ্যমেও হতে পারে কিংবা নিজ নিজ ধর্ম মতে থেকেই আনুগত্যের চুক্তি সম্পাদন করার মাধ্যমেও হতে পারে। দ্বিতীয়তঃ এতদুভয় অবস্থার কোনটি গ্রহণ না করলে অব্যাহত মুকাবিলায় স্থির থাকবে। আয়াতে এই উভয় অবস্থার হুকুমই বর্ণিত হয়েছেঃ "তারা যদি বিরত হয়ে যায়, তবে আল্লাহ তা'য়ালা তাদের কার্যকলাপ লক্ষ্য করেন।" রক্তপাত কখন হারাম ও কখন হালাল এই নির্দেশ দিয়ে বলা হয়েছে, "যে ব্যক্তি প্রাণের বিনিময়ে প্রাণ অথবা পৃথিবীতে অনর্থ সৃষ্টি কারী ছাড়া কাউকে হত্যা করে, সে যেন সব মানুষকেই হত্যা করে। এবং যে কারো জীবন রক্ষা করে সে যেন সবার জীবন রক্ষা করে"। (মায়েদা-৩২)

এ আয়াতে খুনের পরিবর্তে খুন এবং দুনিয়াতে ফেত্না ফাসাদ সৃষ্টিকারীকে হত্যা বৈধ বলা হয়েছে। এতদ্ব্যতীত হত্যা করার কোন অবকাশ নেই। এমন কি উপরোক্ত দুই কারণ ব্যতিত হত্যাকে এতবড় পাপ বলে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে যে, উহা সমস্ত মানুষকে হত্যা করার তুল্য।

অন্যত্র জিযিয়া প্রদানের উপর যুদ্ধ ও হত্যার শেষ সীমা নির্ধারণ করে আল্লাহ তা'আলা বলেন

"তাদের সহিত সেই সময় পর্যন্ত যুদ্ধ কর, যে পর্যন্ত না তারা অধীন ও প্রজারুপে গণ্য হয়ে জিযিয়া দিতে স্বীকৃত হয়"। (তাওবাহ-২৯)

এর মর্ম এই যে ইসলাম বিরুদ্ধ শক্তি জিযিয়া আদায় করে আহকামে ইসলাম জারীর প্রতি সম্মত হলে আর তাদের সহিত যুদ্ধ করা যাবে না এবং যুদ্ধের অনুমতি সীমা তখনই শেষ হয়ে পড়ে। কেননা জিযিয়া দেওয়ার দ্বারা এই সিদ্ধান্ত হল যে, ইসলামী রাষ্ট্রের মুসলিম সরকার ঐ কাফেরের জান-মালের নিরাপত্তা দানে ওয়াদাবদ্ধ। তাই এ সময় কাফেরদের হত্যাকরার উপর কঠোর ভাষায় নিষধাজ্ঞা আরোপ করে হুজুর (সাঃ) বলেন- "যে মুসলমান কোন কাফেরকে জীবনের নিরাপত্তা দেয়ার পর তাকে হত্যা করে, কিয়ামতের দিন তাকে বিশ্বাসঘাতকের ঝান্ডা দেয়া হবে।" (মেশকাত)

"তোমরা যুদ্ধ চালিয়ে যাবে যে পর্যন্ত না শত্রু পক্ষ অস্ত্র সমর্পন করে"। (মুহাম্মদ-৪)

**(৪২) বল-মুজাহিদগণ প্রচলিত গণতন্ত্রে বিশ্বাসী নয় কেন?**

"হে বনী আদম! আমি কি তোমাদেরকে বলে রাখিনি যে, শয়তানের এবাদত করো না, সে তোদের প্রকাশ্য শত্রু? এবং আমার এবাদত কর, এটাই সরল পথ। শয়তান তোমাদের অনেক দলকে পথ ভ্রষ্ট করেছে। তবুও কি তোমরা বুঝনি? (ইয়াসিন-৬০-৬১-৬২)

এ প্রসঙ্গে অত্র পুস্তিকার শুরুর দিকে আলোচনা হয়েছে যে, গণতন্ত্র একটি কুফরী মতবাদ, ইহা আব্রাহাম লিংকনের নিকট শয়তানের প্রেরিত ওহী। এর অনুসরণ করা শয়তানের এবাদতের নামান্তর। উপরন্তু এর দ্বারা ইসলাম ক্বায়েম তো দুরের কথা ইসলামের কোন উপকারই হতে পারেনা। সেরূপ হয়েছে বলে কোন প্রমাণও নেই। এখানে আলজেরিয়ার ঘটনা প্রনিধানযোগ্য। "ইসলামীক সালবেশন ফ্রন্ট" ৮৫% ভোট পেয়েও ইসলামী হুকুমত প্রতিষ্ঠা করতে পারেনি, কেননা রাতা-রাতি সকল নেতাকর্মীকে নিঃশেষ করে দেওয়া হয়েছে সেনাবাহিনীর মাধ্যমে। এখনও সেখানে তুমুল লড়াই চলছে। তাইতো আল্লাহ তাআলা বলেন, শয়তানের পদাংক অনুসরণ করোনা, কেননা সে তোমাদের চির শত্রু।

অপরপক্ষে "কিতাল ফী সাবীলিল্লাহ" আল্লাহর পক্ষ হতে হুজুর পাক (সাঃ)-এর প্রতি প্রেরিত ওহী। আর ইহাই ইসলাম ক্বায়েমের একমাত্র মাধ্যম। এর প্রকৃত প্রমাণ হল খোলাফায়ে রাশেদা সহ এর পরবর্তী অনেক জামানা। এমনকি ১৪'শ বছর অতিবাহিত হওয়ার পরও জিহাদের মাধ্যমেই ইসলামী হুকুমত প্রতিষ্ঠিত হয়েছে বর্তমান আফগানিস্তানে। তাই আল্লাহ বলেন- শুধুমাত্র আমার এবাদত কর, আমার নবীর পদাংক অনুসরণ কর এটাই সহজ সরল রাস্তা, যার শেষ প্রান্তে তুমি পাবে জান্নাত। নচেৎ তুমি পৃথিবীর সাম্প্রতিক ঘটনার প্রতি লক্ষ্য কর; আলজেরিয়ার মত রাষ্ট্রের মানুষগুলি শয়তানের পদাংক অনুসরণ করেই তো পথভ্রষ্ট হয়েছে। তাই আল্লাহ নিজেই প্রশ্ন করছেন- "শয়তান তোমাদের অনেক দলকে (আলজেরিয়ার সালভেনশন ফ্রন্ট, তুরস্কের রেফাহ্ পার্টি) পথভ্রষ্ট করেছে তবুও কি তোমরা বুঝনি? এখানে তোমার জন্য শিক্ষা রয়েছে, বুঝার চেষ্টা কর নতুবা তুমিও তাদের অন্তর্ভূক্ত হয়ে পড়বে। অতঃপর জাহান্নামই হবে তোমার সর্বশেষ ঠিকানা।

"আর যদি আপনি পৃথিবীর অধিকাংশ লোকের কথা মেনে নেন, তবে তারা আপনাকে আল্লাহর পথ থেকে বিপথগামী করে দেবে। তারা শুধু অলীক কল্পনার অনুসরণ করে এবং সম্পূর্ণ অনুমান ভিত্তিক কথা বলে থাকে।" (আন্আম-১১৬)

মাসআলাঃ "আল্লাহর নিষিদ্ধ বস্তুকে হালাল মনে করা যে শুধু পাপ তা নয়, বরং কুফরীও বটে। অনুরূপ কোন হালাল বস্তুকে হারাম সাব্যস্ত করাও কুফরী। তবে হারামকে হারাম মনে করে কেউ যদি অসতর্ক পদক্ষেপ নেয়, তবে তা কুফরী নয়; বরং তা গোনাহ ও ফাসেকী।"

"যদি তোমরা তাদের অনুসরন (আনুগত্য) কর, তোমরাও মোশরেক হয়ে যাবে। (সূরাহ আনআম-১২১)এই আয়াতের তাফসীরে হাকীমুল উম্মত মোজাদ্দেদে মিল্লাত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী (রহঃ) তাঁর "মাওয়ায়েযে থানভী"-তে

লিখেন- "কুফরী মতবাদের উপর আমল করাও কুফরী" এ প্রসঙ্গে তিনি একটি শিক্ষনীয় গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার বর্ণনা দিয়েছেন। তা'হল- মাওলনা ফাত্হ মোহাম্মদ (রহঃ) বলেন, শায়খ দাহ্হান মক্কার প্রখ্যাত আলিম ছিলেন। তিনি বলেন, মক্কায় একজন আলিম মৃত্যুবরণ করলে এক স্থানে তাকে দাফন করা হয়। কিছু দিন পর অপর এক ব্যক্তির মৃত্যু হলে তাঁর ওয়ারিশ মৃতদেহ উক্ত আলিমের কবরে দাফরন করার সিদ্ধান্ত নেয়। তৎকালে মক্কায় নিয়ম ছিল যে, তারা এক কবরে একাধিক লাশ দাফন করত। এক পর্যায়ে আলিম ব্যক্তির কবর খনন করা হলে দেখা গেল সেখানে তার লাশ নেই। তার স্থানে রাখা আছে অন্য এক রুপসী যুবতীর লাশ, তাকে আকার আকৃতিতে ইউরোপিয়ান মেয়ের মত মনে হল। ঘটনা দেখে সকলেই অবাক। বিষয়টা কারোরই বুঝে আসছেনা। ঘটনাক্রমে ইউরোপ থেকে আগত জনৈক মুসলিম ব্যক্তি উক্ত মজলিসে উপস্থিত ছিলেন। মেয়েটি দেখেই সে বলে উঠল, আমিতো তাকে চিনি। এতো ফ্রান্সের অধিবাসী এক খৃষ্টানের কন্যা। আমার নিকট আরবী পড়ত এবং গোপনে মুসলমান হয়েগিয়েছিল। একে আমি ইসলাম সম্পর্কিত কয়েকটি বইও পড়িয়েছিলাম। হঠাৎ দুরারোগ্য এক ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়ে মারা যায় এবং আমার সাথে তাদের পরিবারের যোগাযোগ বন্ধ হয়ে যায়। এতটুকু তথ্য পেয়ে জনতা বলল, এতে মেয়েটির লাশ এখানে চলে আসার কারণ না হয় বুঝলাম যে, সে একজন মুসলমান ও নেক্কার মেয়ে ছিল, কিন্তু এ কবরের আলিম লোকটির লাশ গেল কোথায়? কেউ কেউ বলল, হতে পারে তার লাশ এ মেয়েটির কবরে স্থানান্তরিত করা হয়েছে। অবশেষে জনতা উক্ত ইউরোপিয়ান পর্যটককে বলল, সফর শেষে আপনি যখন দেশে ফিরবেন, তখন এ মেয়েটির কবর খনন করে একটু দেখবেন, ওখানে আমাদের মুসলমান আলিমের লাখ আছে কিনা, আলিমের লাশ সনাক্ত করার উপায়ও তারা তাকে বলে দেয়। তারপর যথাসময়ে সে ইউরোপ চলে যায় এবং মেয়ের বাপ-মাকে ঘটনাটি শোনায়। শুনে তারা এই বলে বিস্মিত হয়ে পড়ে, এটা কি করে সম্ভব যে মেয়েকে দাফন করলাম ফ্রান্সে আর তুমি কিনা তার লাশ দেখে এলে মক্কায়। অবশেষে রহস্য উদঘাটনের জন্য সিদ্ধান্ত হলো, মেয়েটার কবর খনন করে দেখা হোক।

মেয়ের বাপ-মা সহ উৎসুক আত্মীয়-স্বজন ও জনতার উপস্থিতিতে কবর খনন করা হল। দেখা গেল সত্যি লাশ বাক্সে মেয়ের লাশ নেই তার স্থলে রাখা আছে অন্য পুরুষের ছিন্ন ভিন্ন লাশ। সেই মুসলমান আলিমের লাশ যাকে মক্কায় দাফন করা হয়েছিল।

শায়খ দাহ্হান বলেন, কিছুদিন পর পর্যটক লোকটি আমাদের কাছে সংবাদ

পাঠালেন যে, আপনাদের আলিমের লাশ ফ্রান্সে পাওয়া গেছে। মক্কাবাসীরা ভাবনায় পড়ে গেল যে, ব্যাপারটা কি? মেয়েটির লাশ মক্কায় এসে পড়ার ব্যাপার না হয় বুঝলাম, আর তার কবুলিয়তের লক্ষণ এবং কবুল হওয়ার হেতুও পাওয়া গেল। কিন্তু আমাদের আলিম লোকটির লাশ মক্কা থেকে কাফিরদের দেশে চলে যাওয়ার রহস্য কি? কি কারণে তার ভাগ্যে এমন দশা ঘটল? বহু চিন্তা ভাবনার পর সবাই বলল, আসল অবস্থা তার ঘরের লোকদের বিশেষ করে স্ত্রীর ভাল জানা থাকবে। আমরা তার স্ত্রীকে জিজ্ঞেস করে দেখি কোন তথ্য পাওয়া যায় কিনা। পরিকল্পনা অনুযায়ী তারা তার ঘরে গেল এবং তার স্ত্রীকে জিজ্ঞেস করল, আচ্ছা আপনি আপনার স্বামীর মধ্যে কখনো ইসলাম বিরোধী কোন আচরণ দেখেছেন কি? স্ত্রী বলল, না তেমন কিছুই তো দেখিনি। তিনি পাকা নামাযী ছিলেন, রীতিমত কুরআন তিলাওয়াত করতেন এবং তাহাজ্জুদ তো বাদ যেত না কখনো। বড় ভাল মানুষ ছিলেন আমার স্বামী। কিন্তু তারপরও লোকেরা বলল, আপনি ভাল করে চিন্তা করে দেখুন কারণ তার লাশ দাফনের পর মক্কা থেকে কাফিরের দেশ ফ্রান্সে চলে গেছে। তার মধ্যে ইসলাম বিরোধী কোন দোষ না থাকলে এমনটি হবে কেন? এবার স্ত্রী বলল হ্যাঁ একটি কথা অবশ্য মনে পড়েছে যে, তিনি যখনই আমার সঙ্গে মিলিত হতেন এবং মিলন শেষে গোসল করার ইচ্ছা করতেন, তখন বলতেন খৃষ্টান ধর্মে এ বিষয়টি বড় ভালো যে, সে ধর্মে সহবাস করলে গোসল করা লাগেনা। এ একটা দোষ অবশ্য তার মধ্যে ছিল। শুনে লোকেরা বলল, ব্যস এ কারণেই আল্লাহ তা'আলা তার লাশ মক্কা থেকে সে জাতির দেশে নিক্ষেপ করেছেন যাদের আইন সে পছন্দ করত।

উল্লেখ্য যে, আলোচ্য লোকটি বাহ্যিক দৃষ্টিতে মুত্তাকি আলিম এবং পাকা মুসলমান ছিল। কিন্তু ভিতরে ভিতরে কাফিরদের একটি বিধানকে সে ইসলামী বিধানের ওপর প্রাধান্য দিত। আর এটা শতসিদ্ধ কথা যে, কুফরী মতবাদ সমর্থন করাও কুফরী, এ কারণে সে শুরু থেকেই মুসলমান ছিল না। তবে কারো মধ্যে এরূপ ত্রুটি থাকলেই লাশ স্থানান্তরিত হয়ে যায় না। আল্লাহ তা'আলা অনুগ্রহ করে এমন দুএকটি ব্যতিক্রম ধর্মী ঘটনা দেখান, যাতে মানুষ শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে। তাই এখানেও আমাদের শিক্ষা হল কুফরী মতবাদ 'গণতন্ত্র' কাফেরদের জন্যই প্রযোজ্য, মুসলমানদের জন্য নয়। "বন্যেরা বনে সুন্দর শিশুরা মাতৃক্রোড়ে"। এবার মূল আলোচনায় আসুন, মুজাহিদগণ প্রচলিত গণতন্ত্রে বিশ্বাসী নয় কেন? আসলে ইসলামে প্রচলিত গণতন্ত্রের কোন স্থান নেই। তাহলে ইসলাম কি এক নায়কতন্ত্রের

পক্ষে? না তাও নয়। কেননা যেভাবে একদলের ইচ্ছা মত সিদ্ধান্তে ভুল হওয়ার সম্ভাবনা আছে, অনুরূপ ভাবে একনায়কতন্ত্রের শাসকের একক সিদ্ধান্তেও ভুলের সম্ভাবনা আছে। আমরা বলি যে, কোরআনের বিধান মতে কাজ করা হবে চাই তা এক ব্যক্তির রায় হোক বা দশজনের পরামর্শের ফসল হোক। অর্থাৎ গণতন্ত্র ও একনায়কতন্ত্রের মাঝখানে একটি নীতি রয়েছে যার নাম "শূরানীতি"। এটাই আমরা জানি ও মানি। কেননা আল্লাহ বলেন- "এবং কাজ কর্মে তাদের সাথে পরামর্শ করুন। যখন কোন কাজের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে ফেলেন তখন আল্লাহ তা'আলার উপর ভরসা করুন। (আল-ইমরান ১৫৯)।

এখানে পরামর্শের গুরুত্ব ও পন্থা সম্পর্কে রাসুলুল্লাহ (সাঃ) এর একটি হাদীস বিশেষ প্রণিধানযোগ্য।

"খতীব বাগদাদী হযরত আলী মুর্তজা (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন আমি রাসূলুল্লাহ (সাঃ) কে জিজ্ঞেস করলাম, আপনার অবর্তমানে আমরা যদি এমন কোন সমস্যার সম্মুখীন হই যাতে কোরআনের কোন ফায়সালা নেই। আপনার পক্ষ থেকে কোন ফায়সালা না পাই, তবে আমরা সে ব্যাপারে কি করব আমাদের হুকুম দিন। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) জওয়াবে বলেন এর জন্য আমার উম্মতের উলামা ও ইবাদতকারীদের একত্রিত করবে এবং পারস্পরিক পরামর্শের ভিত্তিতে কর্তব্য স্থির করবে, কারো একক মতে ফায়সালা করোনা।"

পাঠক বন্ধু আমার! একটু চিন্তা করুন, জ্ঞানী গুণী ও ইবাদতকারী লোকের পরামর্শের দ্বারা কার্য নির্ধারণ করতে বলেইতো অজ্ঞ, নির্বোধ ও ফাসেক শ্রেণীর লোকের রায়কে বাতিল করা হলো। তাই আমি বলব প্রচলিত গণতন্ত্র বাতিল তথা অগ্রহণযোগ্য।

আর একটু চিন্তা করুন আলে ইমরানের-১৫৯ নাম্বার আয়াতে বলা হচ্ছে যে, শাসকগণ অধীনস্থদের থেকে পরামর্শ নিবে। কিন্তু অধিনস্থদের তো আগে বেড়ে পরামর্শ দেয়ার অধিকার দেওয়া হয়নি। এমন তো বলা হয়নি যে, শাসক পরামর্শ কামনা করুন আর নাই করুন তাকে পরামর্শ শুনতে বাধ্য কর। শরীয়তের কোথাও তো "তোমরা শাসকদের পরামর্শ দাও, এটা তাদের প্রতি তোমাদের অধিকার" বলা হয়নি। যখন ইসলাম অধিনস্থ প্রজা সম্প্রদায়কে নিজ ইচ্ছেমত পরামর্শ দেয়ার অনুমতি দেয়নি, তখন আবার ইসলামে গণতন্ত্রের অবকাশটা কোথায়?

যে রাষ্ট্রে ইসলামী শরীয়তের অনুসারী সরকার অথবা আইন নেই, সেখানে যদি ইসলাম বিরোধী বিধানকে আইন সিদ্ধ করার জন্য নির্বাচন করা হয় যেমন বাংলাদেশ বা তৃতীয় বিশ্বের মুসলিম রাষ্ট্র গুলোতে করা হয়, সে সব রাষ্ট্রে নিম্নোক্ত কয়েকটি

মূলনীতির ভিত্তিতে ভোট দান সম্পূর্ণ হারাম বলে বিবেচিত হয়ঃ-

(১) বর্তমান বাংলাদেশ বা অন্যান্য গণতান্ত্রিক মুসলিম রাষ্ট্রের আইন-কানুন পাশ্চাত্যের ইসলাম বিরোধী নীতিমালা অনুসারে প্রণীত। যেহেতু পাশ্চাত্য গণতন্ত্র অনৈসলামিক ও শরীয়ত বিরোধী বিধান মতে প্রণিত, সেহেতু শরীয়ত পরিপন্থী বিধানকে অনুমোদন দানের জন্য ভোটদান সম্পূর্ণ হারাম এবং কুফরীর নামান্তর।

(২) যুগে যুগে দাওয়াতের দায়িত্ব আদায় করার পর প্রত্যেক নবী তাঁর অনুসারীদের জন্য তিনটি মূলনীতি রেখে গেছেন, যে মূলনীতির ভিত্তিতে আমাদেরকে শরীয়ত, পথ চলার নির্দেশ করে।

প্রথমত:- নবীর দাওয়াত গ্রহণ করা, দ্বিতীয়ঃ নবীর দাওয়াত গ্রহণ করতঃ তাঁর আনুগত্য স্বীকার করে সে আলোকে সমাজ ও জীবন গঠন করা, তৃতীয়তঃ সমাজ গঠনে ব্যর্থ হলে হিজরত করে অন্য দেশে চলে গিয়ে দ্বীন প্রতিষ্ঠায় ব্রতী হওয়া। শরয়ী সমাজ প্রতিষ্ঠায় ব্যর্থ হয়ে শরীয়ত পরীপন্থী অনৈসলামিক সমাজের সাথে মিলে মিশে ইসলাম বিরোধী বিধানের অনুমোদনে ভোটদানের অনুমতি কখনো ইসলাম সমর্থন করেনি। পূর্ববর্তী আম্বিয়া, সাহাবায়ে কিরাম থেকে নিয়ে এ পর্যন্ত প্রকৃত ইসলামের অনুসারী কোন ব্যক্তির জীবন ইতিহাসে এমন নজির নেই। বাহ্যত বর্তমান পাশ্চাত্য গণতন্ত্রের নামে শরীয়ত বিরোধী বৈধ কল্পে, ভোট দান করা সকল আম্বিয়ায়ে কিরাম সহ শেষ নবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) ও সাহাবায়ে কিরামের কর্মনীতি ও আদর্শের পরিপন্থী। তারপরও এসব গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়াকে ইসলামী রাজনীতির লেবাস পরানোর অপচেষ্টা করা সম্পূর্ণ ইসলাম বিরোধী কাজ।

(৩) পাশ্চাত্য গণতন্ত্র পুরুষের মতো নারীদেরও ভোটাধিকার এবং শাসন ক্ষমতায় নারীদের সম অধিকার দিয়েছে। যার ফলে মুসলিম রাষ্ট্র সমূহেও শাসনের সর্বোচ্চ ক্ষমতা থেকে নিয়ে সর্বনিম্ন পদে পর্যন্ত নারীদের অবাদ পদচারণা লক্ষ্য করা যাচ্ছে। কুরআন হাদীসে এমন কোন নজীর নেই বা এমন কোন অবকাশও নেই যে, নারী সর্বোচ্চ ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হতে পারবে। যার ফলে পুরুষদের পাশাপাশি নারীদের ভোটাধিকার দেয়া এবং শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত করা সম্পূর্ণ শরীয়ত বিরোধী এবং কুফরী কাজ।

(৪) সংসদে মহিলা সদস্যগণ পুরুষদের পাশাপাশি অর্ধ উলঙ্গ অবস্থায় শরীয়ত বিরোধী পোশাক পরিচ্ছদ পড়ে হাসি, তামাশা, আলাপ, আলোচনা করে যার ফলে সবসময়ই চোখ, পা, হাত দ্বারা জিনার গুনাহ সংঘটিত হতে থাকে। ইসলামের নামে এসব কাজ করা কুরআন ও হাদীসের সাথে ঠাট্টা বৈ কিছু নয়। যখন স্পষ্টভাবে হাদীসে বলা হয়েছেঃ "শরীয়ত অননুমোদিত দৃষ্টি জিনা করে, হাত, পাও জিনা

করে।" উল্লেখ্য, কুরআন হাদীসের পরিপন্থী কাজকে ইসলাম সম্মত কাজ বলে চালিয়ে দেয়াও কুফরী।

(৫) পাশ্চাত্য গণতন্ত্রের ভিত্তি হল, অধিকাংশ ভোটে নির্বাচিত দল পাঁচ বছর দেশ শাসন করবে, যদিও সে দল ইসলাম বিরোধীই হোক না কেন? বিগত কয়েকটি নির্বাচনে দেখা গেছে, সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে নির্বাচিত দল ইসলামের অনুসারী তথা কুরআন ভিত্তিক শাসক নয় বরং ইসলাম বিরোধী বিধান মতেই দেশ পরিচালনা করেছে। অতএব, নিশ্চিত ইসলামী শরীয়ত বিরোধী আইনে দেশ শাসনে অঙ্গিকারাবদ্ধ সংখ্যাগরিষ্ঠের বাক্সে ভোট দেয়া মানে পাঁচ বছরের জন্য বেদ্বীনি কাজ কর্মের জন্য তাদের সুযোগ দেয়া, ইহা অবশ্যই কুফরী কাজে অংশ গ্রহণ করার অন্তর্ভূক্ত।

(৬) যদি ধরে নেয়া হয় (যদিও অবাস্তব), কোন মুসলিম দেশে পাঁচ বছরের জন্য ইসলামী দল ভোটে জয় লাভ করে ইসলামী অনুশাসন মতো দেশ পরিচালনার চেষ্টা করবে কিন্তু পাঁচ বছর পর যদি আবার ,অনৈসলামিক দল ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়, তখন আবার তাদের হাতে ক্ষমতা ছেড়ে দিবে। তখন বিষয়টি ইসলাম থেকে ইরতিদাদ অর্থাৎ মুরতাদ হয়ে যাওয়ার নামান্তর নয়কি?

(৭) যে আইন বা বিধানে সংশয়, সন্দেহ এবং অনিশ্চয়তার অবকাশ আছে, ইসলাম কি এধরনের সংশয়বাদিতাকে কখনো প্রশ্রয় দেয়। সংশয়বাদীরা কি মুসলমান হতে পারে? কুফরের সাথে ইসলামের কি সমঝোতা করার অবকাশ আছে?

(৮) কুরআন হাদীসের ভিত্তিতে মুসলমানদের মধ্যে ঐক্য প্রতিষ্ঠা করার ফরয এবং অনৈক্য সৃষ্টি করা হারাম। যে কাজ কুরআনের নির্দেশ প্রতিপালনে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে, যা মুসলমানদের মধ্যে অনৈক্যের জন্ম দেয় তা ত্যাগ করা একান্ত অপরিহার্য। আর এর সহযোগিতা করাও সম্পূর্ণ হারাম। তদ্রুপ পাশ্চাত্য গণতন্ত্রের অধীনে কোন নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করা এবং ভোটদান করাও নির্দ্বিধায় হারাম।

এছাড়াও বর্তমান নির্বাচন প্রক্রিয়া এজন্যে শরীয়ত পরিপন্থী যে, কুরআন হাদীসের দৃষ্টিতে পরনিন্দা, অন্যের উপর অপবাদ আরোপ করা এবং নিজের প্রশংসা গেয়ে বেড়ানো হারাম। পাশ্চাত্য নির্বাচন প্রক্রিয়ায় এই তিনটি বিষয় বৈধ। ফলে শরীয়ত অনুগত মুসলমানদের জন্য এরূপ নির্বাচন বয়কট করা এবং ভোট দান থেকে বিরত থাকা ফরজ এবং অংশগ্রহন করা হারাম। উক্ত বিষয়ে আরো বিস্তারিত জানার জন্য শেষ অধ্যায়টি পড়ুন।

মোদ্দাকথা উপরোক্ত সব কারণে মুজাহিদগণ প্রচলিত গণতন্ত্রের অনুসরণ তথা বিশ্বাস করেন না।

**(৪৩) বল- মুজাহিদগণ যাকাত গ্রহণ করতে পারবে কি?**

"যাকাত হল কেবল ফকীর, মিসকীন, যাকাত আদায়কারী ও যাদের চিত্ত আকর্ষণ প্রয়োজন তাদের হক এবং তা দাস মুক্তির জন্যে, ঋণগ্রস্তদের জন্যে, আল্লাহর পথে জিহাদকারীদের জন্যে এবং মুসাফিরদের জন্যে। এই হল আল্লাহর নির্ধারিত বিধান। আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।" (তাওবাহ-৬০)।

"বহু প্রতিষ্ঠান যাকাতের সম্পদ উষুল করে বছরের পর বছর জমা রেখে দেয়। আর যাকাত দাতাগণ মনে করে যে, তাদের যাকাত আদায় হয়ে গেছে। অথচ যাকাতের সম্পদ যে পর্যন্ত যোগ্য খাতে ব্যয়িত না হবে, সে পর্যন্ত যাকাত আদায় হবে না। সুতরাং যাকাতের সম্পদ তাৎক্ষণিকভাবে উপযুক্ত হকদারের মালিকানায় হস্তান্তর করা জরুরী।" (মাসায়েলে মাআরিফুল কোরআন-৯১ পৃঃ)

আয়াতে فِىْ হরফের পুনারাবৃত্তি করার উদ্দেশ্যে এই যে, এ খাতটি উল্লেখিত সবখাত অপেক্ষা উত্তম। তার কারণ এই যে, এতে দু'টি ফায়দা রয়েছে- (১) গরীব নিঃস্বের সাহায্য এবং (২) একটি ধর্মীয় কাজে সহায়তা করা। কারণ "ফি-সাবিলিল্লাহ" এর মর্ম সেসব গাজী ও মুজাহিদ, যাদের অস্ত্র ও জিহাদের উপকরণ ক্রয় করার ক্ষমতা নেই অথবা ঐ ব্যক্তি যার উপর হজ্জ ফরজ হয়ে গেছে, কিন্তু এখন আর তার কাছে এমন অর্থ নেই যাতে সে ফরজ হজ্জ আদায় করতে পারে। এ দুটি কাজই নির্ভেজাল ধর্মীয় খেদমত ও এবাদত। কাজেই যাকাতের মাল এতে ব্যয় করায় একজন নিঃস্ব লোকের সাহায্য হয় এবং একটি এবাদত আদায়ে সহযোগিতা হয়। এমনিভাবে ফেকাহবিদগণ ছাত্রদেরকেও এর অন্তর্ভূক্ত করেছেন। কারণ, তারাও একটি এবাদত আদায় করার জন্যই ঐ ব্রত গ্রহণ করে থাকে। সাহাবায়ে কেরাম, যারা কুরআনকে সরাসরি রাসূলে করীম (সাঃ) এর নিকট অধ্যয়ন করেছেন ও বুঝেছেন তাঁদের এবং ইমামগণের যত রকম তাফসীর এ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ শব্দটির ব্যাপারে উদ্বৃত রয়েছে তাতে এ শব্দটিকে হজ্বব্রতী ও মুজাহিদ্বীনদের জন্য নির্দিষ্ট বলে সাব্যস্ত করা হয়েছে।

অতএব, এতটুকু আলোচনার মধ্যে আপনার বুঝে নেয়া উচিত যে মুজাহিদগণ যাকাত গ্রহণ করতে পারবে। এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্ধারিত বণ্ঠন।

**(৪৪) হে কুরআন! যারা "জিহাদ-জিহাদ-জিহাদ চাই, জিহাদ করে বাঁচতে চাই" এ শ্লোগান ধরে রাজপথ উত্তপ্ত করে তাদের সম্পর্কে আপনার মন্তব্য কি?**

"মুমিনগণ! তোমরা যা করনা, তা কেন বল? তোমরা যা করনা, তা বলা আল্লাহর কাছে খুবই অসন্তোষজনক"। (আছ-ছফ-২,৩)

ইমাম তিরমিযী হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে সালাম (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেনঃ একদল সাহাবায়ে কেরাম পরস্পরে আলোচনা করলেন যে, আল্লাহ তায়ালার কাছে সর্বাধিক প্রিয় আমল কোনটি আমরা যদি তা জানতে পারতাম, তবে তা বাস্তবায়িত করতাম।

বগভী (রহঃ) এ প্রসঙ্গে আরও বর্ণনা করেছেন যে, তাঁরা কেউ কেউ একথা বললেন যে, আল্লাহর কাছে সর্বাধিক প্রিয় আমলটি জানতে পারলে আমরা তজ্জন্যে জান ও মাল সব বিসর্জন করতাম।

ইবনে কাসীর মুসনাদে আহমদের বরাত দিয়ে বর্ণনা করেন যে, তাঁরা সব একত্রিত হয়ে পরস্পরে এই আলোচনা করার পর একজনকে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর কাছে এ সম্পর্কে প্রশ্ন করার জন্যে প্রেরণ করতে চাইলেন, কিন্তু সাহস হল না। ইতিমধ্যে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) তাঁদেরকে নামে নামে নিজের কাছে ডেকে পাঠালেন। তাঁরা দরবারে উপস্থিত হলে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) তাঁদেরকে সমগ্র সূরাহ আছচ্ছফ পাঠ করে শুনিয়ে দিলেন, যা তখনই নাযিল হয়েছিল।

এ সূরাহ থেকে জানা গেল যে, তাঁরা সর্বাধিক প্রিয় যে আমলটির সন্ধানে ছিলেন সেটি হচ্ছে 'আল্লাহর পথে জিহাদ'। তাঁরা এ সম্পর্কে যে সব বড় বড় বুলি আওড়িয়েছিলেন এবং জীবনপন করার দাবী উচ্চারণ করেছিলেন, সে সম্পর্কেও এ সূরায় সাথে সাথে তাঁদেরকে সতর্ক করা হয়েছে যে, কোন মুমিনের জন্য এ ধরনের বুলি আওড়ানো দুরস্থ নয়। কারণ এটা একটা মিথ্যা দাবী বৈ নয়, যা নাম ও যশ অর্জনের খাতিরে হতে পারে। বলা বাহুল্য, উপরোক্ত ঘটনায় সাহাবায়ে কেরাম যে দাবী করেছিলেন তা না করার ইচ্ছায় ছিল না। কেননা এমন কোন সাহাবী পাওয়া যাবে না যিনি জিহাদ করেন নাই। আজ যারা রাজপথে ঐ ধরনের দাবী তোলে শোরগোল করে, তাদের সে দাবী অবান্তর। কারণ, প্রকৃতই যদি তোমাদের জিহাদের তামান্না হয়, তোমাদের দাবী সত্য হয়, তবে তোমাদের উচিত ছিল না রাজপথে শোরগোল করা, বরং তোমাদের উচিত ছিল- আরাকান, কাশ্মির, ফিলিস্তিন, আফগানিস্তান, আলজেরিয়া, কসোভোর জিহাদের ময়দানে অবতীর্ণ হওয়া। অবান্তর বুলি আওড়ানোর চাইতে মনের তামান্নাকে কাজে রূপ দেয়াই মুমিনের লক্ষণ ও দাসত্বের পরিচয়। তাই আমি বলি মুজাহিদ্বীনগণ এ ধরনের কোন মিথ্যা দাবী করে না বরং আপন আপন ঈমানী জয্‌বাহ নিয় জিহাদের ময়দানে অবতীর্ণ হয়। আপনি প্রত্যেক জিহাদের ময়দানে হরকতের সৈনিকদের দেখতে পাবেন তারা বুকটান করে দুশমনের মুকাবিলা করে যাচ্ছেন।

আমার আর একটি কথা- যারা উপরোক্ত শ্লোগান ধরে রাজপথে শোরগোল

করে, তাদের এ দাবী যে সম্পূর্ণ মিথ্যা, তা আপনি একটু গভীরভাবে চিন্তা করলে বুঝতে পারবেন। বলেন তো পৃথিবী বাঁচার জায়গা না মরার? অবশ্যই মরার জায়গা; বাঁচার জায়গা হল জান্নাত। যারা জিহাদ করে শাহাদাত লাভে ধন্য হবে তারাই জান্নাতে অফুরন্ত হায়াত কাটাবে। কিন্তু যারা রাজপথে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্যে মিছিল করে তারা কখনো শরীয়ত সম্মত শাহাদাত লাভ করতে পারে না, যদিও তারা দাবী করে শহীদ। অতএব, কিভাবে তারা শহীদী মর্যাদাপূর্ণ জান্নাত পাবে? সুতরাং শহীদগণ ব্যতিত আর কারো এ দাবী সত্য নয়। কেননা, আল্লাহ তাআলা জান্নাতে যখন বেহেস্তীদের উদ্দেশ্যে বলবেন-"সেখানে তোমাদের জন্যে আছে যা তোমাদের মন চায় এবং সেখানে তোমাদের জন্যে আছে যা তোমরা দাবী কর।" (হা-মীম সেজদাহ-৩১) অর্থাৎ তোমাদের আর কোন কিছু চাওয়ার আছে কিনা?

তখন সকল জান্নাতী চুপ হয়ে থাকবে। কারণ, জান্নাতে তাদের শেষ চাওয়া আল্লাহর দীদার তো হয়ে গেল। কিন্তু শহীদগণ বলবেন- "আমি আল্লাহর রাস্তার লড়ব আর শহীদ হব, আবার জীবিত করা হবে এবং শহীদ হব, আবার জীবিত করা হবে এবং শহীদ হব। কারণ কাফের মারার মধ্যে এমন স্বাধ ও আস্বাধ সে উপভোগ করল যা জান্নাতে গিয়েও সে ভুলতে পারছে না। অথচ কোন নবীও বলবেনা "হে আল্লাহ আমাকে আবার নবুওত দান করুন আমি আরও একটু নবুওয়তী করে আসি।" তাই বলছিলাম মুজাহিদগণ এখানে অবান্তর কোন শ্লোগান দেয় না শুধু কাজই করে যায়। জান্নাতে গিয়েই তাঁরা শ্লোগান দিবেন- "জিহাদ-জিহাদ-জিহাদ চাই, জিহাদ করেই বাঁচতে চাই"। কেননা বাঁচার জায়গা, জান্নাত তো তাঁরা পেয়ে গেলেন।

**(৪৫) হে কুরআন! ইসলাহী বায়আততো বুঝে আসছে, কিন্তু "জিহাদী বায়আত" সম্পর্কে কিছু বলবেন কি?**

"সুতরাং তোমরা আনন্দিত হও সে লেন-দেনের উপর, যা তোমরা করেছ তাঁর সাথে। (তাওবাহ-১১১)

এখানে বায়আত, লেনদেন ও অঙ্গিকার উভয় অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

"যারা আপনার কাছে আনুগত্যের শপথ করে, তারা তো আল্লাহর কাছে আনুগত্যের শপথ করে। আল্লাহর হাত তাদের হাতের উপর রয়েছে।" (ফাতাহ-১০)

"আল্লাহ মু'মিনদের প্রতি সন্তুষ্ট হলেন, যখন তারা বৃক্ষের নীচে আপনার কাছে শপথ করল।" (ফাতাহ-১৮)

কোরআন বলছে আমার মধ্যে তিন জায়গায় বায়আত এর কথা উল্লেখ আছে, আর এ বায়আত দ্বারা আল্লাহ তাআলা 'জিহাদের বায়আত ' বুঝিয়েছেন। তাইতো

সাহাবায়েকেরামগণও সর্বক্ষেত্রে বায়আত দ্বারা জিহাদের বায়আত বুঝতেন। সাহাবাগণ বলেন- "আমরা ওরা, যারা মুহাম্মদ (সাঃ) এর হাতে শপথ গ্রহণ করেছি যে, যতদিন বেঁচে থাকি জিহাদ করব, জিহাদ ত্যাগ করব না মরণ না আসা পর্যন্ত।"

ওহে প্রিয় পাঠক বন্ধু! কুরআনের এরূপ আলোচনার দ্বারা আমার আর বুঝতে বাকি নেই- জিহাদের বায়আত কি ও কেন, কিন্তু জানিনা আপনার তা কতটুকু বুঝে আসছে। এখানে আপনার বুঝকে সহজতর করার জন্য আমি আরও দু'টি হাদীস উপস্থাপন করছিঃ ইমাম মুসলিম ও ইমাম বোখারী সহীহ সনদ বর্ণনা করেছেন যে, হযরত মুজাশি ইবনে মাসউদ সালামী (রাঃ) বলেনঃ "আমি আমার ভাইয়ের সাথে হুজুরের (সাঃ) দরবারে হাজির হলাম। আমি তাঁকে বিনয়ের সাথে বললাম, আমাদেরকে হিজরতের উপর বায়আত করুন। প্রিয় নবী (সাঃ) বললেন, যারা হিজরত করেছে তাদের হিজরত করে চলে যাওয়ার সাথে সাথে হিজরতের প্রশ্ন শেষ হয়ে গেছে।" অতঃপর আমি প্রিয় নবী (সাঃ) এর নিকট জানতে চাইলাম, তবে এখন আমরা কিসের উপর বায়আত গ্রহণ করব? তিনি বললেন- ইসলাম ও জিহাদের উপর।

হযরত ইয়ালা ইবনে মাম্বাহ (রাঃ) বলেন- আমি মক্কা বিজয়ের পরের দিন প্রিয় নবী (সাঃ) এর দরবারে গেলাম এবং তাকে বিনয়ের সাথে বললাম, হে আল্লাহর নবী (সাঃ)! আমার আব্বাকে হিজরতের উপর বায়আত করুন। প্রিয় নবী (সাঃ) বললেন, হিজরতের উপর নয় বরং তাকে জিহাদের বায়আত করাব। কেননা মক্কা বিজয়ের পর হিজরতের প্রয়োজনীয়তা শেষ হয়ে গেছে।" (সুনানে কুবরা বায়হাকী ৯ খ: ১৬ পৃ:)

এর দ্বারা বুঝা যায়, প্রিয় নবী (সাঃ) এর নবুয়ত প্রাপ্তির পর শুরুর দিকে ইসলামের উপর বায়আত গ্রহণ করা হত। পরবর্তী সময়ে বায়আত গ্রহণ করা হয় কেবল জিহাদের উপর। তাই আমি আহবান করব আপনাকে, আসুন আমরাও জিহাদের উপর বায়আত গ্রহণ করে সাহাবায়ে কেরামের পূর্ণ অনুসারী হয়ে যাই।"

**(৪৬) বল- এত কষ্ট আর ত্যাগের দ্বারা জিহাদ করব, কিন্তু উপকার বা লাভটা কি হবে?**

কোরআন এখানে ৬টি উপকারের কথা দ্ব্যর্থহীনভাবে ঘোষণা করল-

(১) "যুদ্ধ কর ওদের সাথে, আল্লাহ তোমাদের হস্তে তাদের শাস্তি দিবেন।

(২) তাদের লাঞ্চিত করবেন।

(৩) তাদের বিরুদ্ধে তোমাদের জয়ী করবেন।

(৪) এবং মুসলমানদের অন্তর সমূহ শান্ত করবেন।

(৫) এবং তাদের (তোমাদের) মনের ক্ষোভ দূর করবেন।

(৬) আর আল্লাহ তোমাদের সকলকে ক্ষমা করে দিবেন।" (তাওবাহ-১৪,১৫) আজ আমরা জিহাদ পরিত্যাগ করার কারণে অশান্তিতে নিমজ্জিত আছি, লাঞ্চিত হচ্ছি এবং পরাজয়ের গ্লানি উপভোগ করছি। উপরোক্ত আয়াত দ্বারা স্পষ্ট বুঝা যাচ্ছে যে, জিহাদ তথা কিতাল করতে থাকলেই আমরা ঐ সব থেকে মুক্ত থাকতাম। আর আমাদের অন্তর সমূহ আল্লাহ শান্ত করে দিতেন এবং আমাদের রাগ সমূহ কাফেরের উপর উড়াতে পারতাম। কিন্তু কিতাল তরক করার কারণে মনের সে রাগটা এসে পড়ল আপনজনদের উপর। যার ফলে নিজেদের মধ্যে মতবিরোধ ও ফেতনাই লেগে রয়েছে।

হে পাঠক বন্ধু আমার, এখনো কি আপনার বুঝে আসছেনা, কেন আমরা আজ শত দলে বিভক্ত হয়ে গেছি আর ঐদিকে কাফেররাই আমাদের উপর মোড়লিপনা করে চলছে? সাহাবাগণের উপরতো তারা মোড়লিপনা করতে পারেনি। আসুন আমরা কিতালের ময়দানে ঝাপিয়ে পড়ি, কিতালের মাধ্যমে সকল কুফরি মতবাদকে চুরমার করে দিয়ে নিজেদের মধ্যে সীসা ঢালা ঐক্য গড়ে তুলি, তবেই বিশ্বকে শাসন করতে সক্ষম হব আর কাফের গোষ্ঠি আমাদের গোলাম হয়ে থাকবে এবং আমাদের ভয় দেখিয়ে তারা তাদের শিশুদের ঘুম পাড়াবে, যেভাবে হযরত ওমর (রাঃ) এর নাম বলে বলে রোম-পারস্যের মহিলারা তাদের শিশুদের ঘুম পাড়াতো। "আমি সাহায্য করব রাসূলগণকে ও মুমিনগণকে পার্থিব জীবনে ও সাক্ষীদের দন্ডায়মান হওয়ার দিবসে।" (মুমিন-৫১)

চরম কষ্ট আর ত্যাগের দ্বারা আমরা যখন জিহাদ করব, তবেই শাহাদাত আমাদের নসীব হবে, আর শুহাদায়ে কেরামের জন্যেই হুজুর (সাঃ) ৬টি উপকারের কথা এভাবে ঘোষনা দিয়েছেনঃ

হযরত আবু দারদা (রাঃ) রাসুলুল্লাহ (সাঃ) থেকে বর্ণনা করেন, শুহাদায়ে কেরামের জন্য আল্লাহ বাব্বুল আলামীনের নিকট ৬টি অসাধারণ পুরস্কার রয়েছে-
(১) আল্লাহ রাব্বুল আলামিন শহীদের ছোট-বড় সকল গুনাহ ক্ষমা করে দিবেন।
(২) কবরের ভয়াবহ আযাব থেকে শহীদকে পরিপূর্ণ নিরাপত্তা দান করবে এবং জান্নাতে তাকে এত উচ্চ মর্যাদা দান করবেন যা দেখে সবাই বিস্মিত হবে।
(৩) কিয়ামতের ভয়াবহ ধ্বংস লীলা থেকে শহীদকে হিফাযত করবেন।
(৪) কাল-কিয়ামতের দিন হাশরের ময়দানে আল্লাহ বাব্বুল আলামিন শহীদের মাথায় এমন মহা মূল্যবান মুকুট পড়িয়ে দিবেন যাতে প্রতি স্থাপিত এককটি মণি মুক্তা সমগ্র পৃথিবী ও এর যাবতীয় ধন-সম্পদের চেয়েও অনেক অনেক বেশী

মূল্যবান হবে।

(৫) একেক জন শহীদকে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বেহেস্তের অপরুপা সুন্দরী বাহাত্তরটি হুরকে স্ত্রী হিসেবে দান করবে।

(৬) এবং পরিবার পরিজনদের মধ্য হতে, জাহান্নাম অবধারিত এমন সত্তরজনকে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন শহীদের বিশেষ সুপারিশে জান্নাত দান করবেন। (তিরমিযী)

ওহে পাঠক বন্ধ আমার, জানিনা লাভের কথা আপনার কতটুকু বুঝে আসছে। লাভ যে কোন প্রকারের হোক না কেন পাবেন যে তা নিশ্চিত, এতটুকু ঈমান রেখে জিহাদের ময়দানে ছুটে আসুন। সারাদিন পরিশ্রম করে যখন তাবুতে ঘুমাতে আসবেন আর নিশ্চিন্তে ঘুমাবেন তখনই আল্লাহ আপনাকে এর বাস্তবতা স্বপ্নের মধ্যে দেখিয়ে দিবেন, ইনশাআল্লাহ। এটা আমার নিকট পুর্ণ বিশ্বাস রয়েছে। ইতিহাসেও এর বহু প্রমাণ রয়েছে। আফগান জিহাদের একটি বাস্তব ঘটনা আপনার সামনে পেশ করছি- "আখতার মাহমুদ নামে পাকিস্তানি মুজাহিদ। বয় আনুমানিক ২০ বছর। যখন সে জিহাদের ময়দানে রওয়ানা হচ্ছে তখন তার অবয়ব এক অপার্থিব জ্যোতির ঝলকে জ্বলতে লাগল, সকলে চারদিকে অবাক তাকিয়ে দেখতো। একবার গরদেজ রনাঙ্গনে যুদ্ধে শরীক হওয়ার জন্য রওয়ানার সময় নূরের জ্যোতিতে ঝলসে উঠছিল তার চেহারা। মনে হচ্ছিল তার শরীর যেন নূরের এক উজ্জল টুকরো। মিষ্টি আমেজে জ্বল জ্বলে আভা আলো বিস্তৃত হচ্ছে সমস্ত উপত্যকায়। এই বেহেশতী মানুষটিকে নয়ন ভরে সকলে দেখছে, দ্বিতীয়বার তার সাথে দেখা হবে কিনা কে জানে! উপস্থিত মুজাহিদ বন্ধুরা তার নিকট বিনীত অনুরোধ করে বলছে, "ভাই আখতার! যদি শহীদ হয়ে যাও তবে কিয়ামতের দিন আমাদের জন্য আল্লাহর দরবারে অবশ্যই সুপারিশ করবে।" প্রচন্ড শীত বইছে, সমস্ত উপত্যকা বরফে ঢেকে গেছে। এমন পরিস্থিতিতে সে গোসল করছে। তাকে জিজ্ঞেস করা হল, প্রচন্ড ঠান্ড বরফ-পানিতে তুমি কেন গোসল করছ? বলল- "মনে হচ্ছে আগামীকাল আমার আনন্দ ঘন বিয়ে অনুষ্ঠিত হবে।" ঐ গরদেজ রনাঙ্গনে তুমুল লড়াইয়ে এক পর্যায়ে সে বুকে গুলিবিদ্ধ হয়ে শাহাদাত লাভে ধন্য হয়। পরম প্রাপ্তি ও আনন্দের হাসি হেসে নশ্বর দুনিয়া ত্যাগ করে অনন্ত জগত জান্নাতের পথে যাত্রা করে। সত্যিই পরদিন তার শুভ বিবাহ অনুষ্ঠিত হয়েছিল। তবে এ জগতের কোন তন্বী-তরুনীর সাথে নয়, জান্নাতের হুরদের সাথে তার মধুমিলন ঘটেছিল। এর চেয়ে সৌভাগ্যের বিষয় আর কি হতে পারে বলুন।

**(৪৭) বল- জিহাদে অবতীর্ণ হলে অন্যান্যদের তুলনায় আমাদের মর্যাদা কি পরিমাণ বৃদ্ধি পাবে?**

"গৃহে উপবিষ্ট মুসলমান যাদের কোন সঙ্গত ওজর নেই এবং ঐ মুসলমান যারা জান ও মাল দ্বারা আল্লাহর পথে জিহাদ করে, সমান নয়। যারা জান ও মাল দ্বারা জিহাদ করে, আল্লাহ তাদের পদমর্যাদা বাড়িয়ে দিয়েছেন গৃহে উপবিষ্টদের তুলনায় এবং প্রত্যেকের সাথে আল্লাহ কল্যাণের ওয়াদা করেছেন। আল্লাহ মুজাহিদীনকে উপবিষ্টদের উপর মহান প্রতিদানে শ্রেষ্ঠ করেছেন। (নিসা-৯৫)

এই মর্যাদা এ জন্য যে, তারা আপন জীবন আল্লাহর নিকট সোপর্দ করার দৃঢ় অঙ্গিকার গ্রহণ করেছে। একেই বলে মুসলিম জীবনের মেরাজ, এটাই আল্লাহর দাসত্বের শ্রেষ্ঠ স্তর। আমার সবচেয়ে মূল্যবান জিনিস জীবন ও সম্পদ সাহসের সাথে আল্লাহর নিকট সোপর্দ করার চেয়ে উত্তম কাজ আর কি হতে পারে? পবিত্র কোরআনের এই আয়াতে সে কথাই বলা হয়েছে। বিজ্ঞ আলিমগণ লিখেছেন, আয়াতে উল্লিখিত اَلْقَاعِدِيْنَ শব্দটি দ্বারা নির্দিষ্ট কোন শ্রেণীকে বুঝানো হয়নি। বরং প্রত্যেক যুগের তাদের সকলকে বলা হয়েছে, যারা জিহাদে অংশ গ্রহণ না করে ঘরে বসে আছে, জিহাদী জীবন অবলম্বন না করে জিহাদকে উপেক্ষা করছে। জিহাদ ও মুজাহিদদের সাহায্য সহযোগিতায় অবহেলা ও উন্নাসিকতা দেখিয়েছে। এরা সকলে ঐ উপবিষ্টদের অন্তর্ভূক্ত। আয়াতে যে উপবিষ্টদের উপর জিহাদকারীদের বিশেষ সম্মানের কথা বলা হয়েছে এবং যে উপবিষ্টদের কল্যাণের ওয়াদা দেওয়া হয়েছে, তারা ঐ সকল উপবিষ্ট লোকগণ, যাদের জন্য ফরজে কেফায়া। কারণ, ফরজে আইন হওয়ার পরও যদি কেউ জিহাদে অংশ গ্রহণ না করে, তাহলে তার সাথে আল্লাহ্‌র কল্যাণের ওয়াদা করার প্রশ্নই আসেনা। কারণ, সে তো মুনাফেক।

কিছু লোক আছে, যারা রাত-দিন সমানে ইবাদত করতে থাকে, ফযায়েল-ফযিলত পালনে দারুণ আগ্রহ দেখায়, হাবভাবে বুযুর্গী প্রকাশ করে। এদের চেয়ে সেই ব্যক্তি বহুগুণে শ্রেষ্ঠ ও আল্লাহর প্রিয় পাত্র, যিনি ফযায়েল-ফযিলত ফালনের সময় বেশী পাননা বটে, তবে তিনি জিহাদী জিন্দেগী গ্রহণ করেছেন এবং ময়দানে ইসলামের শত্রুর মোকাবেলায় বুক টান করে দাঁড়িয়ে যুদ্ধ করে যাচ্ছেন। একথা পবিত্র কোরআনের স্পষ্ট আয়াত দ্বারা প্রমাণিত।

"তোমরা কি হাজীদের পানি সরবরাহ ও মসজিদুল হারাম আবাদ করণকে সেই লোকের সমান মনে কর, যে ঈমান রাখে আল্লাহ ও শেষদিনের প্রতি এবং যুদ্ধ করেছে আল্লাহর রাহে, এরা আল্লাহর দৃষ্টিতে সমান নয়, আর আল্লাহ জালেম লোকদের হেদায়েত করেন না। যারা ঈমান এনেছে, দেশ ত্যাগ করেছে এবং আল্লাহর রাহে নিজের মাল ও জান দিয়ে জিহাদ করেছে, তাদের বড় মর্যাদা রয়েছে আল্লাহর কাছে, আর তারাই সফলকাম।" (তাওবাহ- ১৯,২০)

এই আয়াতগুলি একটি ঘটনার প্রেক্ষিতে নাযিল হয়েছে যা মুসলিম শরীফে নোমান বিন বশির থেকে এভাবে বর্ণিত হয়েছে- "এক জুমার দিন তিনি কতিপয় সাহাবার সাথে মসজিদের নববীতে (সাঃ) মিম্বরের পাশে বসা ছিলেন। উপস্থিত একজন বললেন, ইসলাম ও ঈমানের পর আমার দৃষ্টিতে হাজিদের পানি সরবরাহের মত মর্যাদা সম্পন্ন আর কোন আমল নেই এবং এর মোকাবেলায় আর কোন আমলের ধার আমি ধারিনা। তাঁর উক্তি খন্ডন করে অপরজন বললেন, আল্লাহর রাহে জিহাদ করার মত উত্তম আমল আর নেই। এভাবে দু'জনের মধ্যে বাদানুবাদ চলতে থাকে। হযরত ওমর ফারুক (রাঃ) তাদের ধমক দিয়ে বললেন, রাসূলুল্লাহর মিম্বরের কাছে শোরগোল বন্ধ কর। জুমার নামাজের পর স্বয়ং হযরতের কাছে বিষয়টি পেশ কর। কথা মত বিষয়টি তাঁর কাছে রাখা হয়। এর প্রেক্ষিতেই উপরোক্ত আয়াত নাযিল হয় এবং এতে মসজিদের রক্ষণাবেক্ষণ ও হাজিদের পানি সরবরাহের উপর জিহাদকে প্রাধান্য দেয়া হয়। (মা'রিফুল কোরআন বাংলা-৫৫৮ পৃঃ)

মোট কথা ইসলাম গ্রহণের পর ঈমান ও জিহাদের মর্যদা মসজিদুল হারামের রক্ষণাবেক্ষনও হাজীদের পানি সরবরাহের তুলনায় অনেক বেশী। তাই যে মুসলমান ঈমান ও জিহাদে অগ্রগামী, সে জিহাদে অনুপস্থিত মুসলমানের চেয়ে অধিক মর্যাদার অধিকারী। এখন, ঈমান যে, সকল আমলের মূল ও সকল এবাদতের চেয়ে আফযল এবং জিহাদ যে মসজিদ আবাদ ও হাজীদের পানি সরবরাহ থেকে উত্তম, তা কোন সূক্ষ্ম তত্ত্ব বা দূর্বোধ্য বিষয় নয়; বরং একান্ত পরিস্কার কথা।

এবার আল্লাহ প্রদত্ত এই সুউচ্চ মর্ষাদার অধিকারী হওয়ার জন্যে আপনি ছুটে আসুন জিহাদের ময়দানে এবং অবলম্বন করুন জিহাদী জিন্দেগী।

**(৪৮) বল- ময়দানে মাহশরে কি আমরা এ জিহাদ সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হব?**

"তোমরা কি মনে কর যে, তোমাদের ছেড়ে দেওয়া হবে এমনি, যতক্ষণ না আল্লাহ জেনে নেবেন তোমাদের কে যুদ্ধ করেছে এবং কে আল্লাহ ও তাঁর রাসুল এবং মুসলমানদের ব্যতিত অন্য কাউকে অন্তরঙ্গ বন্ধুরূপে গ্রহণ করা থেকে বিরত রয়েছে। আর তোমরা যা কর সে বিষয়ে আল্লাহ সবিশেষ অবহিত। (তাওবাহ-১৬) আমি শুরুতেই উল্লেখ করেছি- জিহাদ ফরজ করাতে আল্লাহ তায়ালার উদ্দেশ্য হল মুসলমানদের পরীক্ষা করা। কে নিষ্ঠাবান মুসলমান, কে দুর্বল ঈমান সম্পন্ন ও কে মুনাফিক। উপরোক্ত আয়াতে আল্লাহ তায়ালা বলেন- তোমরা কি মনে কর যে, শুধু কলেমার মৌখিক উচ্চারণ ও ইসলামের দাবী শুনে তোমাদের এমনিতে ছেড়ে দেয়া হবে? অথচ আল্লাহ প্রকাশ্য দেখতে চান কারা আল্লাহর রাহে জিহাদকারী এবং কারা আল্লাহ, তাঁর রাসূল ও মুমিনদের ব্যতিত আর কাউকে অন্তরঙ্গ বন্ধুরূপে গ্রহণ

করছেন। এ আয়াতে সম্বোধন করা হয়েছে মুসলমানদের প্রতি। এখানে নিষ্ঠাবান মুসলমানদের দু'টি আলামত এর উল্লেখ করা হয়েছে- প্রথম, শুধু আল্লাহর জন্যে কাফেরদের সাথে যুদ্ধ করা। দ্বিতীয়, কোন অমুসলমানকে নিজের অন্তরঙ্গ বন্ধু সাব্যস্ত না করা।

আমাদের জন্য এখানে আর একটি শিক্ষনীয় বিষয় হল এই যে, নির্বাচন আসলে আমরা (মুসলমানরা) অমুসলমানদের দ্বারে দ্বারে গিয়ে ভোট প্রার্থনা করি। অনেকেই চতুরতা করে পূর্বে থেকেই তাদের সাথে বন্ধুত্ব করি। শরীয়ত এটাকে সম্পূর্ণ নিষেধ করে দিয়েছে। অথচ আমরা তা মানছি না। বলুন তো আমরা কিভাবে নিষ্ঠাবান মুসলমান হতে পারি? দেখা যাচ্ছে শুধুমাত্র মুজাহিদরাই তা হতে বিরত, অতএব বর্তমানে নিষ্ঠাবান মুসলমান তারাই হতে পারে। আজ আমরা তথাকথিত গণতন্ত্রের অনুসরণ করেই তো নিষ্ঠাবান মুসলমানের তালিকা বহির্ভূত হয়ে গেছি। আল্লাহ তাআলা অন্যত্র বলেন-

"আমি অবশ্যই তোমাদেরকে পরীক্ষা করব যে পর্যন্ত না ফুটিয়ে তুলি তোমাদের জিহাদকারীদেরকে।" (মুহাম্মদ-৩১)

"তোমাদের কি ধারণা, তোমরা জান্নাতে প্রবেশ করবে, অথচ আল্লাহ এখনো দেখেননি তোমাদের মধ্যে কারা জিহাদ করেছে এবং কারা ধৈর্যশীল? (আল-ইমরান-১৪২)

উপরোক্ত আলোচনার দ্বারা আমরা একথা নিশ্চিত বুঝতে পারি যে, হাশর ময়দানে জিহাদ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে।

**(৪৯) বল-গেরিলা যুদ্ধ করা যায়েজ কিনা?**

"আর প্রত্যেক ঘাঁটিতে তাদের সন্ধানে ওঁৎপেতে বসে থাক।" (তাওবাহ-৫) এখানে আপনাকে আগে বুঝতে হবে গেরিলা যুদ্ধের কৌশল সমূহ। এখানে গেরিলা যুদ্ধের একটি কৌশল "এমবুশ" সম্পর্কে আলোচনা করা হবে। "যে গোপন স্থান হতে আকস্মিক; আক্রমণ চালানো হয়, তাকে এমবুশ বলে।" আল্লাহ তাআলা যে ওঁৎপেতে বসে থাকার কথা বলেছেন তাই হল এমবুশ। বিক্ষিপ্ত অবস্থানে থেকে খন্ড যুদ্ধ পরিচালনাই হল গেরিলা যুদ্ধ। তাহলে বুঝা যাচ্ছে উপরোক্ত আয়াতে গেরিলা যুদ্ধের অনুমতি রয়েছে।

এমবুশের (Ambush) নিয়ম হল- যে স্থানে এমবুশ করা হবে সে স্থানের রং এর অনুরূপ রং এ সৈনিককে সাজতে হবে, অস্ত্র-সস্ত্র সমূহকে ঐ রং এর করে নিতে হবে, যেন ঐ দৃশ্যে পৃথক কোন কিছু দৃষ্টিগোচর না হয়। অতঃপর ওঁৎ পেতে বসে থাকতে হয় শত্রুর অপেক্ষায়।

ওহুদের যুদ্ধের রনাঙ্গনের দৃশ্য আমি আপনার সামনে পেশ করব যা গেরিলা যুদ্ধের ইঙ্গিত বহন করে। যা পরিচালনা করেছেন যোদ্ধা নবী মোহাম্মদে আরবী (সাঃ)।"দুই-আড়াই মাইল উচ্চ মূল ওহুদ পর্বতের পাদদেশের বিস্তীর্ণ ময়দানের মধ্যে অর্ধ মাইল অপেক্ষা কম উচচ ক্ষুদ্র আয়তনের "আইনাইন" নামক একটি ছোট পাহাড় ছিল। এ পাহাড়টির দৈর্ঘ্যের একদিক ওহুদ পর্বতের দিকে, কিন্তু ওহুদের সঙ্গে মিলিত নয়- মধ্য ভাগে বিরাট ফাঁক। অপরদিক মদীনা নগরীর দিকে উহা, ঘেঁষে একটি অপ্রশস্ত পথ; ঐ পথের পার্শ্বের পার্বত্য প্রণালী বা খাল বিশেষ ছিল। সে প্রণালীটিই উক্ত এলাকাকে মদীনার মূল-ভূ খন্ড হতে বিচ্ছিন্ন করে রেখেছিল। এ আইনাইন পাহাড়টির উভয় পার্শ্বে বিস্তীর্ণ ময়দান। এক পার্শ্বের ময়দানে তিন হাজার কাফের বাহিনী দিন কয়েক পূর্বে হতেই অবস্থান গেড়ে রয়েছিল। তাদের বামে ওহুদ পর্বত, ডানে পার্বত্য প্রণালী ও মদীনার দিক, পিছনে মক্কার দিকের পথের এলাকা, সম্মুখে আইনাইন পাহাড়। মুসলিম বাহিনী উক্ত পাহাড়ের অপর পার্শস্থ ময়দানে উপস্থিত হলেন; তাঁদের সম্মুখে ঐ পাহাড়, ডানে ওহুদ পর্বত বামে পার্বত্য প্রণালী।

এ আইনাইন পাহাড়ের দৈর্ঘ্যের পূর্ব মাথা এবং ওহুদ পর্বতের মধ্যবর্তী যে সুপ্রশস্ত ফাঁকা স্থান রয়েছে, এ ফাঁকা পথেই মুসলিম বাহিনী অগ্রসর হয়ে আইনাইন পাহাড়ের অপর পার্শ্বে অবস্থানরত কাফের বাহিনীর উপর আক্রমণ চালাবেন- এ পরিকল্পনা হযরত (সাঃ) স্থির করলেন, কারণ পাহাড়টির অপরদিকে তো অপ্রশস্ত পথ এবং পথের সংলগ্নেই প্রণালী বা খালের খাদ। কাফের বাহিনীর সম্মুখেও এ একই পরিকল্পনা। অতএব আইনাইন পাহাড়ের মাথা এবং ওহুদ পাহাড় উভয়ের মধ্যবর্তী সুপ্রশস্ত ফাঁকা জায়গাটিই হবে যুদ্ধের মূল ক্ষেত্র। প্রত্যেক পক্ষই ঐ পথে অগ্রসর হয়ে অপর পক্ষের উপর আক্রমণ করবে; সুতরাং উভয় পক্ষের আক্রমণ ও প্রতিরোধ ঐ জায়গায়ই হবে।

আইনাইন পাহাড়ের অপরদিক তথা মদীনার দিকের মাথায়ও উহার উভয় পার্শ্বের যোগ সূত্র পথ ছিল, কিন্তু তা প্রণালীর গর্তের দরুণ অপ্রশস্ত। এ পথটি কাফের বাহিনীর জন্য বিশেষ সুযোগের বস্তু। কারণ তাদের সংখ্যা অনেক, তারা মূল যুদ্ধক্ষেত্রে পুরো দমে যুদ্ধ চালিয়েও বাহিনীর বিশেষ অংশকে এ পথে অগ্রসর করে পাহাড়ের অপর পার্শ্বস্থ মুসলিম বাহিনীর উপর পিছনদিক হতে আক্রমণের জন্য নিয়োগ করতে পারে। মুসলমানদের জন্য এ পথের উক্ত সুযোগ বর্তমান, কিন্তু তাদের সংখ্যা অল্প; তিন হাজারের সম্মুখে মাত্র সাত শত। তাঁরা বিভক্ত হয়ে যুদ্ধ চালাতে সক্ষম হবেন না, কিন্তু এ দিকের আক্রমণ রোধের ব্যবস্থা তাঁদেরকে

অবশ্যই করতে হবে। নতুবা মুহুর্তের মধ্যে তারা সম্মুখ পিছন দিক হতে আক্রান্ত হয়ে পড়বেন। সুতরাং এ পথে কাফেরদের জন্য আক্রমণের সুযোগ আর মুসলিম বাহিনীর জন্য আত্মরক্ষার প্রতিরোধ ব্যবস্থা প্রয়োজন।

কাফেররা তাদের সুযোগ হতে বে-খবর ছিলনা, তাই তারা বীরবর খালেদ ইবনে ওলীদের (তিনি তখন মুসলমান ছিলেন না) অধীনে ২০০ অশ্বরোহী বীর সেনানী ঐ পথে অগ্রসর হওয়ার সুযোগের অপেক্ষায় মোতায়ন রেখে মূল ক্ষেত্রে যুদ্ধ আরম্ভের প্রস্তুতি নিল। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) আত্মরক্ষার প্রয়োজন হতে অসচেতন ছিলেন না। তাই তিনি আব্দুল্লাহ ইবনে জোবাইর (রাঃ) এর অধীনে পঞ্চাশ জনের একটি তিরন্দাজ বাহিনী ঐ পাহাড়ের মাথায় এ পথে নিয়োগ করলেন। এ রূপে সামান্য সংখ্যক দিক হতে নিশ্চিত অবস্থায় সম্মুখদিকে যুদ্ধ আরম্ভ করে অগ্রসর হলেন। তাঁর এ বিছক্ষণতা পূর্ণ সুশৃঙ্খল রণ-কৌশলকে উল্লেখ করে আল্লাহ তাআলা বলেন-

"আর আপনি যখন পরিজনদের কাছ থেকে সকাল বেলা বেরিয়ে গিয়ে মুমিনগণকে যুদ্ধের অবস্থানে বিন্যস্ত করলেন, আর আল্লাহ সব বিষয়ই শুনেন এবং জানেন।" (আলে ইমরান-১২১) (বাংলা অনুঃ বোখারী ৩য় খন্ড ১৫৮ পৃঃ)।
উদ্দেশ্য হুজুর (সাঃ) এর এ কৌশল অবলম্বন গেরিলা যুদ্ধের ইঙ্গিত বহন করে যা আল্লাহও সমর্থন করলেন। উল্লিখিত আয়াত ও হাদীস খানা আপনার প্রশ্নের জবাবে যথেষ্ট মনে করি, যদি আপনি তা বুঝতে পারেন। আরেকটি আয়াত প্রনিধান যোগ্য-
"হে ঈমানদারগণ! নিজেদের অস্ত্র তুলে নাও এবং পৃথক পৃথক সৈন্যদলে কিংবা সমবেতভাবে বেড়িয়ে পড়। (সূরাহ নিসা-৭১)

**(৫০) হে কুরআন আপনার কথা অবশ্যই সত্য, তবে সমস্যা হল, আমি জিহাদে যেতে চাই, কিন্তু আব্বা যেতে বারণ করেন; আম্মা বাঁধা দেন; স্ত্রী না যেতে অনুরোধ করেন; উপরন্তু তখন ব্যবসা-বাণিজ্য, চাকুরী ও ক্ষেত-খামারের কথা মনে পড়ে, এসব ফেলে রেখে কিভাবে আমি জিহাদে যাব?**

"বল- তোমাদের নিকট যদি তোমাদের পিতা, তোমাদের সন্তান, তোমাদের ভাই, তোমাদের পত্নী, তোমাদের গোত্র, তোমাদের অর্জিত ধন-সম্পদ, তোমাদের ব্যবসা যা বন্ধ হয়ে যাওয়ার ভয় কর এবং তোমাদের বাসস্থান যাকে তোমরা পছন্দ কর, আল্লাহ, তাঁর রাসুল ও তাঁর রাহে জিহাদ করা থেকে অধিক প্রিয় হয়, তবে অপেক্ষা কর; আল্লাহর বিধান আসা পর্যন্ত। আর আল্লাহ ফাসেক সম্প্রদায়কে হেদায়েত করেন না"। (তাওবাহ-২৪)
এ আয়াতে আল্লাহ তায়ালার বিধান আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করার যে কথা আছে,

তৎসম্পর্কে হযরত হাসান বসরী (রহঃ) বলেন, এখানে বিধান অর্থ আল্লাহর আযাবের বিধান। অর্থাৎ আখেরাতের সম্পর্কের উপর যারা দুনিয়াবী সম্পর্ককে প্রাধান্য দিয়ে হিজরত থেকে বিরত রয়েছে, আল্লাহর আযাব অতিশীঘ্র তাদের গ্রাস করবে। দুনিয়ার মধ্যেই এ আযাব আসতে পারে। অন্যথায় আখেরাতের আযাবতো আছেই। এখানে হুঁশিয়ারী উচ্চারণটি মূলতঃ হিজরত না করার প্রেক্ষিতে। কিন্তু তদস্থলে উল্লেখ করা হয় জিহাদের যা হল হিজরতের পরবর্তী পদক্ষেপ। এই বর্ণনা ভঙ্গির দ্বারা ইঙ্গিত দেয়া হয় যে, সবেমাত্র হিজরতের আদেশ দেয়া হল। এতেই অনেকের হাঁপ ছেড়ে বসার অবস্থা। কিন্তু অচিরেই আসবে জিহাদের আদেশ, যে আদেশ পালনে আল্লাহ ও রাসূলের জন্য সকল বস্তুর মায়া এমনকি প্রাণের মায়া পর্যন্ত ত্যাগ করতে হবে। (বাংলা অনুবাদকৃত তাফসীরে মারিকুল কোরআন-৫৬০)

এবার আপনি নিজেই বিবেচনা করুণ এক্ষেত্রে কোনটিকে অধিক গুরুত্ব দেয়া উচিত হবে। এখানেই আপনার প্রশ্নের জবাব শেষ, এবার বুঝে নিন জিহাদ সম্পর্কিত বিষয়ের প্রতি আল্লাহ তায়ালা কতটুকু গুরুত্ব আরোপ করেছেন। আশা করব এরপর জিহাদ সম্পর্কে আপনার অন্তরে শয়তান আর কোন প্রকার ওয়াছ ওয়াছা প্রয়োগ করতে সক্ষম হবে না, যদি কোরআনের উপরোক্ত জবাব আপনি গ্রহণ করেন।
আমি আরও একটি কথা শুনার প্রতি আপনার দৃষ্টি আকর্ষন করব, তাহল এই যে- আল্লাহ তাবারাক ওয়াতা'আলা কোরআনে বিভিন্ন নবীর নামে বিভিন্ন সূরা নাযিল করেছেন এবং অন্যান্য সূরায় ও অনেক নবীর জীবন বৃত্তান্ত বয়ান করেছেন। যেমন- সূরা ইউনুস, সূরা হুদ, সূরা ইউসুফ, সূরা ইবরাহীম, সূরা বনী ইসরাঈল, সূরা মারইয়াম, সূরা লোকমান, সূরা মুহাম্মদ ও সূরা নূহ। কোরআন মজিদে আল্লাহ তাআলা ২৫ জন নবীর নাম উল্লেখ করেছেন, তার মধ্যে বিশেষ কয়েকজনের জীবন বৃত্তান্ত বর্ণনা করেছেন। ঐ নবীর জন্ম কোথায়, কখন, কিভাবে, হিজরত করলেন কোথায়, কিভাবে, নবুয়াত পেলেন কোথায়, কিভাবে? এভাবে যা কিছু আছে সব তিনি বয়ান করেছেন। কিন্তু আমার নবী নবীউসসাইফ (সাঃ) এর নামে সে সূরা নাযিল করলেন সেখানে আল্লাহ তাঁর এসব জীবন বৃত্তান্ত তো বয়ান করেননি, বয়ান করেছেন তাঁর নুবুয়াতী জীবনের এমন এক রক্ত ঝরা অধ্যায়, যার দ্বারা গোটা পৃথিবীর বুকে তিনি পূর্ণ ইসলাম সুপ্রতিষ্ঠিত করে গেছেন। তাই তাফসীর বিদগণ এর অপর নাম দিয়েছেন "সুরা কিতাল" এবার আপনি বুঝে নিন আল্লাহ পাক কিতালকে কতটুকু গুরুত্ব দিয়েছেন তাই আমি বলব আপনি কেন এই ফরজ বিধান "কিতাল ফী সাবীলিল্লাহর" প্রতি গুরুত্ব দিবেন না? কেন এর প্রতি আপনার আন্ত রিক অনিহা প্রকাশ পাবে? মনে রাখবেন অসম্পূর্ণ এবাদত আল্লাহর দরবারে কবুল

হতে পারে কিন্তু অসম্পূর্ণ ঈমান আল্লাহ কবুল করবেন না। পরিপূর্ণ বিশ্বাসের সহিত এ এবাদত আদায় করার দ্বারাই প্রমাণ হবে আপনি আল্লাহর প্রথম শ্রেনীর গোলাম। এই হচ্ছে মুহাম্মদ (সাঃ) এর প্রতি পূর্ণ আনুগত্যের বহি:প্রকাশ। তখনই আপনি হবেন আল্লাহর শ্রেষ্ঠ বান্দা এবং রাসুলুল্লাহ (সাঃ) এর শ্রেষ্ঠ উম্মত।

তবে এ এবাদত আল্লাহর দরবারে কবুল হওয়ার জন্য পূর্বশর্ত হল "এখলাস"। এখলাস না থাকলে আপনার এ জিহাদ ও শাহাদাত কোনই কাজে আসবে না। তাই আমি এখানে একটি হাদীস পেশ করছি যা আপনার এখলাস অর্জনের জন্য যথেষ্ট হবে।

"হযরত ইবনে মুবারক (রহঃ) একজন তাবেঈ থেকে বর্ণনা করেছেন। এই তাবেঈ, সাহাবী হযরত মু'আয (রাঃ)-কে বললেন, হে মুআয! আপনি আমাকে এমন একখানা হাদীস বলুন, যা আপনি স্বয়ং হুজুর পাক (সাঃ) এর পবিত্র যবান থেকে শ্রবণ করেছেন। একথা শুনে হযরত মু'আয (রাঃ) এতই কাঁদতে লাগলেন যে, আমার মনে হচ্ছিল হয়তো বা এ কান্না আর থামবে না। অবশেষে তিনি কান্না থামালেন এবং বললেন, "রাসুলুল্লাহ (সাঃ) আমার কতই না প্রিয়! তাঁর সাক্ষাত ও সাহচর্যের জন্য আমি ব্যকুল হয়ে আছি, জানিনা কবে আমার এ সাক্ষাত ঘটবে, আর আমি শান্ত হবো, ধন্য হবো। একদা রাসুলুল্লাহ (সাঃ) কে বলতে শুনেছি; স্বয়ং আমাকে সম্বোধন করেই তিনি বললেনঃ হে মু'আয! আমি তোমাকে একখানা হাদীস বলব, তুমি যদি সেটা স্মরণ রেখে আমল করতে পার, তা'হলে আল্লাহর দরবারে তা তোমার কাজে আসবে; কিন্তু যদি সেটা ভুলে যাও এবং অবহেলা করে আমল না কর, তাহলে ক্বিয়ামতের দিন আল্লাহর দরবারে তোমার কোনই উযর-আপত্তি চলবে না। হে মু'আয! আল্লাহ তাআলা আসমান-যমীন সৃষ্টি করার পূর্বে সাত জন ফেরেশতা সৃষ্টি করেছেন এবং এঁদের প্রত্যেককে এক এক আসমানের দারোয়ান নিযুক্ত করেছেন। সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত বাহক ফেরেশতাগণ মানুষের আমল নিয়ে আসমানে আরোহণ করতে থাকেন। এ সময় বাহিত আমলের নূর সূর্য কিরণের মত চমকিতে থাকে। প্রথম পর্যায়ে বাহক ফেরেশতাগণ আমল নিয়ে প্রথম আসমানে পৌছে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির আমলের পবিত্রতা ও প্রশংসা বর্ণনা করেন; তখন প্রহরী ফেরেশতা বাহক ফেরেশতাকে বলেন, এই ব্যক্তির আমল তার মুখের উপর নিক্ষেপ কর, আমি গীবতের দায়িত্বে আছি; আমার প্রভু আমাকে হুকুম করেছেন, যাতে কোন গীবতকারীর আমল আমাকে অতিক্রম করে পরবর্তী আসমানে যেতে না পারে।

অতপর বাহক ফেরেশতাগণ অপর এক ব্যক্তির নূর উজ্জ্বল নেক আমল নিয়ে

আসনে এবং এই আমলের তারীফ প্রশংসা করেন; এভাবে দ্বিতীয় আসমান পর্যন্ত পৌছে যায় তখন প্রহরারত ফেরেশতা বলেন, দাঁড়াও এবং এই আমল আমলকারী ব্যক্তির উপর মার, কারণ এর দ্বারা সে দুনিয়াতে মান-সম্মান লাভ ও অহংকার করতে চেয়েছিল, আমি অহংকারের দায়িত্বের ফেরেশতা; এ ব্যক্তি দুনিয়াতে নিজের শ্রেষ্ঠত্বের বড়াই করতো; আমার প্রতিপালক আমাকে এই দায়িত্বে রেখেছেন, যাতে কোন অহংকারী ব্যক্তির আমল আমাকে অতিক্রম করে উপরে যেতে না পারে।

অতপর বাহক ফেরেশতাগণ আরেক বান্দার নেক আমল নিয়ে উঠতে থাকেন; এই নেক আমল দান-খয়রাত, নামাজ, রোজা দ্বারা এমনভাবে জ্যোতির্ময় যে, সে বাহক ফেরেশতাগণ নিজেরাই আশ্চার্য হয়ে যান। তাঁরা এই আমলকে নিয়ে যখন তৃতীয় আসমানে উপনীত হন, তখন প্রহরী ফেরেশতা বলেন, দাঁড়াও; এই আমল আমলকারী ব্যক্তির চেহারা উপর নিক্ষেপ কর, আমি (তাকাব্বরী) দাম্ভিকতার দায়িত্ববান ফেরেশতা; আমার রব আদেশ করেছেন যাতে দাম্ভিক লোকদের আমল আমাকে অতিক্রম করে উপরে আরোহণ করতে না পারে।

অতঃপর বাহক ফেরেশতাগণ এমন এক ব্যক্তির এবাদত নিয়ে উপরে আরোহণ করতে থাকেন, যার যিকর-আযকার, নামায, রোজা, হজ্বের আমল উজ্জ্বল নক্ষত্রের ন্যায় জ্বলছে এবং এসব এবাদতের গুণগুণ আওয়াজ শ্রুত হচ্ছে। ফেরেশতাগণ এ আমল নিয়ে চতুর্থ আসমানে উপস্থিত হলে প্রহরী ফেরেশতা বলেনঃ দাঁড়াও, এসব আমল সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির মুখে, পেটে এবং পিঠে নিক্ষেপ কর, আমি উজবের (গর্ব, আত্মসমর্থন বা নিজেকে খুব ভাল মনে করার) অপরাধীর দায়িত্ববান ফেরেশতা, আমার প্রভু আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন, যাতে এই পাপকার্য আমাকে অতিক্রম করে পরবর্তী আসমানে যেতে না পারে; এই ব্যক্তি যখনই কোন আমল করেছে, তাতে উজব স্থান পেয়েছে।

অতঃপর বাহক ফেরেশতাগণ অপর একজনের এবাদত নিয়ে উর্ধ্বারোহন করেন, যখন পঞ্চম আসমানে পৌছেন, তখন মনে হয় এই আমল এমনভাবে সজ্জিত ও অলংকৃত, যেমন কনেকে তার বরের কাছে নেওয়া হচ্ছে। এই আসমানের দায়িত্বপ্রাপ্ত ফেরেশতা বাহকদেরকে বলেনঃ থাম, এই আমল সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির মুখের উপর মার এবং তার ঘাড়ের উপর চাপিয়ে দাও, আমি হিংসার ভারপ্রাপ্ত ফেরেশতা; সে তার সমকক্ষ অন্যান্য শিক্ষার্থী এবং আমলকারীদের প্রতি হিংসা করতো, এবাদতে কোন ব্যক্তি উন্নত হলে, অথবা সমাজে কেউ কোন বিষয়ে শ্রেষ্ঠ হয়ে উঠলে, তার প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করতো এবং তাদের ক্ষতি সাধন করতো, এই ব্যক্তির আমল আমাকে অতিক্রম করে উপরে যেতে না পারে, সে জন্য আমার রব আমাকে হুকুম

করেছেন। অতঃপর বাহক ফেরেশতাগণ এক ব্যক্তির নামাজ, যাকাত, জিহাদ ও রোজা নিয়ে উপরে আরোহন করেন; এসব আমল সূর্য কিরণের মত চমকিতে থাকে, তাঁরা যখন ষষ্ঠ আসমানে পৌঁছেন, তখন দায়িত্ববান ফেরেশতা তাদের বলেন, দাঁড়াও এবং এসব আমল আমলকারী ব্যক্তির মুখের উপর মার, কোন দুঃস্থ পীড়িত বান্দার উপর তার কোন দয়া-মায়া ছিল না; বরং অপরের দুরাবস্থায় সে উল্লাসে মেতে উঠতো। আমি রহমতের ফেরেশতা, প্রভু আমাকে হুকুম করেছেন, তার আমল যেন আমাকে অতিক্রম করে উপরে উঠতে না পারে।

অতঃপর বাহক ফেরেশতা অপর এক বান্দার রোজা, নামাজ, দান-খয়রাত, জিহাদ ও তাকওয়ার আমল নিয়ে উপরে আরোহন করেন; এসব আমল মৌমাছির গুঞ্জরণের মত আওয়াজ করতে থাকে, সূর্য কিরণের ন্যায় আলোক রশ্মি বিচ্ছুরণ করতে থাকে এবং সঙ্গে তিন হাজার ফেরেশতা থাকেন; তারা এই আমল ও এবাদত নিয়ে সপ্তম আসমানে উপনীত হন, তখন নিয়োজিত ফেরেশতা বলেনঃ দাঁড়াও, এসব আমল সে ব্যক্তির মুখের উপর নিক্ষেপ কর, এগুলো দ্বারা তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে আঘাত কর এবং এ দিয়ে তার অন্তর তালাবদ্ধ করে দাও, যেসব আমল আল্লাহকে ছাড়া কোন গায়রুল্লাহর উদ্দেশ্যে করা হয়, আমি সেগুলোকে আমার প্রভুর নিকট যাওয়া থেকে ফিরিয়ে রাখি, এ আমল ও গায়রুল্লাহর উদ্দেশ্যে করা হয়েছে। সে বিজ্ঞ লোকদের মধ্যে সুনাম অর্জনের জন্য, আলেমদের মধ্যে মর্যাদা লাভের জন্য এবং লোকজনের মধ্যে সুনাম অর্জনের জন্য, আলেমদের মধ্যে মর্যাদা লাভের জন্য এবং লোকজনের নিকট পরিচিত হওয়ার জন্য এ আমল করেছে, প্রভু আমাকে হুকুম করেছেন, যাতে এ আমল আমাকে অতিক্রম করে উপরে উঠতে না পারে। যেসব আমল ও এবাদত নিষ্ঠার সাথে একান্তভাবে আল্লাহর উদ্দেশ্যে করা হয় না, সেগুলো রিয়া এবং আল্লাহ রিয়াকারীদের এবাদত কবুল করেন না।

অতঃপর আমল বহনকারী ফেরেশতাগণ আরেকজন বান্দার নামাজ, যাকাত, রোজা, হজ্ব, উমরা, উন্নত চরিত্র, ধ্যানমগ্নতা ও যিকরুল্লাহর আমল নিয়ে অগ্রসর হন, সঙ্গে সাত আসমানের ফেরেশতাগণ থাকেন, তারা আল্লাহর দরবারে পৌঁছার পর সকল পর্দা অতিক্রম করে দন্ডায়মান হয়ে আবেদ ব্যক্তির সকল সনিষ্ট এবাদত সম্পর্কে সাক্ষ্য দেন, তখন আল্লাহ তায়ালা বলেন ঃ তোমরা আমার বান্দার আমলের তত্ত্বাবধায়ক, আর আমি তার অন্তর্যামী; এসব এবাদত সে আমার উদ্দেশ্যে করে নাই; অন্য কারো উদ্দেশ্যে করেছে, তার উপর আমার অভিশাপ। ফেরেশতাগণ বলেন, তার উপর আমাদেরও অভিশাপ, অনুরূপ সাত আসমানের সকল ফেরেশতা এবং তথাকার সবকিছু তাকে অভিশাপ দিবে।

এ পর্যন্ত বর্ণনা করে হযরত মুআয (রাঃ) অনেক বেশী কাঁদলেন এবং বললেনঃ ইয়া রাসুলুল্লাহ! আপনি আল্লাহর রাসূল আর আমি অসহায় মুআয, আপনি বলে দিন, এই বিপদ থেকে আমি নিজেকে কিভাবে বাঁচাতে পারি? প্রিয় নবী (সাঃ) ইরশাদ করলেন, আমার অনুসরণ কর, যদিও তোমার আমল ও এবাদতে ত্রুটি থাকে। হে মুআয! তোমার যবানকে হিফাযত কর, বিশেষ করে কুরআনের বাহকদের সমালোচনা ও নিন্দাবাদ থেকে বেঁচে থাক, তোমার অপরাধ অন্যের উপর চাপিয়ো না; নিজেকেই দোষী জ্ঞান কর, অন্যের প্রতি দোষারোপ না করে নিজে অপরাধে লিপ্ত হওয়া থেকে বাঁচতে চেষ্টা কর এবাদতের কাজে দুনিয়াবী স্বার্থের সংমিশ্রণ ঘটায়োনা। আমলে রিয়া করো না।, সমাজে দম্ভ করোনা, এতে মানুষ তোমার অসৎ চরিত্রের কারণে তোমাকে এড়িয়ে চলবে। একজনের সম্মুখে অন্যজনের তুলনায় অতিরঞ্জিত করো না; এতে তোমার দুনিয়া ও আখেরাত উভয়টাই বরবাদ হবে, কথার দ্বারা মানুষের অন্তরে দুঃখ দেবেনা; তাহলে হাশরের দিন জাহান্নামের কুকুর তোমাকে টুকরা টুকরা করে ফেলবে, আল্লাহ্ বলেন, "কসম তাদের, যারা টেনে বের করে।" (নাযিআতঃ২)

হে মুআয! তুমি কি জান যারা টেনে বের করে তারা কি? আমি বললামঃ ইয়া রাসূলুল্লাহ (সাঃ)! আপনার উপর আমার মা-বাপ কুরবান হোন, তারা কি? তিনি বললেনঃ সেগুলো জাহান্নামের কুকুর, হাড় থেকে মাংস টেনে খসায়। আমি বললাম হে, আল্লাহর রাসূল (সাঃ)। আমার মা-বাপ আপনার উপর কুরবান হোন, কে এসব সদগুণ অর্জন করতে সক্ষম হবে এবং কে এসব কুকুর থেকে রক্ষা পাবে? তিনি বললেনঃ এটা মুলতঃ তার পক্ষেই সহজ হবে, যাকে আল্লাহ্ পাক তওফীক দিবেন, তোমার জন্য যথেষ্ট হবে, যদি নিজের জন্য যেটা ভালবাস অপরের জন্যেও সেটা ভালবাসতে পার। তাহলেই হে মুআয! তুমি নিস্কৃতি পেতে পার।"

## আল্লাহর রাহে নিবেদিত প্রাণ এক যুবক

আফগান পার্শ্ববর্তী দেশের (পাকিস্তান) এক যুবক। মাতা-পিতার একমাত্র সন্তান। খুব ধ্বনী পরিবারের লোক। মা-বাবার সবরকম স্বপ্নসৌধ গঠিত হচ্ছে তাকে নিয়েই। অন্তরের সকল ভালবাসা যেন শুধু তার জন্যেই। আব্বা কোথাও হতে বাড়ী ফিরলেই আদরের সূরে ডাক দেয় একমাত্র সন্তানকে।

আফগান জিহাদ শুরু হলে তার নিকট দাওয়াত পৌঁছে। এক পর্যায়ে তার মধ্যে জিহাদের পূর্ণ আকাঙ্খা জাগে। সিদ্ধান্ত নিল জিহাদ করতে যাবে, মা'কে বলল আম্মা আমি আফগানিস্তানে জিহাদ করতে যাব। সেখানে রুশ ভল্লুকদের দল

আফগানি মা-বোনদের সম্ভ্রম নষ্ট করে দিচ্ছে। তাদের ইজ্জত আবরুর হেফাজতের জন্য আমাদের উপর জিহাদ ফরজ। আম্মা বললঃ বাবা তুমি আমার একমাত্র কলিজার টুকরো ছেলে, তুমি যদি সেখানে চলে যাও তো আমি কিভাবে থাকব? তোমার শোকে আমি মরে যাব। এই বলে আম্মা অনুমতি দিল না। যুবক এবার গেল আব্বার কাছে , বললঃ আব্বা আমি আফগানিস্তানে জিহাদে যোগ দেব। সেখানে রুশ লাল বাহিনীরা কোরআনের পাতাকে প্রস্রাবের ঢিলা হিসেবে ব্যবহার করতেছে। আব্বা বললঃ বাবা! তুমিই আমার একমাত্র ছেলে, তোমার জন্যই এত কিছু করছি যাতে তুমি বিলাসিতাপূর্ণ জীবন-যাপন করতে পার। যদি তুমি চলে যাও, তবে এসব ধন-সম্পদের মালিক কে হবে? এই বলে পিতাও অনুমতি দিল না। ঐ সব ধন-সম্পত্তির প্রতি কিন্তু তার কোন লোভ নেই। যুবক এবার বুঝতে পারল যে, এভাবে জিহাদে যাওয়া যাবেনা, অতএব বিনা অনুমতিতেই চলে যেতে হবে। এ সিদ্ধান্তের উপর অল্প দিনের মধ্যেই প্রস্তুতি নিয়ে নিল। স্বপ্রস্তুত গিয়ে সীমান্তে এক মুজাহিদ দপ্তরে অবস্থান নিল। টাকা, নিজের ছবি ও ঠিকানা সমূহ জমা দিয়ে রওয়ানা হল আফগানিস্তানে। সেখানে কিছুদিন প্রশিক্ষণে কাটানোর পর এক অপারেশনে অংশ নেয় এবং একপর্যায়ে শহীদ হয়ে যায়।

এদিকে কোটিপতি পিতা সাপ্তাহিক ছুটিতে বাড়ি আসল, এসেই স্বাভাবিক নিয়মে আদূরে সন্তানকে ডাক দিল কোন সাড়া শব্দ নেই। ভিতর থেকে মা বেরিয়ে আসল বললঃ আজ কদিন ধরে সে ঘরে আসছেনা, মনে করেছিলাম আপনার ওখানে গেছে। পিতা বললঃ আমার কাছে তো যায়নি!! তাহলে এখন সে কোথায়? অতিসত্তর সকল আত্মীয়-স্বজনের কাছে ফোন করা হয়; জানা গেল সেখানেও যায়নি। মোটা অংকের টাকা পুরস্কার ঘোষণা সহ দৈনিক পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হল। আম্মা পাগল হয়ে গেছে একমাত্র কলিজার টুকরো ছেলের জন্যে। সকল প্রকার চেষ্টা চালিয়েও ব্যর্থ হল আব্বা। কোথাও খোঁজ পাওয়া গেল না। এবার আব্বাও পাগল হয়ে গেছে। ঘরে ঢুকছেনা, খানা-পিনা বন্ধ, মুখে একটাই শব্দ উচ্চারিত হচ্ছে- "আমার ছেলে কোথায় গেছে- আমার ছেলে কোথায় গেছে? এবার পূর্ণ পাগলের মতো হন্যে হয়ে ঘুরছে পথে-প্রান্তরে। কেউ প্রশ্ন করল- আপনার নাম কি? সে বললঃ আমার ছেলে কোথায় গেছে? বলা হয়- তার বয়স কত? সে বললঃ আমার ছেলে কোথায় গেছে? এরূপ বলতে বলতে সে অন্যত্র চলে গেল। এভাবে অনেকদিন অতিবাহিত হয়ে গেল। এই পাগল পিতা ঘুরতে ঘুরতে এবার এসে

পৌঁছল সীমান্তের একটি দপ্তরে। সেখানের আঙ্গিনায় শোকার্ত এবং ক্ষুধার্ত দুই অবস্থার প্রতিক্রিয়ায় বেহুশ হয়ে পড়ে গেল। এদিকে দপ্তর কর্মীরা এসে তাকে কোন প্রকারে হুশ করল। অতঃপর তার সামনে কিছু খানা আনা হলে ক্ষুধার তাড়নায় অনায়াশে খেয়ে ফেলল। এবার তাকে জিজ্ঞাসা করা হল- আপনার নাম কি? বললঃ আমার ছেলে কোথায় গেছে? বলা হল, আপনার ছেলের নাম কি? বললঃ আমার ছেলে কোথায় গেছে? দপ্তর কর্মীদের বুঝতে বাকী রইল না যে, সে ছেলের জন্যে পাগল হয়ে গেছে। কর্মীরা তাকে আফগানিস্তানে জিহাদে অংশ গ্রহণকারীর ছবিগুলো একেক করে দেখাতে লাগল। এবার তার সমানে ভেসে উঠলো আদূরে ছেলের নূরানী ছবি। ছবি দেখে ঝটকা মেরে ওটি কেড়ে নিল এবং বেহুশ হয়ে গেল। আবার তাকে হুশ করা হল এবং বলা হল একি আপনার ছেলের ছবি? সে বললঃ হ্যাঁ এই আমার ছেলে, কিন্তু সে এখন কোথায়? বলা হল, সেতো আফগানিস্তানে জিহাদে শহীদ হয়েছে আজ প্রায় ৬ মাস হয়ে গেছে। এখনতো সে জান্নাতে চলে গেছে। "শহীদ হয়েছে" শব্দটি শুনামাত্র আবার বেহুশ হয়ে গেল। অতঃপর তাকে হুশ করা হলে সে বলতে লাগল, না সে শহীদ হয়নি, মরে গেছে; শহীদ হয়নি মরে গেছে। এখন সে শুধু একথারই যিকির করছে। বলা হল- এমন কেন হবে? সে বলল- কারণ ছেলেতো আমার ও তার আম্মার অনুমতি ছাড়া জিহাদে গেছে। আবার বলল যে-তাহলে আমি তাকে পরীক্ষা করব। সালাম দিব, যদি সে সালামের জবাব দেয়, তাহলে বুঝতে পারব সে শহীদ হয়েছে। অন্যথায় নয়। এবার তাকে শহীদের গোরস্থানে নেওয়া হল। পিতা সেখানে গিয়ে পুত্রের কবরের সামনে দাঁড়িয়ে আছে, এদিকে নয়ন ভরে অশ্রুর বন্যা বয়ে যাচ্ছে। এভাবে দীর্ঘক্ষণ পর সে "আসসালামু আলাইকুম ওয়ারাহমাতুল্লাহ" বলে সালাম দিল সাথে সাথে শহীদ পুত্র; পিতার সম্মুখে সালামের জবাবে দু'হাত বাড়িয়ে দিল। এমনি মুহুর্তে পিতা, শহীদ পুত্রের দু'হাত বুকে জড়িয়ে ধরে আবার বেহুশ হয়ে গেল। অসংখ্য মানুষ পিতা-পুত্রের একরুণ দৃশ্য দেখে শোকাবিভূত হল। অনেক্ষণ পর শহীদ পুত্র-পিতাকে শান্তনা দিয়ে আপন হাত গুটিয়ে নিল। পিতার হুশ ফিরে এল এবং আপন অন্তর শান্ত হল অতঃপর বাড়িতে ফিরে এসে শহীদের আম্মাকেও শান্তনা দিল। চিন্তা করুন আমরা কোথায়!!?

——— ০ ———

# প্রচলিত নির্বাচনঃ
# ইসলাম প্রেক্ষিত নয়

# ভূমিকা

বড় পরিতাপের বিষয়-সুদীর্ঘ ৫০০ বছর ধরে 'ইসলাম'- এর বিভিন্নরূপ ব্যাখ্যায় মানুষ আজ দিকভ্রান্ত। যে যেই সেক্টরে কাজ করছে ঐ সেক্টরেই ইসলামকে সীমাবদ্ধ করে রাখছে। তাই সত্যের অনুসন্ধানীরাও ইসলামের স্বকীয় আদর্শকে খুঁজে পাচ্ছে না। সত্যের অনুসন্ধান করতে গিয়ে পুস্তক অধ্যয়ন করলে দেখা যায়; হয়তা নির্দিষ্ট একটি রাজনৈতিক দলের, যেখানে তারা ইসলামের দৃষ্টিতে জায়েয হওয়াকে প্রমাণ করছে। না হয় কেউ গণতন্ত্রকে ইসলামের পোষাক পরিয়ে জায়েয করছে। এভাবে সূফী বাদের বই পুস্তকও। আবার অনেক বই-পুস্তক তাত্ত্বিকভাবে পর্যালোচনা করলে দেখা যায় একই পুস্তকে স্ববিরোধী আলোচনা। আমি নিজেও বিভিন্ন ইসলামী আন্দোলনের সাথে সময় অতিবাহিত করে এক পর্যায়ে তার উৎসমূল খুঁজে পেলাম। বিভ্রান্ত ও অনৈক্যের একমাত্র হাতিয়ার এই তথাকথিত "গণতন্ত্র"। অতঃপর শুধুমাত্র গণতন্ত্র নিয়ে গবেষণা শুরু করলাম। দীর্ঘ ৩ বছর পর এর গোপন ভেদ সমূহ বুঝতে পেলাম এবং কোরআন ও হাদীসের মান-দন্ডে বিচার করে পেলাম, ইহা শিরক ও কুফর ছাড়া কোন রেজাল্ট দেয়না। তাই কোন ইসলামী আন্দোলনের কর্মী বা নেতার জন্য ইহা হেকমত নামেও অনুসরণ যোগ্য পদ্ধতি নয়- হতে পারে না। এক পর্যায়ে "আল্লাহর আইনের শাসন" নামে একটি বইয়ে পেলাম যে, লেখক প্রচলিত নির্বাচনকে খোড়া যুক্তির নিরীখে জায়েয করে দিয়েছেন। উহার প্রতিটা ছত্র যখন আমি কোরান-হাদীসের কষ্টি পাথরে নিক্ষেপ করলাম তখন এর অসারতা এবং ভিত্তি হীনতার প্রমাণ বের হয়ে আসল। ইসলামী আন্দোলনের কর্মীগণের সমীপে আমার এই লেখা শুধুমাত্র দাওয়াত হিসেবে উপস্থাপন করলাম। পরিশেষে এটাই নিতান্ত সত্য যে, আমি কোন পেশাদার লেখক নই এবং প্রাগুক্ত পুস্তিকার লেখকের সাথে আমার কোন ব্যক্তিগত শত্রুতামীও নেই। আল্লাহ আমাদেরকে সত্য তথা কোরান-হাদীস বুঝে সে মতে আমল করার তৌফিক দান করুন, আমিন। ছুম্মা আমিন।

নালায়েক
ইবনে মোস্তাক

লেখকের লিখিত পুস্তকের (আল্লাহর আইনের শাসন) সর্বশেষ অধ্যায়টিতে যে প্রচলিত ব্যালট পেপার কেন্দ্রীক নির্বাচন কে জায়েয প্রমাণ করেছেন, তা' নিয়ে আমি একটু পর্যালোচনা করতে চাই। আমার কথা হলো দু'টি মন্দ জিনিস ও আর একটি ভাল জিনিস[১] এর মধ্যে আমাকে তৃতীয়টিই গ্রহণ করতে হবে।

লেখকের আলোচনার প্রথম দিকে আমার প্রশ্ন হল রাষ্ট্রপতি নির্বাচন ও মজলিশে শুরা গঠন কি ইসলামী হুকুমাত প্রতিষ্ঠার জন্যে? নাকি গতানুগতিক পার্টি গুলোর রাষ্ট্র পরিচালনায় সুবিধার জন্যে? যদি ইসলামী হুকুমাত প্রতিষ্ঠার জন্যে হয় তাহলে "কিন্তু সঙ্গঁত কারণে প্রশ্ন উঠতে পারে, নির্বাচনের পদ্ধতি কি হবে?" উল্লেখিত প্রশ্নটি অবান্তর। কেননা প্রচলিত পশ্চিমা গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে যে নির্বাচন হয়, এর দ্বারা এক মিনিটের জন্য ও ইসলামী হুকুমাত প্রতিষ্টা হতে পারেনা। যদি গতানুগতিক পার্টি গুলোর রাষ্ট্র পরিচালনার সুবিধার জন্যে হয়, তাহলে প্রচলিত নির্বাচন পদ্ধতি ঠিক আছে।

অতঃপর তিনি লিখেছেন,"পাশ্চাত্য গণতন্ত্রের মাধ্যমে প্রচলিত নির্বাচন পদ্ধতি ইসলামী চিন্তা-চেতনার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ না হলেও পুরো সংঘর্ষিক ও নয়"।

আমি বলব-পাশ্চাত্য-গণতন্ত্রের মাধ্যমে প্রচলিত নির্বাচন পদ্ধতি ইসলামী চিন্তা-চেতনার সাথে যেমন সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়, তেমনি সম্পূর্ণ সাংঘর্ষিক ও। প্রচলিত নির্বাচনে চোর, ডাকাত, হাইজ্যাকার, ঘুষখোর, মদখোর,বেবিচারী ও ফাসেক যেমন ভোটাধিকার পায়, তেমন একজন মুফ্তি, মুহাদ্দিস, মুফাচ্ছের, পীর, ডক্টর, ইঞ্জিনিয়ার, ডাক্তার ও অধ্যাপক সে ভোটাধিকার পায়। অথচ এ দু' পর্যায়ের মানুষের চিন্তাধারা কি কখনো এক হতে পারে? কখনো পারে না। কিন্তু পাশ্চাত্য গণতন্ত্র এই উভয় পর্যায়ের মানুষকে একই দৃষ্টিতে গণনা করতে চায় এবং একই মান মর্যাদা দিতে চায়, যা শরীয়ত অনুমোদন দেয় না। কেননা দৃষ্টিমান ও দৃষ্টিহীন, জ্ঞানবান ও জ্ঞানহীন, তাক্ওয়াবান ও তাকওয়াহীন, মানুষ কখনো সমান হতে পারে না, এটা কোরআনের ভাষ্য। হাদীস দ্বারাও একথা প্রমাণ পাওয়া যায় যে, রায় বা পরামর্শ দানের অধিকার আছে শুধুমাত্র সৎ ও জ্ঞানীদের, অসৎ ও নির্বোধদের নয়।

(১) আরেকটি ভাল জিনিস বলে-এখানে জিহাদের (সশস্ত্র জিহাদ) দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে।

"খতীব বাগদাদী, হযরত আলী মুর্তজা (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন আমি রাসূলুল্লাহ (সাঃ) কে জিজ্ঞেস করলাম, আপনার অবর্তমানে আমরা যদি এমন কোন সমস্যার সম্মুখীন হই যাতে কোরআনের কোন ফয়সালা নেই, আপনার পক্ষ থেকে ও কোন ফয়সালা না পাই, তবে আমরা সে ব্যাপারে কি করব আমাদের হুকুম দিন। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) জবাবে বলেন ঃ এর জন্য আমার উম্মতের উলামা ও ইবাদতকারীদের একত্রিত করবে এবং পারস্পরিক পরামর্শের ভিত্তিতে কর্তব্য স্থির করবে কারো একক মতে ফয়সালা করোনা"। (কানযুল উম্মাল ৫ম খন্ড-৮-১২ পৃষ্ঠা)

হুজুরে (সাঃ) একজন সাহাবীকে সম্বোধন করে বলেন "হে আব্দুর রহমান তুমি নেতৃত্ব চেয়ে নিওনা"। আল্লামা তকী উসমানী বলেন এ হাদীসে থেকে একথা সুস্পষ্ট হয়ে যায় যে, বর্তমান গনতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় নির্বাচনের প্রাক্কালে প্রার্থী যে ভাবে নিজেকে পেশ করে তা ইসলাম অনুমোদন করে না। [তাক্মেলায়ে ফাত্হুল মুলহিম ৩য় খন্ডঃ ২৯৫ পৃঃ।]

অপরদিকে ইসলাম যে নির্বাচনকে স্বীকৃতি দেয় তাতে কোন প্রার্থী থাকতে পারবেনা এবং কেউ প্রার্থী সেজে ভোট ভিক্ষা করতে পারবেনা। জনগণই বেছে নেবে তাদের প্রতিনিধি কাংখিত দ্বীনদার, তাক্ওয়াবান, জ্ঞানী ও বিচক্ষণ মানুষটিকে এবং এই শ্রেণীর প্রতিনিধিদের নিয়ে মজলিশে শূরা ( জাতীয় সংসদ) গঠিত হবে সেখানে বিরোধী দল বলে কোন মুসলমানের দল থাকবেনা। আর ঐ শূরার সদস্যগণই তাঁদের মধ্য থেকে একজনকে খলীফা মনোনীত করবেন। অতঃপর দেশের সকল জনসাধারণ ঐ খলিফার হাতে আনুগত্যের বাই'য়াত গ্রহণ করবেন। নির্বাচন পদ্ধতি যদি এরূপ হয়, তাহলেইতো ইজমায়ে সাহাবা মানা হয়।

তিনি বলেছেন- "একব্যক্তি এক ছোট, প্রাপ্ত বয়স্ক ভোটাধিকার আধুনিক বিশ্বের বিভিন্ন রাষ্ট্রে স্বীকৃত ও সাংবিধানিক নিয়ম"।

আচ্ছা বলুনতো উল্লেখিত আধুনিক বিশ্বের রাষ্ট্রগুলোতে কি ইসলামী হুকুমাত চালু আছে? ঐ রাষ্ট্রগুলোর সংবিধান কি ইসলামী রাষ্ট্রের সংবিধানকে স্বীকৃতি দেয়? ঐ রাষ্ট্রগুলোর সংবিধান কি ঐশী আইন দ্বারা প্রবর্তিত? তা' না হলে ঐ রাষ্ট্রগুলোকে তিনি কিভাবে মডেল হিসেবে গ্রহণ করলেন? আল্লাহর আইনের শাসন তো শুধুমাত্র আফগানিস্তানের সংবিধানকে স্বীকৃতি

দেয় অতএব এটাই আমাদের তথা বর্তমান মুসলিম উম্মাহ্‌র মডেল।

আর একটু ভেবে দেখুন "এক ব্যক্তি একভোট প্রাপ্তবয়স্ক ভোটাধিকার" এটা হচ্ছে গণতন্ত্রের মূল দর্শন থেকে অনুসৃত যেখানে মানুষকে সার্বভৌমত্বের মালিক বানানো হয়েছে। বলা হচ্ছে এ সার্বভৌমত্বের কেবল মাত্র ভোট দানের মাধ্যমেই কার্যকর হতে পারে। দ্বিতীয়তঃ ভোটদাতাদের ভোটে নির্বাচিত ব্যক্তিরা তথা সংখ্যাগরিষ্ট সদস্যরাই সার্বভৌম, কিন্তু বাস্তবক্ষেত্রে তাদের নেতাই আইনগত সার্বভৌমত্বের মালিক হয়ে থাকে। ইহা আধুনিক বিশ্বের বিভিন্ন রাষ্ট্রে স্বীকৃত হলেও ইসলাম একে স্বীকৃতি দেয় না। প্রতিনিধি পরিষদ যদি সার্বভৌম হয়, তাহলে আল্লাহর সার্বভৌমত্বের প্রতিনিধিত্ব কে করবে?

তিনি লিখেছেন-"ভোট ছাড়া কেবল মনোনয়নের মাধ্যমে মজলিশে শূরা তথা জাতীয় সংসদ গঠন জায়েয হলেও বর্তমান যুগে এর দ্বারা একনায়কতান্ত্রিক ও স্বৈরতান্ত্রিক শাসন চালু হবার পথ উম্মুক্ত হওয়ার সমূহ আশংকা থেকে যায়"।

আমি বলব- "পাশ্চাত্য গণতন্ত্রের মাধ্যমে প্রচলিত নির্বাচন প্রদ্ধতি দ্বারাই একনায়কতান্ত্রীক ও স্বৈরতান্ত্রিক শাসন চালু হবার পথ উম্মুক্ত হয় সম্পূর্ণরূপে, শুধু আশংকা নয়।"

আপনি দেখুন শেখ মুজিব প্রচলিত নির্বাচন পদ্ধতি দ্বারা প্রেসিডেন্ট হয়েইতো একনায়কতন্ত্র চালু করেছিল। শুধু মাত্র শেখ পরিবারই প্রেসিডেন্ট হওয়ার অধিকার পাবে। প্রতিষ্ঠা করেছিল "বাকশাল"। সকল ইসলামী দল নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছিল আরও কত কি করেছিল। আরও দেখুন, প্রেসিডেন্ট এরশাদও প্রচলিত নির্বাচন পদ্ধতিতে ক্ষমতায় এসেছিল, অতঃপর চালু করেছিল স্বৈরতান্ত্রিক শাসন। এসব খুব দেরীর ঘটনা নয়, অতএব ভুলে যাওয়ার ও কথা নয়। সুতরাং প্রমাণ হলঃ "পাশ্চাত্য গণতন্ত্রের মাধ্যমে প্রচলিত নির্বাচন পদ্ধতির দ্বারা একনায়কতান্ত্রিক ও স্বৈরতান্ত্রিক শাসন চালু হবার পথ উম্মুক্ত হয় সম্পূর্ণ রূপে"।

এতো গেল বাস্তবতার কথা আর ইসলামের দৃষ্টিতে বিশ্লেষণ করলে ও লেখকের উক্ত বক্তব্যের অসারতা সন্দেহাতীত ভাবে পরিস্কার হয়ে উঠবে। কেননা একনায়কতন্ত্র ইসলামের দৃষ্টিতে ফেক্টর নয়। দেখার বিষয় হল

ইসলামী অনুশাসন পুরোপুরিভাবে চলছে কিনা? আধুনিক রাষ্ট্র বিজ্ঞানে একনায়কতন্ত্রের যে সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে, সেটাতো দৃশ্যত ইসলামী শাসন ব্যবস্থার উপরও প্রযোজ্য। তাই বলে আমরা কি ছেড়ে দিতে পারি? আজকে তালেবান সরকারকে কি কেউ গণতান্ত্রিক বলছে? আমরাতো আরেকটু আগে বেড়ে প্রশ্ন করতে চাই যে, যে স্বৈরতন্ত্রের আশংকা তিনি ব্যক্ত করেছেন গণতন্ত্র কি তার থেকে কম বিভৎস এবং কম ভয়ংকর? তিনি লিখেছেন, "হযরত আবুবকর (রাঃ) হযরত ওমর (রাঃ) হযরত ওসমান (রাঃ) ও হযরত আলী (রাঃ)'র মতো মুসলিম উম্মাহর শ্রদ্ধাভাজন শাসকবৃন্দ কর্তৃক মনোনীত ব্যক্তিগণকে নিজেদের প্রতিনিধি হিসেবে মনেনিতে তখনকার মুসলমানগণ প্রস্তুত ছিলেন। কিন্তু আধুনিক যুগে এমন সর্বজন শ্রদ্ধেয় আস্থাভাজন শাসক পাওয়াতো রীতিমত মুশকিল যাদের মনোনীত ব্যক্তিকে রাষ্ট্রপতি অথবা সাংসদ হিসেবে মেনেনিতে জাতি একমত হবেন"। আমাদেরকে চিন্তা করতে হবে এমন কেন হল? সর্বজন স্বীকৃত কোন শাসক পাচ্ছিনা এবং সর্বজন শ্রদ্ধেয় কোন প্রতিনিধি পাচ্ছিনা কেন? এ বিষয়ে চিন্তা করলে দেখা যায়, আমরা ইসলামের স্বকীয় আর্দশ থেকে সরে গিয়ে পাশ্চাত্যবাদী ধ্যান ধারনায় বিকার গ্রস্থ। আমরা চাই যে, পাশ্চাত্য মতাদর্শে জনগণের প্রতিনিধি হই এবং শাসক হই। তখন আমাদেরকে নির্বাচনে অংশ নিতে হয়। মানুষের কাছ থেকে ভোট নেওয়ার জন্য নির্বাচনী প্রচারনা সভায় অর্থাৎ গণসংযোগ করে তাদের নিকট "আকাশের চাঁদ হাতে তুলে দেওয়ার মিথ্যা ওয়াদা করে থাকি"। অতঃপর নির্বাচন শেষে আমরা ওয়াদা পূর্ণ করতে অক্ষম হই, ফলে মানুষের আস্থাহারা হয়ে যাই, এভাবে চলে আসছে দীর্ঘকাল। অতএব এমন করে মুসলিম উম্মাহর শ্রদ্ধাভাজন প্রতিনিধি হওয়া দুঃসাধ্য। অথচ আমাদেরকে চিন্তা করার কথা ছিল এই যে, ইসলাম পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা। সুতরাং ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা থেকে শুরু করে রাষ্ট্র পরিচালনা ও উম্মাহর শ্রদ্ধাভাজন শাসক বা প্রতিনিধি নির্বাচনের কর্মসূচীও ইসলামের নিজস্ব আছে।

আফগানিস্থান থেকে আমরা এ শিক্ষা গ্রহণ করতে পারি। সিব্‌গাতুল্লাহ মুজাদ্দেদী, বুরহানুদ্দিন রব্বানী, গুলবুদ্দিন হেকমতিয়ার, আব্দুর রশীদ দোস্তাম, আহমাদ শাহ মাসুদ গংদের মত প্রতিনিধিরা প্রচলিত নির্বাচনের

মাধ্যমে প্রতিনিধিত্ব করেছিল। কিন্তু জনগণের আস্থাভাজন হতে পারেনাই। শরয়ী অনুশাসন চালু করতে পারে নাই। শেষ পর্যন্ত ইসলামের নিজস্ব কর্মসূচী নিয়ে ময়দানে আসলেন "তালেবানগণ"। প্রতিষ্ঠা করলেন পূর্ণাঙ্গ ইসলামী হুকুমাত, প্রতিনিধি বা শাসক হলেন উম্মাহর শ্রদ্ধাভাজন ব্যক্তিত্ব মোল্লা মুহাম্মদ ওমর মুজাহিদ। অথচ এর পূর্বে তাকে কেউই চিনত না।

সুতরাং আমরা যদি এই কর্মসূচী গ্রহণ করি যে, সর্বস্তরের মুসলমানদের কাছে জিহাদের দা'ওয়াত পৌঁছাই, উদ্বুদ্ধ করি আপোষহীন মরণপণ লড়াইয়ের প্রতি, অতঃপর সংগোপনে যুদ্ধের প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে নির্দিষ্ট সময় অতিবাহিত করার পর জিহাদের ঘোষণা দিই, তখন শুরু হবে বাতিলের বিরুদ্ধে মোকাবেলা, শেষতক প্রতিষ্ঠিত হতো ইসলামী হুকুমাত এবং আমরাও পেতাম এমন একজন শাসক যিনি হতেন সমস্ত মুসলিম উম্মাহর শ্রদ্ধাভাজন। সকল মুসলিম তখন তাঁর সিদ্ধান্ত মেনে চলতো। এবার চিন্তা করুন অধিকতর যুক্তি সংগত ব্যবস্থা কোন্‌টি। ইসলামের দেয়া কর্মসূচী "জিহাদ" নাকি পশ্চিমা কর্মসূচী ভোট বা নির্বাচন"?

তিনি লিখেছেন "বর্তমানে প্রচলিত নির্বাচন পদ্ধতি কিছুটা ত্রুটিপূর্ণ। প্রয়োজনীয় পরিবর্তনের মাধ্যমে এসব অনিয়ম সংশোধন করা যেতে পারে"।

আমি বলব বর্তমানে প্রচলিত নির্বাচন পদ্ধতি গোটা ত্রুটিপূর্ণ। ইসলামী হুকুমত প্রতিষ্ঠার আগ পযর্ন্ত এর কোনরূপ পরিবর্তন করা যাবেনা। আর পরিবর্তন আসলেও তাদ্বারা গণতন্ত্রের ফায়দা হবে, কিন্তু ইসলাম বা ইসলামী বিপ্লবের এক বিন্দুও ফায়দা আশা করা যায়না। তাছাড়া দেখা গেছে তত্ত্বধায়ক সরকারের অধীনে প্রয়োজনীয় শর্তাবলী আরোপ পূর্বক সংশোধিত নির্বাচনেও সৎলোক নির্বাচিত হতে পারে নাই। এবং প্রতিষ্ঠিত হয় নাই সৎলোকের শাসন। চলছে আগের মত জাল ভোট, ভোট ডাকাতি এবং ভোটারের অনুপস্থিতি ও ১০০% ভোট কাষ্ট (Cust)। প্রচলিত নির্বাচন পদ্ধতি যতদিন চালু থাকবে ততদিন "লাভের চাইতে ক্ষতির ভাগ বিরাট" বিরাজমান থাকবে। তিনি লিখেছেন "দু'মন্দ জিনিসের মধ্যে কম মন্দকে গ্রহণ"। আমি বলব শুধু দু'মন্দ জিনিস কেন আর একটি ভাল জিনিসওতো আছে, যা এ উভয় মন্দকে প্রতিরোধ করতে সক্ষম। সেটি হল "আল জিহাদ"। এদিকে শুরুতেও ইঙ্গিত করা হয়েছে।

তিনি লিখেছেন "লাভ অর্জনের পূর্বে ক্ষতির উৎসপথ আগে বন্ধ করা দরকার এবং ফ্যাসাদ ও মন্দের সব অবলম্বনকে প্রতিহত করা প্রয়োজন"।

দেখুন এই উভয় জিনিসের মূলোৎপাটনের মাধ্যম হল 'আল জিহাদ'। 'আল জিহাদ' ফ্যাসাদ নয় বরং ফ্যাসাদ রোধের হাতিয়ার।

সহী বুখারীর কিতাবুল ইলম থেকে উদ্ধৃতি দিয়েছেন- "এ অধ্যায়ে ঐ ব্যক্তির জন্য প্রমাণ পেশ করা হয়েছে যিনি অনেক ভাল জিনিসকে প্রত্যাখ্যান করেন এ উদ্দেশ্যে যে, কিছু লোক এর উপযুক্ততা অনুধাবন করতে পারবে না এবং এর চেয়ে আরো অধিকতর ক্ষতির সম্মুখীন হয়ে পড়বে"।

আপনার এ প্রমাণটি সেই আলেম লোকের জন্য প্রযোজ্য যে কিনা জিয়ারত করতে গেল কোন এক মাজারে, এর দ্বারা ঐ মাজার পূজারীরা দলীল পেশ করবে যে, ঐ আলেমও তো মাজার পূজা করে অতএব আমরা পারবনা কেন? কেননা মাজার পূজারীরা ঐ আলেমের কবর জিয়ারতের উপযুক্ততা অনুধাবন করতে পারলনা। কিন্তু জিহাদের বেলায় তা হবেনা। জিহাদের উপযুক্ততা অনুধাবন করতে পারবেনা অজুহাতে ফরজ তরক করা যায়না এবং ওয়াজিবও তরক করা যায় না। ব্যালট পেপার কেন্দ্রিক প্রচলিত নির্বাচন পদ্ধতির মাধ্যমে ইসলাম ক্বায়েম করার চেষ্টা করা মানে "অধিকাংশ মানুষে চাইলেই ইসলাম ক্বায়েম হবে এবং এর আহকাম সমূহ সর্বত্র চালু করা হবে"। অথচ ইসলাম মানুষের চিন্তা-চেতনার দ্বারা প্রবর্তিত কোন মতবাদ নয়। তাই তা প্রতিষ্ঠা করার জন্য মানুষকে সন্তুষ্ঠ করার প্রয়োজন নেই। অতএব এর যে কোন একটি আহ্কামের প্রতি অনীহা বা বিরোধ প্রকাশকারী শাস্তি ভোগ করবে। তাইতে শরীয়ত দন্ড বিধির ব্যবস্থা করেছে।

তিনি লিখেছেন- বর্তমানে প্রচলিত নির্বাচন পদ্ধতি(عرف عام)'সাধারণ প্রথায়' পরিণত হয়েছে এবং সাধারণ্যে প্রচলিত প্রথাই আইনের মর্যাদা লাভ করে। উদ্ধৃতি দিয়েছেন রসাইল ইবনে আবেদীন থেকে "রীতি ও প্রথা শরীয়তে গ্রহণ যোগ্য, একারণে যে, অনেক সময় এর উপরই ফয়সালা নির্ভর করে"।

তার এ আলোচনা নিতান্ত সত্য, কিন্তু আমাদের দেখতে হবে প্রচলিত প্রথার ভিত্তিপ্রস্থর কি। এ প্রচলিত প্রথা কি ইসলামী কৃষ্ঠি-কালচারের উপর

প্রতিষ্ঠিত, নাকি পশ্চিমাদের কৃষ্ঠি-কালচারের উপর প্রতিষ্ঠিত, যা মুসলিম উম্মাহর উপর জোরপূর্বক চাপিয়ে দেওয়া হয়েছিল? ইতিহাস সাক্ষী ইংরেজরাই আমাদের উপর বর্তমান প্রচলিত নির্বাচন পদ্ধতি চাপিয়ে দিয়ে গেছে, যা আজ সাধারণ প্রথায় পরিণত হয়েছে।

**প্রচলিত রাজনীতি ও তথাকতিত গণতান্ত্রিক নির্বাচন ঃ ইতিকথা**

১৬০১ সালে বৃটিশ বেনিয়ারা ভারত উপমহাদেশে আসে। ১৭৪০ সালে ৪টি বৃহৎ প্রদেশের গভর্ণরী লাভ করে। ১৭০২ সালে শাহ্ ওয়ালিউল্লাহ্ মোহাদ্দেসে দেহলভী (রহঃ) জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি বড় হয়ে দেখতে পান ইংরেজদের প্রভাব-প্রদিপত্তি চতুর্পাশে বিস্তার লাভ করেছে। শিক্ষা ব্যবস্থা তাদের, আইন-কানুন তাদের, সংস্কৃতি-সভ্যতা তাদের, ঘুষভিত্তিক চাকুরী ব্যবস্থা তাদের, সুদ-ভিত্তিা ব্যাংকিং ব্যবস্থা তাদের। চাকরীর দুয়ারে ইংরেজী ভাষার তালা ঝুলিয়ে দিয়েছে অর্থাৎ ইংরেজী ভাষা না জানলে না শিখলে চাকরী হবে না। এসব কিছুর বিরুদ্ধে দেহলভী (রঃ) ধীরে ধীরে মানুষকে বুঝাতে শুরু করলেন। এক পর্যায়ে যখন স্বাধীনতার জন্য বৃটিশ বিরোধী আন্দোলন ব্যাপক এবং তীব্রতর হয়ে উঠেছিল। তখন ইংরেজরা মনে করেছি এদেশে এমনএক ধরনের রাজনীতি চালু করা এবং রাজনৈতিক তৎপরতা চালানোর সুযোগ করে দেওয়া আবশ্যক, যা পেয়ে এদেশের জনগণ পরাধীন থেকেও নিজদের স্বাধীন মনে করতে থাকে। এমন এক রাজনৈতিক ঘোর প্যাঁচে তাদেরকে জড়িয়ে দেওয়া দরকার, যার জটাজালে বন্দী থেকেও তারা মনেকরবে, আমরা স্বাধীনতা পেয়ে গেছি। আমরা আমাদের নেতা নির্বাচন করে তাদের দ্বারা শাসিত হওয়ার এবং তাদের মাধ্যমে বৈষয়িক সুযোগ-সুবিধা ও চাকরি-বাকরী লাভের উপায় পাচ্ছি। সর্বোপরি তা হবে এমন এক রাজনীতি, যার মধ্যে লিপ্ত থেকে জনগণের প্রকৃত আস্থাভাজন, তাদের প্রকৃত কল্যাণকামী সত্যদর্শী ও যোগ্যতা সম্পন্ন ব্যক্তিরা নির্বাচিত হতে, জনগণের নেতৃত্ব দিতে এবং তাদের জাতীয় আদর্শ অক্ষুন্ন রাখতে সক্ষম হবে। এ উদ্দেশ্যে ইংরেজ সরকার ভারত শাসন আইন জারি করে। এই আইনের ভিত্তিতে কেবলমাত্র প্রাদেশিক পরিষদের নির্দিষ্ট সংখ্যাক সদস্য নির্বাচনে বিশেষ পরিমাণের 'কর' দাতাদের ভোট দানের সুযোগ দেওয়া হয়, কিন্তু তখনও সার্বভৌম ক্ষমতার মালিক ছিল বৃটিশ সরকার এবং সমগ্র

উপমহাদেশের উপর বৃটিশ সরকারের প্রতিনিধি হিসেবে বড়লাটেরই (অর্থাৎ- তাদের মানস পুত্র) একচ্ছত্র কর্তৃত্ব কার্যকর ছিল। প্রদেশ ভিত্তিক পরিষদ গঠনের জন্য ১৯৩৬ সনেই সর্বপ্রথম নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় ও দেশে বিশেষ পরিমাণ 'কর' দাতা ব্যক্তিরা তাতে ভোট দেওয়ার সুযোগ লাভ করে। এতে বিভিন্ন দল টিকেট (মনোনয়ন) দিয়ে নিজেদের দলীয় সদস্যদেরকে ভোট প্রার্থী হিসেবে দাঁড় করায়। তাদের জয়ী করার জন্য দলের পক্ষ থেকে বিপুল পরিমাণ অর্থ ব্যয় করা হয় এবং দলীয় কর্মী ও স্বেচ্ছাসেবী বাহিনী পাঠিয়ে ক্যান্‌ভাস করানো হয়। এভাবে বৃটিশ সরকার ইউরোপে প্রচলিত গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে ১৯৪৬ সালে প্রাদেশিক পরিষদ ভিত্তিক আরেকটি নির্বাচন দিয়ে মুসলিম জনশক্তিকে দ্বি-খন্ডিত করে দিল। স্বাধীন হল ২টি রাষ্ট্রে ভারত ও পাকিস্তান। কিন্তু নির্বাচিত ব্যক্তিদের (মানসপুত্রদের) হাতে দেশ শাসনের সর্বময় কর্তৃত্ব (অর্থাৎ সার্বভৌমত্ব) তুলে দিয়ে ১৯৪৭ সালে ইংরেজরা এদেশ ছেড়ে চলে গেল। ফলে এ দেশের শাসন কর্তৃত্ব লাভের রাজনীতি এতদিনে ব্যাপকভাবে পরিচিতি লাভ করেছে। এছাড়া অন্য কোন পদ্ধতির কথা জনগণ জানেনা, খুব একটা বুঝেও না। ক্ষমতা লাভের লক্ষ্যে গঠিত রাজনৈতিক দল সমূহ এ পথেই ক্ষমতাসীন হওয়ার চেষ্টা চালিয়ে আসছে এবং কখনো-সখনো ক্ষমতাসীন হয়েছেও। ফলে এ পথটিকেই ক্ষমতা লাভও ক্ষমতা হস্তান্তরের একমাত্র পথরূপে গন্য করা হচ্ছে। শরীয়ত নির্দেশিত দ্বিতীয় পন্থাটি তারা ভুলে গেছে। তাই বর্তমান রাজনীতি ও বৃটিশ শাসনামলের রাজনীতির বিচার-বিবেচনা করা হলে এদুয়ের মধ্যে দৃষ্টি ভঙ্গি ও বাস্তব কাজের দিক দিয়ে কোন মৌলিক পার্থক্যই দৃষ্টিগোচর হবে না।

তখন প্রার্থী ভোট দাতাদের বাড়ী বাড়ী গিয়ে ভোট চাইতে, এখনো চায়। তখনো প্রার্থী জনগণের হাতে আকাশের চাঁদ তুলে দেয়ার মিথ্যা ওয়াদা করত, এখনো করে। তখনো দলের টিকেট নিয়ে প্রার্থী দাঁড়াতো, এখনো দাঁড়ায়। তখনো দলীয় প্রার্থীর পক্ষে দলের তরফ থেকে বিপুল পরিমাণ অর্থ বিনিয়োগ করা হত, এখনো করা হয়। তখনো দলীয় কর্মী ও স্বেচ্ছা সেবীরা প্রার্থীকে জয়ী করার জন্য কাজ করত, এখনো করা হয়। তখনো দেখা হতনা প্রকৃত সার্বভৌমত্ব কার হাতে এবং প্রার্থীর বাস্তবিকই

কিছু করার ক্ষমতা আছে কিনা, এখনো তা দেখা হয়না। তখনো যেমন জাল ভোট দেয়া হত, ভোট বাক্স ছিনতাই হত, এখনো তা হয়, বরং এখন তা আগের তুলনায় অনেক বেশী, যাকে ব্যালট ডাকাতি বলাই অধিকতর শোভন, তার রূপ বা ধরণ যাই হোক না কেন। তখনো নির্বাচিত হওয়ার পর সংসদ সদস্যরা জনগণের কল্যাণে কিছুই করতে পারতোনা, এখনো তেমন উল্লেখযোগ্য কিছুই করতে পারে না। এই হল প্রচলিত রাজনীতি ও নির্বাচন "সাধারণ প্রথা" হওয়ার ইতি কথা।

দূর্ভাগ্য বশত আজ ( عرف عام ) "সাধারণ প্রথা" শব্দটি যত্রতত্র ব্যবহার করে ইসলামী শিক্ষার সাথে চরম উপহাস করা হচ্ছে। এরই উপর ভিত্তি করে বর্তমান যুগের কতিপয় চিন্তাবিধ সুদ-বীমা সহ নানা চরম ইসলাম বিরোধী কর্মকান্ড স্বীকৃতি দিয়ে আসছে। তাদের বোধোদয়ের জন্য আমি "আল-আহকাম" "আল-মুওয়াফাকাত" "আল-আশবাহ"এর এ সংক্রান্ত অধ্যায়টি অধ্যায়ন করার জন্য অনুরোধ রাখব।

তিনি লিখেছেন, "পৃথিবীর বহু দেশের সংবিধান 'সাধারণ্যে প্রচলিত প্রথার' ভিত্তিতে রচিত হয়েছে, ইংল্যান্ডের সংবিধান তার উজ্জল প্রমাণ"।

আমি বলব- সাধারণ্যে প্রচলিত প্রথার ভিত্তিতে রচিত ইংল্যান্ডের সংবিধান শরীয়ত সমর্থীত নয়। যে সংবিধানে অবৈধ যৌনচার, লাইসেন্স ধারী মদের ব্যবসা, সুদ, ঘুষ ইত্যাদি বৈধ সে সংবিধান আমাদের অনুসরণীয় নয়।

তিনি লিখেছেন-"মূলতঃ সব জিনিসই বৈধ ও আইন সম্মত যতক্ষণ পর্যন্ত তা অবৈধ ও হারাম হওয়ার ব্যাপারে শক্তিশালী দলীল উপস্থাপনা করা না হবে"।

দেখুন ব্যালট পেপার কেন্দ্রীক বর্তমান প্রচলিত নির্বাচন পদ্ধতির উপর মুসলিম উম্মাহ একমত নয়। ইহা অবৈধ ও হারাম হওয়ার ব্যাপারে আমাদের কাছে শক্তিশালী দলীল রয়েছে।

যেমনঃ-

১) কোরআন- হাদীসের ভিত্তিতে মুসলমানদের মধ্যে ঐক্য প্রতিষ্ঠা করা ফরজ এবং অনৈক্য সৃষ্টি করা হারাম। যে কাজ মুসলমানদের মধ্যে অনৈক্যের জন্ম দেয় তা ত্যাগ করা একান্ত অপরিহার্য। আর এর সহযোগিতা

করা ও সম্পূর্ণ হারাম। তাই পাশ্চাত্য গণতন্ত্রের অধীনে কোন নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করা এবং ভোটদান করাও নির্দ্বিধায় হারাম। [আল ইমরান-১০৩নং আয়াতের ভিত্তিতে]

২) যদি ধরে নেওয়া হয় (যদিও অবাস্তব) কোন মুসলিম দেশে পাঁচ বছরের জন্য ইসলামী অনুশাসন মতো দেশ পরিচালনার চেষ্টা করবে কিন্তু পাঁচ বছর পর যদি আবার অনৈসলামীক দল ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়, তখন কি ইসলাম থেকে ইরতেদাদ অর্থাৎ ইসলাম ত্যাগকারীর অপরাধে অপরাধী হবে না? শরীয়ত যার বিধান দিয়েছে ওয়াজিবুল কতল। [বাক্বারা-২১৭নং আয়াতের ভিত্তিতে]

(৩) বর্তমান নির্বাচন প্রক্রিয়া এ জন্যে শরীয়ত পরিপন্থী যে, কোরআন হাদীসের দৃষ্টিতে পরনিন্দা, অন্যের উপর অপবাদ আরোপ করা এবং নিজের প্রশংসা গেয়ে বেড়ানো হারাম। পাশ্চাত্য নির্বাচন প্রক্রিয়ায় এ তিনটি বিষয় বৈধ ফলে শরীয়ত অনুগত মুসলমানের জন্য এরুপ নির্বাচন বয়কট করা এবং ভোট দান থেকে বিরত থাকা ফরজ এবং অংশ গ্রহণ করা হারাম। [আ'রাফ-১২ নং আয়াতের ভিত্তিতে]

৪) পাশ্চাত্য গণতান্ত্রিক নির্বাচনে প্রার্থী হতে হয়, যা শরীয়তে হারাম, কেননা এতে আমিত্ব প্রকাশ পায়, যা শয়তানী আচরণ। [সূরা আর নাজম ৩২ নং আয়াতের ভিত্তিতে]

হুজুর (সাঃ) বলেছেন "আমীর বা নেতার পদলাভের জন্য প্রার্থী হয়ো না। কেননা এ পদ মর্যাদা যদি তুমি প্রার্থনা করে লাভ কর তবে তোমাকে এরই নিকট সোর্পদ করে দেওয়া হবে। আর আমীর পদ যদি প্রার্থনা ছাড়াই অর্জিত হয়, তবে সেখানে (আল্লাহর তরফ হতে) অবশ্যই তোমাকে সাহায্য করা হবে।" (মূল বোখারী ১ম খঃ ১১৪ পৃঃ)

৫) একজন ভোটার ভোটদানের মাধ্যমে স্বতস্ফূর্ত ভাবে ও নিঃশব্দে এ প্রতিশ্রুতি দেয় যে, "আমি তোমাকে তোমার ইচ্ছা মত যে কোন আইন পাশ করার ক্ষমতা দিচ্ছি এবং ওয়াদা করছি যে, তুমি অন্যদের সাথে মিলিত হয়ে যে আইনই পাশ করবে আমি তা নির্দ্বিধায় মেনে নেব"। কোরআনের দৃষ্টিতে আইন রচনার এরূপ নিরংকুশ ক্ষমতা আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে দেওয়া সুস্পষ্ট শিরক। কেননা আল্লাহ বলেন "আল্লাহ ছাড়া কারো বিধান

দেবার ক্ষমতা নেই" । [ইউসুফ-৪০ নং আয়াতের ভিত্তিতে]

রাসুলুল্লাহ (সাঃ) বলেনঃ "আল্লাহ কিছু কিছু ব্যাপারে সচেতনার সহিত নিরব থেকেছেন, তোমরা এসব জিনিস বৈধ হওয়ার ব্যাপারে তর্কে লিপ্ত হয়ো না।

রাসূলুল্লাহ (সাঃ)'র এরূপ নিষেধবাণী থাকা সত্বেও লেখক কিভাবে শরীয়ত নিষিদ্ধ একটি কাজকে জায়েয ঘোষণা দিলেন? অথচ আল্লাহ তা'য়ালা ব্যালট পেপার কেন্দ্রিক নির্বাচনকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করে বলেনঃ

" হে রাসূল আপনি যদি পৃথিবীবাসীর অধিকাংশের মতকে অনুসরণ করেন, তাহলে তো তারা আপনাকে আল্লাহর রাস্তা থেকে দূরে সরিয়ে দেবে।"

(সূরাহ আনআম-১১৬)

১৪৬ পৃষ্ঠায় লেখক নিজেই লিখেছেন-" কিন্তু ব্যালট পেপারের মাধ্যমে ভোট প্রদান বা গ্রহণ শরীয়তের কোন আহকামের অন্তভুর্ক্ত নয়"।

তবুও কেন তারা ব্যালট পেপার কেন্দ্রিক নির্বাচনকে জায়েয করার জন্য উঠেপড়ে লাগছেন? যুগ, এলাকা, পরিবেশ ও প্রথার পরিবর্তনের ফলে ফতোয়ার ও পরিবর্তন ঘটে ঠিক, কিন্তু পাশ্চাত্যের এ গণতন্ত্র তো কুফরী মতবাদ এবং ব্যালট পেপার কেন্দ্রিক নির্বাচন তার অংশ বিশেষ। কুফরী মতবাদের উপর আমল করাও যেহেতু কুফরী (১) সেহেতু ব্যালট পেপার কেন্দ্রিক নির্বাচনে অংশ নেওয়াও কুফরীর নামান্তর। আল্লাহ পাক বলেন- "যদি তোমরা তাদের আনুগত্য কর, তোমরাও মোশরেক হয়ে যাবে"। (আনআম-১২১)

তিনি লিখেছেনঃ "প্রথা ও রেওয়াজ সম্পর্কিত উপরোক্ত নীতিমালা নিখাদ ইবাদতের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়"।

তাহলে তিনি কি একথা বুঝাতে চেয়েছেন যে, আল্লাহর আইনের শাসন ব্যবস্থা প্রবর্তনের উদ্দেশ্যে মজলিশে শুরা (জাতীয় সংসদ) গঠন ও রাষ্ট্রপতি নির্বাচন করা ইবাদতের অন্তর্ভুক্ত নয়। সুতরাং প্রথা ও রেওয়াজ সম্পর্কিত নীতিমালা এক্ষেত্রে প্রযোজ্য? আরো প্রশ্ন জাগে দেশে ইসলামী হকুমাত প্রতিষ্ঠার আন্দোলন একটি ইবাদত, কিন্তু এর মধ্যে ইংরেজ আবিস্কৃত ব্যালট পেপার কেন্দ্রিক নির্বাচন কে কেন সংযুক্ত করা হল? ইহা কি বিদআত হবে না?

হুজুর(সাঃ) এর (যে ব্যক্তি আমার দ্বীনে নতুন কোন তরিকা পদ্ধতি আবিস্কার করে যা ঐ দ্বীনে নেই তা বাতিল যোগ্য) এ হাদীসতো প্রচলিত নির্বাচনকে বাতিল ঘোষণা দিচ্ছে। আর জেনে শুনে যারা এরূপ করে তারা স্পষ্ট গোমরাহীতে রয়েছে।

(১) "মাওয়ায়েযে থানুবী" থেকে প্রকাশিত "মাসিক জাগো মুজাহিদ" এপ্রিল'৯৬ সংখ্যায় ১৪ পৃষ্টা।

তিনি লিখেছেন- "শরীয়ত এ ব্যাপারে জনগণকে স্বাধীনতা দিয়েছে, যে কোন গ্রহণযোগ্য ও উন্নততর পদ্ধতি বেছে নেওয়ার"।

তার একথা যদি ব্যালট পেপার কেন্দ্রিক নির্বাচনকে জায়েয ঘোষণা দেওয়ার উদ্দেশ্যে বলা হয়ে থাকে, তাহলে তা হবে নিতান্ত ভুল। কেননা এ পদ্ধতিতে মানুষের মাথা গোনা হয়, ওজন দেওয়া হয় না। অধিকাংশ আহাম্মকের রায়ে একজন আহাম্মকই জনপ্রতিনিধি নির্বাচিত হয়। সুতরাং ইহা আস্থাভাজন প্রতিনিধি নির্বাচনের উন্নততর পন্থা হতে পারে না।

**এখানে মিষ্টার কারলাইলের উক্তিটি প্রনিধানযোগ্যঃ**

তিনি বলেনঃ "যে কোন দেশের যোগ্যতম ব্যক্তিদেরকে অনুসন্ধান কর, তারপর তাদেরকে এনে নেতৃত্বের আসনে সমাসীন কর, তাদেরকে সম্মান কর, এভাবে তোমরা খুঁজে পাবে সে দেশের একটি পূর্নাঙ্গ শাসন ব্যবস্থা। তাছাড়া ব্যালট বাক্স অথবা পার্লামেন্টের তুমুল বাগ্মিতা, নির্বাচন, আইন প্রণয়ন কিংবা অন্য যেকোন যান্ত্রিক পদ্ধতি সে দেশের উন্নতির পথে কোন সমৃদ্ধি বয়ে আনতে পারবেনা। এটাই হবে একটি পূর্ণাঙ্গ শাসনব্যবস্থা আর এদেশ হবে একটি অনুসরণীয় দেশ"। G. N. Sabine, A History of political Theory 0.764 (Apadorai P.122)

উদাহরণ স্বরূপ আফগানিস্তান যা মুসলিম উম্মাহর একটি অনুসরণীয় দেশ।

তিনি আরো লিখেছেন "আল্লাহর পথে সশস্ত্র যুদ্ধ কিয়ামত পর্যন্ত শরীয়তের এক অলংঘনীয় হুকুম। এটা মুখ্য বিষয় কিন্তু তরবরী বর্শা, তীর, ধনুক, মানজানীক নিয়ে চিরকাল যুদ্ধ করতে হবে এমন কোন বিধান শরীয়তে নেই। যুগ চাহিদার প্রেক্ষিতে অস্ত্রের ধরন ও যুদ্ধ কৌশল পাল্টে গেছে এবং যাবে এটাই স্বাভাবিক। আধুনিক যুগে জিহাদ ফী সাবিলিল্লাহর জন্য উন্নততর ক্ষেপনাস্ত্র , ট্যাংক বিধ্বংসী কামান, জেট ফাইটার, সাবমেরিন, টর্পেডো ইত্যাদির ব্যবহার শরীয়তের বৈধ কার্যাবলীর অন্তর্ভুক্ত রাসুলুল্লাহ (সাঃ) তথা খোলাফায়ে রাশেদীনের যুগে এ সব অস্ত্র প্রচলিত ছিল না বলে বর্তমানে এর ব্যবহার হতে পারবে না এমন কথা অযৌক্তিক, অগ্রহণযোগ্য ও অবাস্তব।

তার এ আলোচনা আমি মানতে পারলাম এই হিসেবে যে, আধুনিক যুগে নব আবিস্কৃত যুদ্ধাস্ত্র গুলি সূরা আনফালের ৬০ নং আয়াতে উল্লেখিত (مِنْ قُوَّةٍ) শব্দের অন্তর্ভুক্ত । এখন আমার প্রশ্ন হল, ব্যালট পেপার কেন্দ্রিক প্রচলিত নির্বাচন পদ্ধতি কোন ( قُوَّةٍ ) এর অন্তর্ভুক্ত? এর স্বপক্ষে যেহেতু কোন আয়াত ও হাদীস পেশ করেন নাই, সেহেতু এ ধরণের অবান্তর যুক্তি অগ্রহণযোগ্য।

**মোদ্দা কথা- আল্লাহর আইনের শাসন প্রতিষ্ঠার মাধ্যম হল শুধুমাত্র "কিতাল ফি সাবীলিল্লাহ"** এ ছাড়া যতই উন্নততর পদ্ধতি আবিস্কৃত হোক না কেন তা গ্রহণ যোগ্য নয়, হতে পারে না।

صلى الله
عليه وسلم